কন্‌সেন্‌ট্রেশন্‌ ক্যাম্প

পরিতোষ মজুমদার

দে'জ পাবলিশিং ॥ কলিকাতা ৯

প্রথম প্রকাশ :

—সেপ্টেম্বর, ১৩৭৭

প্রকাশক :

শ্রীসুধাংশুশেখর দে

দে'জ পাবলিশিং

৩১/১বি মহাত্মা গান্ধী রোড

কলিকাতা ৭০০০০৯

প্রচ্ছদ :

শ্রীগৌতম রায়

মুদ্রাকর :

শ্রীনিশিকান্ত হাটই

তুষার প্রিন্টিং ওয়ার্কস্

২৬, বিধান সরণী

কলিকাতা ৭০০০০৬

শ্রীযতীন্দ্রমোহন দত্ত

ও

ডক্টর রেখা দত্ত

শ্রদ্ধাভাজনেষু

লেখকের অন্যান্য বই :

জোনাকি মন
কাঁচের আয়না
রাইনের ঢেউ
সংসার সমুদ্রে
জীবনের স্বাদ
শেষ বিকেলের আলো
সান্ পাঁউলির মেয়ে
সউজেলিঁজেব ঘর-সংসার
অগ্নিলতা
আলোর সন্ধানে
সায়াহ্ন আকাশ
সুদূরের বন্দর
এক টুকরো আগুন
রঙের বিবি (বাংলাদেশ)
দুই দিগন্ত (বাংলাদেশ)
ইত্যাদি।

A Thousand years will pass and the guilt of Germany will not be erased.

—**Hans Frank,**

Governor-General of Poland.

before he was hanged at Nuremburg.

বন্দী পর্ব

শেষপর্যন্ত পোল্যাণ্ডের প্রায়-পরিত্যক্ত জলাভূমি শহর আউস্‌ভিৎজ্‌কে স্থির করা হলো। এখানেই হবে নতুন কনসেনট্রেসন ক্যাম্প। হ্যাঁ, এই সেই আউস্‌ভিৎজ্‌, যার নামে মানুষ আজও শিউরে ওঠে। এতো ব্যাপক আর বীভৎসতম নরহত্যা পৃথিবীর আর কোথাও কোনো কালে সংঘটিত হয়নি। ট্রিবিংলকা, বেলসী, সীবিবর প্রভৃতি পোল্যাণ্ডের; রিগা, মিনিস্ক, কাউনাস্‌ এবং লাভোর মধ্যে সবচেয়ে বড়ো ছিলো আউস্‌ভিৎজ্‌। চারটে দৈত্যাকার গ্যাস চেম্বারে দৈনিক শ'য়ে শ'য়ে লোক হত্যা করা হতো। পাশেই এই সব মৃতদেহ দাহ করাব জন্য বিরাট চুল্লী। গ্যাস হিসেবে চেম্বারে ব্যবহার করা হতো Zyklon B, ক্রিস্টালাইজড্‌ প্রুসিক এ্যাসিড।

আউস্‌ভিৎজ্‌ ক্যাম্পের ক্যাম্প কমাণ্ডার রুডলফ্‌ হোয়েস্‌ ধরা পড়ার পরে নুরেম্‌বার্গ ট্রায়ালে স্বীকার করেছিলো যে একমাত্র এই ক্যাম্পেই আড়াই লক্ষ নরহত্যা করা হয়েছে। যদিও সঠিক সংখ্যা আর জানার উপায় নেই। কারণ রাশিয়ানদের হাতে পড়ার আগেই ক্যাম্পের নথিপত্র সব পুড়িয়ে ফেলা হয়। তবু নিশ্চিৎ, রুডলফ্‌ হোয়েসের সংখ্যা সত্যিকারের সংখ্যার অর্ধেকেরও কম। তার সঙ্গে আরো প্রায় লক্ষাধিক বন্দী মারা গেছে অনাহারে এবং বিভিন্ন রকম সংক্রামক ব্যাধিতে। এর বেশীর ভাগ হলো ইহুদী আর রাশিয়ান যুদ্ধবন্দী। ইতিহাসের এক কলংকময় অধ্যায় হলো এই ক্যাম্প।

জার্মানির অনেক কোম্পানি স্বাস্থ্যবান বন্দীদের গ্যাস চেম্বারে ঢোকানোর আগে বিনে পয়সায় শ্রমিকের কাজ করিয়ে নিতো। তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য কেমিক্যাল কোম্পানি আই. জি. ফারবেন্‌ আর ইঞ্জিনীয়ারিং সংস্থা ক্রুপ। এই সব কারখানায় খেটে খেটে শুকিয়ে যাওয়া শ্রমিকের দলকে শেষপর্যন্ত গিয়ে লাইন দিয়ে দাঁড়াতে হতো গ্যাস চেম্বারের সামনে।

যুদ্ধ শেষে আই. জি. ফারবেনের বোর্ড অফ ডিরেক্টরস্‌ নিজেদের এ ব্যাপারে সম্পূর্ণ নির্দোষ বলে। কিন্তু নুরেম্‌বার্গ মামলায় কাগজপত্র ও সাক্ষ্যে প্রমাণিত হয়, পুরো ব্যাপারটাই ঘটেছিলো বোর্ড অফ ডিরেক্টরসের নির্দেশে। আই. জি. ফারবেন্‌ কোম্পানির পেটেণ্ট নিয়ে Zyklon B ক্রিস্টাল তৈরী

করেছিলো হামবুর্গের থেস্ এ্যাণ্ড ষ্টাবেন্উ কোম্পানি আর দেসাউ-এর ডিগেস্ কোম্পানি।

ন্যুরেম্বার্গ ট্রায়ালের সময় এই দুই কোম্পানির ডেলিভারী চালান উপস্থিত করা হয়।

বুখেন্ভাল্ডের ক্যাম্প কমাণ্ডার হের বাখের স্ত্রী ফ্রাউ বাখের সখের জন্য মৃত ইহুদীদের চামড়া দিয়ে টেবিল সাজানোর বিভিন্ন উপকরণ, টেবিল-ল্যাম্প, সেড্ ইত্যাদি তৈরী করা হতো। এরকম নৃশংস মহিলা পৃথিবীতে আর দুটো জন্মেছে কিনা সন্দেহ।

কিন্তু বিচারকেরও বিচারক আছে। আর কাল নিরবধি। আউস্ভিৎজ্ ক্যাম্পের কমাণ্ডার রুডলফ্ হোয়েস্, যার অঙ্গুলি হেলনে হাজার হাজার বন্দীকে গিয়ে লাইন দিতে হতো গ্যাস চেম্বারের দরজায়, তারও মৃত্যু হয় এই ক্যাম্পেই।

হোয়েসের জন্ম ১৯০০ সালে। বাদেন-বাদেন অঞ্চলে বাবার ছিলো ছোট্ট একটা মনোহারীর দোকান। ধর্মভীরু লোক। তাই ছেলেকে চেয়েছিলেন ক্যাথলিক চার্চের ফাদার করতে। কিন্তু তরঙ্গ রোধিবে কে? ছেলে গিয়ে নাম লেখালো নাৎসী পার্টিতে। ১৯২২ সালে। পরের বছর এক স্কুল শিক্ষককে হত্যার অভিযোগে যাবজ্জীবন কারাদণ্ডে দণ্ডিত হয় হোয়েস্। ১৯২৮ সালে রাজনৈতিক বন্দীদের ব্যাপক হারে ক্ষমা দেখানোর সুযোগে হোয়েস্ জেল থেকে মুক্তি পেয়ে এস. এস. বাহিনীতে যোগ দেয়। কিছুদিনের মধ্যেই লক্ষ লক্ষ বন্দীর ভাগ্যবিধাতা হয়ে বসে। প্রথমে দাচাউ এবং পরে আউস্ভিৎজ্ ক্যাম্পের ক্যাম্প কমাণ্ডার হোয়েসের ন্যুরেম্বার্গের বিচারে প্রাণদণ্ডের আদেশ হয়। এবং নিয়তির অমোঘ নির্দেশে ১৯৪৭ সালে মার্চ মাসে আউস্ভিৎজেই ফাঁসি দেওয়া হয়। গ্যাস চেম্বারের জন্য Zyklon B ক্রিস্টাল সাপ্লাইয়ের দায়ে থেস্ এ্যাণ্ড ষ্টাবেন্উ কোম্পানির পার্টনার ব্রুনো থেস্ এবং কার্ল ভাইন্বেকারের প্রাণদণ্ড হয়। ১৯৪৬ সালে মিত্রপক্ষের বিচারে উভয়কেই ফাঁসি দেওয়া হয়। কিন্তু ডিগেস্ কোম্পানির ডিরেক্টর ডক্টর গেরহাউ পিটার্সকে অপেক্ষাকৃত লঘু শাস্তি দেওয়া হয়। মাত্র পাঁচ বছরের কারাবাস। সম্ভবতঃ ডক্টর গেরহাউ পিটার্স রক্ষা পায় জার্মান আদালতে বিচার হয়েছিলো বলে।

কালের ইতিহাসে আউস্ভিৎজ্ চিরদিন মানব সভ্যতার একটা কালিমাময় অধ্যায় বলে চিহ্নিত হয়ে থাকবে।

এখান থেকে পাকিয়ে পাকিয়ে আকাশের দিকে উঠে যাওয়া চুল্লীর নীলাভ ধোঁয়ার রেখাটা স্পষ্ট দেখা যায় না।

প্রতি রাতেই এই ধোঁয়ার রেখাটা দেখে ডলম্যান; যদিও আগুন দেখা যায় না। আর ধোঁয়ার রেখাটা মস্তিষ্কের এমন একটা জায়গায় গিয়ে আঘাত করে, যে সমস্ত ব্যাপারটাকেই ছবির মতো মনে হয়।

আউস্‌ভিৎজ্‌ অথবা বীরেখন্‌হাউয়ে জীবনের কোনো মানে নেই। এখানে জীবনের মূল্য কানাকড়িও নয়। সুতরাং জীবন নিয়ে চিন্তা করাটাই বাতুলতা।

আউস্‌ভিৎজ্‌ দু' নম্বর ক্যাম্প আর চুল্লীর মাঝে ঘন সরল গাছের সারি; যাতে আউস্‌ভিৎজের বন্দী বাসিন্দারা বুঝতে না পারে গাছের সারির আড়ালে কী ঘটছে।

—ওটা বোধহয় বয়েজ স্কাউটের ছেলেরা পিক্‌নিক্‌ করছে, তাই না? সেয়ানা-পাগল ডলম্যান একবার মুখ ফসকে ক্যাম্প গার্ডকে জিজ্ঞাসা করে ফেলেছিলো।

—তুমি একটা আস্তো শূয়োর! হাতে ধরা রাইফেলের বাঁটটা দিয়ে আর একটু হলেই গার্ড ডলম্যানের মাথার খুলিটা ফাটিয়ে চৌচির করে দিয়েছিলো আর কি!

মজার ব্যাপার এই যে, এই একটা প্রশ্নই বোধহয় সরল মনে করেছিলো ডলম্যান। যার জন্য আর একটু হলেই একেবারে ভবনদীর ওপারে যেতে হতো। নইলে অন্য সময় ডলম্যানের সরলতা চালাকির নামান্তর।

এতোদূর থেকে ধোঁয়াটা ঠিক বোঝা যায় না। মনে হয় রান্নাঘরের আগুন। জানালার ফাঁক দিয়ে বেরিয়ে আসছে। কিন্তু একদিন আসবে, যখন সেই জানালার কপাট দুটো খুলে যাবে। আর আগুনের লেলিহান শিখা জিব্‌ দিয়ে টেনে নেবে আজকের যারা দর্শক, তাদের।

এ যেন চিমনীর পাশ দিয়ে উড়তে উড়তে শ্যামাপোকার হঠাৎ আগুনের ঝলকের মধ্যে মিশে যাওয়া।

দীর্ঘগাছের কালো কালো ছায়াগুলো প্রলম্ব হয়ে মাটিতে পড়ে। ফেডারের মনে হয়, ছায়াগুলো যেন জীবন্ত মানুষের প্রেতাত্মা। হিমলারের দুষ্কর্মের সচেতন প্রহরী।

এমনকি হিমলারের মতো পশুও নাকি চুল্লীগুলোকে দেখে অসুস্থ বোধ করেছিলো। কিন্তু ক্যাম্প কমাণ্ডার হোয়েস্, পুরনো খুনীর কোনো চিত্তবৈকল্য-ঘটে নি। বরং হোয়েসের সবচেয়ে দুশ্চিন্তা, যতো তাড়াতাড়ি মানুষগুলোকে মারা দরকার, চুল্লীগুলোর সে ক্ষমতা নেই। দৈনিক চারটে ট্রেন ভর্তি বন্দী ক্যাম্পে এলেও, চুল্লীগুলোর ক্ষমতা দু' ট্রেন বন্দীর বেশী নয়। ক্রমে ক্রমেই বন্দীর স্তূপ জমা হচ্ছিলো।

ক্যাম্পে জোর গুজব ছড়িয়ে পড়ে, গুলি করে গণহত্যা করা হবে। কিন্তু হোয়েসের এ পদ্ধতি পছন্দ নয়। কারণ কতো লোককে আর গর্ত খুঁড়ে খুঁড়ে কবর দেওয়া যাবে? নইলে ইতস্তত ছড়িয়ে থাকা মৃতদেহগুলো দেখে সদ্য ট্রেন থেকে নামা বন্দীদের ভেতরে আতংক ছড়িয়ে পড়া বিচিত্র নয়। এবং সেই আতংক থেকে বিদ্রোহ পর্যন্ত করে বসতে পারে। তখন?

চব্বিশ ঘণ্টা চুল্লীগুলোকে খাইয়েও লক্ষ্যে পৌছনো অসম্ভব। এতো বন্দী। রাতের বেলা অন্ধকার গাছগুলোর পটভূমিকায় চুল্লীর আগুন কী রকম ম্যাড়-ম্যাড়ে লালাভ দেখায়। দিনমানে কালো ধোঁয়ায় সব কিছু ঢাকা পড়ে যেতো। পোড়া দেহের গন্ধে অঞ্চলটা ভরে যেতো। কিন্তু কি আশ্চর্য, মাত্র কয়েক মাইল দূরের আডেরবার্গ গ্রামের বাসিন্দাদের যদি তাতে এতোটুকু অস্বস্তি হয়। ওদের ভাবসাবে মনে হয় বড়ো কোনো কারখানার পাশাপাশি যেন ওরা বাস করছে।

গ্রামের লোকেরা এই সব ক্যাম্প গার্ডদের সঙ্গে এমন ভাবে মেলামেশা করে যে ব্যাপারটা কিছুই নয়। ট্রেন ভর্তি করে বন্দীরা এলে, সেই গ্রামের ছোট ছোট ছেলেমেয়েরা চিৎকার করে,—নোংরা ইহুদীগুলো এসে গেছে। এদের এক্ষুনি চুল্লীব আগুনে ফেলে দাও। ইত্যাদি ইত্যাদি।

ভাবতেও খারাপ লাগে এরা এখন বড়ো হয়ে অনেকেই আজকের জার্মানির সুসভ্য নাগরিক হিসেবে পরিগণিত।

ক্যাম্প ডাক্তার উইলহেলম্ ট্রুপ আর সহকর্মী ক্র্যমনিৎস এক্সপেরিমেণ্টের নামে যে অমানুষিক অপরাধ করেছে, ইতিহাসে তার তুলনা নেই। এমন কি, স্থির মস্তিষ্কে এতো কীট হত্যা করাও বোধহয় কোনো মানুষের পক্ষে সম্ভব নয়; মানুষ তো দূরের কথা।

রাতের পর রাত বসে বসে চুল্লীর আগুন, আর ধোঁয়ার রেখা দেখে দেখে ফেডার সেলেনবার্গের ভেতরেও কেমন যেন গা সহা ভাব এসে গিয়েছিলো। ঘটনাগুলো মনে কোনোরকম দাগ কাটতো না।

ফেডার সেলেনবার্গকে জীইয়ে রাখা হয়েছে কিছু খবর বার করার জন্য। দিনের পর দিন এই বীভৎস অত্যাচার সহ্য করার চেয়ে চুল্লীর আগুনও অনেক শীতল। এবং যতো তাড়াতাড়ি পারা যায়, ফেডারও চেষ্টা করতো চুল্লীর ভেতরে ঢুকতে, যদি না কেটোর জন্য পেছুটান থাকতো।

কেটোর চিন্তাটা ওকে এই নারকীয় জীবনেও বাঁচার তাগিদ দেয়! নইলে কবে—। কথাটা আর ভাবে না ফেডার।

আজ প্রায় মাস ঘুরে এলো নাৎসীদের হাতে ও বন্দী। সুতরাং এরা কী চীজ, সেটা হাড়ে হাড়েই চিনেছে। গেষ্টোপা, অর্থাৎ সিক্রেট ষ্টেট পুলিশগুলো নিষ্ঠুরতায় বোধহয় শয়তানকেও হার মানায়। বুদ্ধিশুদ্ধি হীন নরকের জীব যেন এগুলো।

ধরা পড়ার মুহূর্ত থেকেই ফেডার মনস্থির করেছিলো, কিছুতেই এ শয়তান-গুলোর কাছে পরাজয় স্বীকার করবে না। তারজন্যে যদি মরতে হয়, তা'ও রাজী এবং সেটা একমাত্র সম্ভব প্রচণ্ড ইচ্ছেশক্তি থাকলে। কিন্তু সেই ইচ্ছেশক্তির তো একটা সীমা পরিসীমা আছে। কতো আর পারা যায়!

ইনট্রোগেসানের সময় এই অদম্য ইচ্ছেশক্তি দিয়েই প্রতিপক্ষকে কোণ ঠাসা করে ফেলেছে। অনেক সময় গেষ্টোপারা ওকে গুলি করতে করতে নিজেদের সামলে নিয়েছে। এবং ফেডার মনে মনে এই ভেবে আনন্দ পেয়েছে যে, আর কিছু না হোক এটা প্রতিপক্ষের একটা পরাজয় বৈ কি!

সেই কারণে ইনট্রোগেসানের সময় ফেডার সোজাসুজি তাকাতেন প্রতিপক্ষের চোখে চোখে। তাতে কিছুটা কাজ হতো। কারণ গেষ্টোপাদের প্রায় সবাই পুরনো কয়েদী; খুন, নারী-ধর্ষণ অথবা চুরি-ডাকাতির দায়ে জেলখাটা। তার ওপর অশিক্ষিত। তাই ইনফিরিয়ারিটি কমপ্লেক্সও ওদের মধ্যে প্রচুর।

গেষ্টোপারা অবশ্য ইনট্রোগেসানের বদলে বন্দীদের ওপর দৈহিক অত্যাচার করে তৃপ্তি পেতো। তাই ইনট্রোগেসানের শুরুতেই মারধোর করে বন্দীদের দৈহিক এবং মানসিক প্রতিরোধ ক্ষমতাটাকে কেড়ে নিতো। তাতে বন্দীকে মনের দিক থেকেও দুর্বল করে ফেলা সহজ হতো। এলোমেলো চড়-চাপড়, ঘুষির বর্ষণে বন্দী যখন বিপর্যস্ত তখন আরম্ভ হতো ইনট্রোগেসান।

মৃত্যু আউস্‌ভিৎজে কিছু নয়। বরং সব চেয়ে স্বাভাবিক ঘটনা এবং তার জন্য খুব বেশী একটা চেষ্টা করারও প্রয়োজন পড়ে না। কিন্তু—?

ফেডার ধরা পড়ার পরেই নিজেকে প্রস্তুত করে নিয়েছিলো, গেষ্টাপাদের যে কোনোরকম অত্যাচারের মুখোমুখি হবার জন্য। বরং এটাও যেন একটা যুদ্ধ। প্রতিপক্ষকে পরাস্ত করতে হবেই। সেই রকম ভাবেই মনটাকে পাহাড়-দৃঢ় করেছিলো ফেডার।

ওকে নিশ্চয়ই কেউ বিশ্বাসঘাতকতা করে ধরিয়ে দিয়েছে। কিন্তু কে সে? অনেক চিন্তা করেও থই পায় না ফেডার। আর কেন-ই বা বিশ্বাসঘাতকতা করবে?

ফেডার ক্রিসাউ সার্কেলের মেম্বার। এটা সত্যি। আর নাৎসীদের রাগ ক্রিসাউ সার্কেলের ওপর প্রচণ্ড। তার একটা কারণ সম্ভবতঃ ক্রিসাউ সার্কেলের সভ্যরা হাসিমুখে মরবে, তবু অর্গানাইজেশনের প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা করবে না। আর সেটাই নাৎসীদের পক্ষে অসহ্য।

সুতরাং প্রথমেই যে করে হোক, বিশ্বাসঘাতককে খুঁজে বার করা দরকার। নইলে অর্গানাইজেশনের কতো ক্ষতি করবে কে জানে!

যাই হোক, নখের ভেতরে পিন ফুটিয়ে নবাগত বন্দীদের নরম করার পদ্ধতিটাকে সহজ মুখেই সহ্য করেছে সেলেনবার্গ। অবশ্য নতুনদের নরম করার এটাই একমাত্র পদ্ধতি নয়; অনেকগুলোর মধ্যে এটাও একটা। লোক বুঝে এক একজনের এক এক রকমের দাওয়াই। দেওয়ালের দিকে মুখ করে ঘণ্টার পর ঘণ্টা দাঁড়িয়ে থাকা, সিঁড়ি বেয়ে অবিরাম ওঠ-নামা, বরফ-ঠাণ্ডা জলে চোবানো।

নখে পিন ফোটানো ওকে বেশী কষ্ট দিতে পারে নি। কারণ ক্রিসাউ সার্কেলের সমস্ত সভ্যকেই অল্পবিস্তর এই ধরনের অত্যাচার সহ্য করার ক্ষমতা অনুশীলন করতে হয়। যদি হঠাৎ গেষ্টাপাদের হাতে কোনো সভ্য পড়ে, তবে যাতে প্রথমদিকের কিছুটা অত্যাচার সহ্য করতে পারে। তখন ফেডার মনে মনে ক্রিসাউ সার্কেলের ওপর রাগ করলেও আজ তারিফ করে। ভাগ্যিস তখন প্র্যাক্‌টিশ করেছিলো।

সেলেনবার্গের বয়সের নৌকাটা সবেমাত্র কুড়ির বন্দর পেরিয়েছে কিন্তু অভিজ্ঞতার দিক থেকে এ ক'দিনেই যেন প্রৌঢ়ত্বে পৌছে গেছে। নইলে এই প্রচণ্ড মানসিক চাপ সহ্য করছে কি করে!

সত্যি বলতে কি, ক্যাম্পের বন্দী-জীবনে ইন্‌ট্রোগেসানের জন্য প্রথমবার গেষ্টোপাদের মুখোমুখি হওয়া সবচেয়ে সাহসের দরকার। কিন্তু ও যে মানসিক দৃঢ়তা নিয়ে তার মোকাবিলা করছে, নিজেরই অবাক লাগে।' ভয় যে বিলকুল পায় নি তা' নয়, তবে মুখের উপর সেই ভয়ের চিহ্নটা যে অপর পক্ষ ধরতে পারে নি, সেটাই বাঁচোয়া। কারণ যে কোনো একটা দুর্বলতা টের পেলেই হলো, বেছে বেছে গেষ্টোপারা ঠিক সেই জায়গাতেই মোক্ষম আঘাত হানবে। ওর মানসিক দৃঢ়তার কাছে যে গেষ্টোপারা হেরে গেছে সে বিষয়ে সন্দেহ নেই।

ওকে ইন্‌ট্রোগেসানের ভার ছিলো নাৎসী মেজর ক্রাউসেন্‌হাইনের ওপর। ক্রাউসেন্‌হাইনের নামটা সমস্ত আউস্‌ভিৎজের মধ্যে প্রচণ্ড রকমের কুখ্যাত। আসলে ক্রাউসেন্‌হাইন ভেতরের স্যাডিষ্ট মনোভাবটা কিছুতেই গোপন রাখতে পারে না। শয়তানের মতো সামান্য কারণে অথবা অকারণে বেরিয়ে পড়ে ভয়াবহভাবে।

ক্রাউসেন্‌হাইনের পাতলা চেহারা এবং রোগাটে মুখ দেখেই বোঝা যায়, অন্যান্য গেষ্টোপাদের চেয়ে অনেক বেশী পরিশ্রম করতে হয়েছে ওকে আগের জীবনে। যার জন্য বর্তমানের ভালো খাওয়া দাওয়াও ওর চেহারায় কোনো পরিবর্তন আনতে পারে নি। সবচেয়ে ভয়ের ওর চোখ দুটো। ভাবলেশহীন। স্থির। ঠিক যেন সাপের চাউনির মতো ঠাণ্ডা।

ফেডারকে প্রথমে একটা ছোট্ট কুঠুরিতে নিয়ে আসে। কুঠুরির দেওয়ালের সাদা রঙ সম্ভ করা হয়েছে। দরাজ হাতে রঙ খরচ করেও দেওয়ালের গায়ে ছড়ানো ছিটানো রক্তের দাগগুলো ঢাকা যায় নি। দাগগুলো স্পষ্ট ফুটে বেরিয়েছে। প্রথম নজরে কুঠুরিটাকে কসাইখানা বলে মনে হয়। যদিও ফেডার শুনেছে, এ কুঠুরিতে কেউ মরে নি। আসলে মরবার সুযোগটাই বা কোথায়! মৃত্যুর কয়েক মুহূর্ত আগে দেহটাকে টেনে হিঁচড়ে নিয়ে গিয়ে চুল্লীতে ফেলে দেয়।

ক্রাউসেন্‌হাইন ওর দিকে তাকায়। আগাপাস্তলা জরীপ করে। তারপর বলে, - তাহ'লে তুমি-ই ফেডার সেলেনবার্গ। তাই না?

—হ্যাঁ। ছোট্ট অথচ দৃঢ় গলায় উত্তর দেয় ফেডার।

—তুমি তো ক্রিসাউ সার্কেলের মেম্বার?

—না। ক্রিসাউ সার্কেল সম্পর্কে আমি কিছুই জানি না।

ক্রাউসেন্‌হাইন ওর উত্তরে কয়েকটা মুহূর্ত চুপ করে থাকে। টেবিলের ওপর থেকে একটা ফাইল টেনে নেয়। পাতা উল্টোতে উল্টোতে একটা পাতা

বের করে ওর দিকে তাকিয়ে সুপ্রীম কোর্টের জজের ভঙ্গীতে বলে,—এই যে, পাওয়া গেছে। রীতিমতো লিখিত অভিযোগ। পড়ে শোনাতে হবে কি?

—যদি তা'তে আপনি খুশী হন! উদাস গলায় জবাব দেয় ফেডার।

—আমি? খেঁকিয়ে ওঠে ক্রাউসেন্‌হাইন। শত্রুদের গুলি করা ছাড়া আর কিছুতে আমি খুসী হই না। বুঝলে? আর এটা যেন সব সময় মনে থাকে। এখানে লেখা আছে, তুমি মুক্তিকামী। এর মানে কী?

ওর উত্তরের জন্য দুঃখ প্রকাশ করে ফেডার বলে,—কী করে বলবো? মুক্তির স্বাদ তো কখনো পাই নি!

ক্রাউসেন্‌হাইন ভ্রূ দুটো ওপরের দিকে তোলে। কাগজটার কয়েকটা জায়গায় দাগ দেয়। মনে মনে খুসী হয় এই ভেবে যে প্রথম চোটেই যতোটা ভেবেছিলো তার চেয়ে বেশী নরম করতে পেরেছে ওকে!

—শোনো, এখানে লেখা আছে তুমি ক্রিসাউ সার্কেলের একজন সক্রিয় সদস্য। শুধু তাই নয়, ফুয়েরারকে হত্যা করার পবিকল্পনার সঙ্গেও তুমি জড়িত।

—সম্পূর্ণ মিথ্যা অভিযোগ। বিদ্বেষপরায়ণও বটে।

—হতে পারে। স্বাভাবিক গলায় বলে ক্রাউসেন্‌হাইন। এটা জানি। আর জানি বলেই প্রত্যেক বন্দীকে সত্যি কথা বলার সুযোগ দিয়ে থাকি।

ক্রাউসেন্‌হাইন একটা প্যাড্ টেনে নিয়ে প্রশ্ন ছোঁড়ে,—তোমার কি কাউকে শত্রু বলে মনে হয়?

—না, সে রকম তো কাউকে দেখি না।

—কিন্তু এটা তোমার সপক্ষে যাবে না, জানো?

—জানি। তবু নিজের চামড়া বাঁচাতে গিয়ে এক সম্পূর্ণ নির্দোষ লোককে এ জায়গায় ঠেলে দেওয়া কি উচিত হবে?

—কিন্তু আমার পরামর্শ যদি শোনো, তবে বলবো সত্যি কথা বলে নিজেকে তোমার বাঁচানো উচিত। ভয়ের কিছু নেই।

—আমার কোনো শত্রু আছে বলে আমার জানা নেই।

—ঠিক আছে। তুমি তা'হলে তোমার কার্যকলাপ আর বন্ধুদের নাম ধাম সব খুলে বলো, আমরা তোমাকে বাছতে সাহায্য করবো কে তোমার শত্রু। অথবা কার পক্ষে তোমার সঙ্গে শত্রুতা করা সম্ভব।

ক্রাউসেন্‌হাইনের চালাকি বুঝতে পারে ফেডার। ওকে লোভ দেখিয়ে সমস্ত ইন্‌ফরমেশন বার করার মতলব। তাই সোজাসুজি কোনো উত্তর না দিয়ে মৃদু হাসে।

ওর হাসিটা ক্রাউসেন্‌হাইনের নজর এড়ায় না। ইচ্ছে করে এক থাবড়ায় হাসিটা বন্ধ করে দিতে। কিন্তু অতি কষ্টে সে ইচ্ছেটাকে দমন করে।

—আমার কোন শত্রু আছে বলে জানা নেই। তৃতীয়বার এই একই কথা উচ্চারণ করে ফেডার। হয়তো বা কেউ আমার অজ্ঞাতে আমাকে হিংসে করে। তাই এ অভিযোগ সম্পূর্ণ মিথ্যা। বিদ্বেষপরায়ণ।

—হতে পারে। আর সেই জন্যই তো বলছি, যাকে সন্দেহ করো তার নাম বলো।

—কিন্তু আমার যে কিছুই বলার নেই।

—ঠিক আছে। কঠিন গলায় ক্রাউসেন্‌হাইন বলে। দেখো, সোজাসুজি যদি সত্যি কথা না বলো, তবে ক্যাম্পে পেট থেকে কথা টেনে বার করার অনেক রকম দাওয়াই আছে। এই মুহূর্তেই ইচ্ছে করলে গুলি করতে পারি; অথবা সারাজীবনের জন্য লেবার ক্যাম্পে পাঠিয়ে দিতে পারি। উপরন্তু, নানা রকম অত্যাচার তো আছেই। কিন্তু কি দরকার এ সবের? তার চেয়ে সত্যি কথাগুলো যদি বলে দাও, আমরা বরং তোমার মুক্তির ব্যবস্থা করে দেবো। সেটাই ভালো নয় কি?

—ক'দিনই বা বাইরে গিয়ে বেঁচে থাকবো? কারণ আমি যার নাম বলবো সে তো সঠিক ব্যক্তি নাও হতে পারে? তখন?

—সে সবের জন্য তুমি কিছু ভেবো না। ওদিকটা আমরা সামাল দেবো। আসলে তোমার মুক্তির পর তোমাকে জার্মানির অন্য অঞ্চলে পাঠিয়ে দেবো। যাতে কেউ তোমার নাগাল না পায়।

—কিন্তু সঠিক না জেনে কারোর প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা করা আমার পক্ষে সম্ভব নয়। দৃঢ় গলায় ফেডার বলে।

—তোমার যা ইচ্ছে করতে পারো। কিন্তু আমি তোমাকে চিন্তা করার জন্য পাঁচ মিনিট সময় দেবো। ভেবে দেখো। পাঁচ মিনিট পরে যদি সত্যি কথা বলো, আমি-ই তোমার হয়ে বক্তব্য লিখে দেবো।

—কিন্তু যদি বলি, আমার বলার মতো কিছু নেই।

—সে ক্ষেত্রে? তোমাকে এখান থেকে নিয়ে যাওয়া হবে ক্যাম্পেরই একটা নিঃসঙ্গ সেলে। যাতে তুমি আরো চব্বিশ ঘণ্টা ভেবে দেখতে পারো। কিন্তু সেটা কি ভালো হবে?

ক্রাউসেন্‌হাইনের মুখে বাঁকা হাসির একটা টুকরো খেলে যায়।

ফেডার বিস্মিত হয়। প্রথম ইনটারভিউ যে রক্তপাতশূন্য এ ভাবে উতরাবে,

ভাবে নি। আর এই ইনটারভিউয়ের কথা এতো শুনেছে, যে বুকের ভেতরটা রীতিমতো কাঁপছিলো। কিন্তু বর্তমানে সমস্ত ব্যাপারটা খতিয়ে দেখে মনে হয়, ওকে হয়তো পুরোপুরি সন্দেহ এরা করে না। নইলে এতো সহজে ছেড়ে দিতো না। কিন্তু সেটাই বা কি করে সম্ভব? এদের চোখে সবাই অপরাধী। কোনো না কোনো কারণে।

বরাবরই শুনে আসছে গেষ্টাপোর দল মানুষকে আদৌ মানুষ বলে গ্রাহ্য করে না। অবশ্য, ওর বিরুদ্ধে নির্দিষ্ট কোনো চার্জ এনে ওকে গ্রেপ্তার করা হয় নি। সেই জন্যই বোধহয় ওকে আগে কোনো না কোনো অভিযোগে অভিযুক্ত করা চাই, তারপরে শাস্তির কথা। যাই হোক, প্রথম ইন্‌ট্রোগেসানেই যে নির্যাতিত হতে হয় নি। এটাই বাঁচোয়া।

এতোক্ষণ ক্রাউসেন্‌হাইনের ডেস্কের সামনে দাঁড়িয়ে প্রশ্নের উত্তর দিচ্ছিলো। ওকে দরজার পাশের দেওয়ালের কাছাকাছি বেঞ্চটাতে বসতে বলে ক্রাউসেন্‌-হাইন বলে,—মনে থাকে যেন, মন স্থির করার জন্য মাত্র পাঁচ মিনিট!

এ কথার কোনো উত্তর না দিয়ে ফেডার গিয়ে বেঞ্চের ওপর বসে। মেঝের দিকে তাকায়। ভাববার আর কি আছে! আর চিন্তা করার জন্য পরিবেশের দরকার; কোনো মানুষের পক্ষে বর্তমানের পরিবেশ থেকে নিজেকে মুক্ত করে নিয়ে চিন্তা করাটাও অসম্ভব। তাও আবার বিচারবিবেচনা করে।

দেওয়ালের দিকে তাকাতে ভয় করে! রক্তের ছিটেগুলো সাদা রঙ ভেদ করে ফুটে উঠেছে! এই লুকোনো রক্তের ফোঁটাগুলো যেন আরো ভয়াবহ। এর চেয়ে রক্তে মাখামাখি থাকলেও এতোটা ভয় ধরতো না। মেঝেতে রক্তের দাগ কম।

কালো রঙের মেঝেটা দেখে বোঝা যায়, ইন্‌ট্রোগেসানের সময় ঘরটা রীতিমতো কসাইখানা হয়ে ওঠে। মেঝের পাথরগুলো জায়গায় জায়গায় ভেঙে গেছে, কোনো ভোঁতা জিনিস দিয়ে আঘাত করার ফলে।

যে বেঞ্চটাতে ও বসে আছে, কে জানে কতো হতভাগা পুরুষ এবং স্ত্রীলোক এ বেঞ্চটাতেই এসে বসেছে; যাদের প্রায় সবারই হাড় এতোদিনে চুল্লীর ছাইয়ের সঙ্গে মিশে গেছে।

যদিও ফেডার আপ্রাণ চেষ্টা করে মনটাকে ওদিক থেকে ঘোরাতে, তবু বাস্তবের পরিপ্রেক্ষিতে মনের জানালাটা বোধহয় বন্ধ করা সম্ভব নয়। এক এক সময় নিজেকে ট্যুরিষ্টের মতো মনে হয়। যেন পাখীর দৃষ্টি নিয়ে পুরোনো কোনো ধ্বংসাবশেষের ফসিল অন্ধকারে দেখে চলেছে। এবং চোখের সামনে এই ধ্বংসাবশেষের বাসিন্দারা যেন অবয়ব ধরে ঘুরে বেড়াচ্ছে।

পাঁচ মিনিট শেষ হলে ক্রাউসেন্‌হাইন মেঝেটা পেরিয়ে এসে ওর মুখোমুখি দাঁড়ায়। এতো কাছে যে ফেডার যদি হঠাৎ উঠে দাঁড়ায়, তবে ওর মাথার সঙ্গে ক্রাউসেন্‌হাইন-এর নাকটা ঠুকে যাবে।

—কি ঠিক করলে? কর্কশ গলায় জিজ্ঞাসা করে ক্রাউসেন্‌হাইন।

—ঠিক করার কিছু নেই। ক্লান্ত স্বরে জবাব দেয় ফেডার। আমি তো আপনাকে আগেই বলেছি যে আমি ক্রিসাউ সার্কেলের মেম্বার নই; তাদের কার্যকলাপ সম্পর্কেও আমি সম্পূর্ণ অজ্ঞ। সুতরাং হিটলারের জীবননাশের চেষ্টা-ই বা আমি কেন কবতে যাবো, অথবা এ ব্যাপারে কোনো খবরও আমি রাখি না।

—এটা সত্যি কথা হলো না। যাক্‌গে। ক্রাউসেন্‌হাইন ডেস্কের সামনে নিজের জায়গায় ফিরে আসে। কলিংবেলের বোতামটা টেপে। সঙ্গে সঙ্গে দরজাটা খুলে দু'জন গার্ড এসে ঘরে ঢোকে।

ক্রাউসেন্‌হাইন ওদের দিকে তাকিয়ে বলে,—এগারো নম্বর ব্লকের সতেরো নম্বরের সলিটারী সেলে একে নিয়ে যাও।

তখন অবশ্য ফেডার এগারো নম্বর ব্লক মানে কিছুই বুঝতে পারেনি। কিন্তু আউস্‌ভিৎজ্‌ ক্যাম্প তিনটের মধ্যে এই ব্লকটাই সাংঘাতিক। এই ব্লকের চার দেওয়ালের ভেতরে যতো রকমের বীভৎস অত্যাচার বন্দীদের ওপর হতে পারে, হয়েছে। আঠারোটা ব্লকের মধ্যে 'বিধ্বংসকারী ব্লক' হিসেবে এগারো নম্বর ব্লক পরিচিত। বাইরে থেকে কবরখানা বলে মনে হয়। সেইরকমই শীতল এবং বিষণ্ণ।

সিঁড়ির ছ'টা পাথরের ধাপ পেরিয়ে বিরাট বড়ো একটা পুরনো ভারী দরজা। নিরেট শক্ত করে ভেতর থেকে বন্ধ। ক্যাম্পের মধ্যে এই ব্লকের দরজাটাই দিনরাত চব্বিশ ঘণ্টা বন্ধ থাকে।

দরজাটার কাছে এগিয়ে গিয়ে একজন গার্ড কলিং বেল টেপে। বাড়ীটার কমপাউণ্ডে ইতস্ততঃ বন্দীর দল ঘুরে বেড়াচ্ছে, তারের বেড়া দেওয়া সতর্ক ঘেরাটোপের মধ্যে। এতো বড়ো আর ভারী দরজায় তালা ঝুলানোর কোনো মানে হয় না। কোনোক্রমে কোনো বন্দী বাড়ীটার ভেতর থেকে বেরোতে পারলেও কমপাউণ্ড পেরোনো অসম্ভব।

বন্ধ দরজার পাশের ছোট্ট একটা গরাদ দেওয়া জানালা খুলে একটা গার্ড ওদের তিনজনকেই শ্যেন চোখে জরীপ করে। তারপরে দরজাটা একটু ফাঁক করে ধরে। গার্ড দু'জনে ওকে ধাক্কা দিয়ে ভেতরে ঠেলে দেয়। ফেডার

গিয়ে হুমড়ি খেয়ে পড়ে ঠাণ্ডা নারকীয় পরিবেশে। করিডর ধরে কিছুটা এগিয়ে সেলটা।

দরজার লোহার গরাদগুলো নেমে আসে তক্ষুনি। গরাদ তো নয়, যেন সাক্ষাৎ ধারালো গিলেটিন এটা। দরজাটা বন্ধ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে বুকের ভেতরে কাঁপন লাগে ফেডারের। চেষ্টা করেও কাঁপুনিটা লুকোতে পারে না। মনে হয় পুরনো কোন এক ভুলে যাওয়া বীভৎস অতীতের মধ্য দিয়ে ও হেঁটে চলেছে; চারপাশে মৃতদেহ ছড়ানো। পাথুরে করিডর দিয়ে হেঁটে যাওয়ার শব্দটা সারা ব্লকে প্রতিধ্বনিত হচ্ছে। করিডর তো নয়, মর্গ। পায়ের শব্দের প্রতিধ্বনিটাও চারপাশের মৃত্যুশীতল নীরবতাকে ভাঙতে পারছে না।

আঙুলের নখে পিন ফোটানো ছাড়া দৈহিক আর কোনো অত্যাচার এখনো পর্যন্ত ওকে সহ্য করতে হয় নি। তাই মনে হচ্ছিলো, গেষ্টাপোরা ওর সঙ্গে নরম ব্যবহারই করছে।

দরজার সামনে দাঁড়িয়ে খুনী দু'টো ওকে সেলের ভেতরে ধাক্কা দিয়ে ঠেলে দেয়। সেলের মধ্যে ও একা। অবশ্য তখন পর্যন্ত ও জানতো না, আউস্‌ভিৎজের নিকৃষ্টতম সেলের মধ্যে ও বন্দী। এতোদিন পর্যন্ত নিজেকে ভাগ্যবান বলেই ভেবেছিলো ফেডার! অন্ধকার স্যাঁতসেঁতে ঘর। শুধু দেওয়াল আর ছাদের মাঝখানের ফাঁক দিয়ে মৃদু একটা আলোর রেখা দেখা যাচ্ছে। ফেডার পায়ের গোড়ালিতে ভর দিয়ে আলোর রেখাটা ছুঁতে চেষ্টা করে। কিন্তু নাগাল পায় না।

তাকিয়ে দেখে সেলের কোণে ছোট্ট সরু একটা চৌকি। তিনটে তক্তা কোনোরকমে জোড় দেওয়া। ইঞ্চি চারেক উঁচু চারটে কাঠের টুকরোর ওপর বসানো। বিছানাপত্তর বলতে কিছু নেই। দিনের বেলাতেও প্রচণ্ড রকমের ঠাণ্ডা। সুতরাং রাত্রিবেলা কিরকম ঠাণ্ডা হবে অনুমান করা যায়।

মেঝেটা নোংরা; পোকামাকড়ে ভর্তি। দেওয়ালে আর মেঝেতে রক্তের দাগ। চুনকাম করার পরেও মোছে নি।

চৌকির একপাশে মাথাটাকে দু'হাতের তালুর মধ্যে নিয়ে বসে পড়ে ফেডার। গত চব্বিশ ঘণ্টার ব্যাপারগুলোকে টুকরো টুকরো করে ভাবতে চেষ্টা করছে। বদ্ধ স্যাঁতসেঁতে ঘরের গুমোট আবহাওয়ায় মনে হয় ঘরটা মাটির নীচেকার। কিন্তু যতোদূর মনে পড়ে সিঁড়ির ছ'টা ধাপ পেরিয়ে তো ও ওপরে উঠেছিলো।

এই নিঃসঙ্গ মুহূর্তে, যখন কোনো জুডাসও দরজার ফাঁক দিয়ে ওকে পর্যবেক্ষণ করছে না, তবু ওর মনে হয় ও ভেঙে পড়ছে। অন্ততঃ মনের দিক থেকে। অবশ্য এই সময় মনটাকে উদাস করতে পারলে হয়তো বা কিছুটা যন্ত্রণার হাত থেকে রেহাই পাওয়া যেতে পারে।

ফেডার ভালো করেই জানে যে ওর মুক্তির পথ বন্ধ। তা সে ও মুখ খুলুক আর নাই খুলুক। বড়ো জোর এদের কাছ থেকে তৎক্ষণাৎ মৃত্যুটাকে আশা করা যায়। তবে সাধারণ জার্মানদের মতো ও জানে, গেষ্টোপারা সেই সহজ হত্যার ধারেকাছেও ঘেঁষে না। ওদের একমাত্র লক্ষ্য, যতোদূর সম্ভব যন্ত্রণাটাকে টেনে দিয়ে বন্দীদের তিলে তিলে হত্যা করা।

ফেডার জানে না ভাগ্য ওকে কোথায় নিয়ে যাবে। অনাহারে মারধোর খাওয়া শরীরটাকে নিয়ে ধুঁকতে ধুঁকতে লেবার ক্যাম্পে অথবা চুল্লীতে জীবন্ত পুড়তে হবে। কে বলতে পারে? কিন্তু কপালে যা-ই থাকুক, কিছুতেই ও মুখ খুলবে না।

মাথার ভেতরে আগুনের অক্ষরে কথাগুলোকে লেখে ফেডার। যে রকম ইচ্ছে অত্যাচার ওরা করুক, ওর মুখ থেকে কিছুতেই ওরা কথা বার করতে পারবে না।

এই সেলের ভেতরের চব্বিশ ঘণ্টাটাই ওর বোধহয় শেষ সুযোগ। অবশ্য এটাকে যদি আরাম বলা যায়। এর পরে শুরু হবে চাপ। তারপরে? ও নিজেও জানে না।

জীবনের কোনোকিছু সম্পর্কে এতোটুকু মায়াবোধ ওর নেই। ইন্‌ট্রোগেসানের সবেমাত্র শুরু। যেখানে গিয়ে শেষ হয় হোক। এমনকি এটা যদি ওকে কবরখানাতেও টেনে নিয়ে যায়, তাতেও দুঃখিত নয় ফেডার।

প্রত্যেক জার্মানই জানে, ডজনখানেক ক্যাম্পের বিষণ্ণ দেওয়ালগুলোর

আড়ালে কী ঘটনাপ্রবাহ প্রতিটি মুহূর্তে ঘটে চলেছে। শুধু না-জানার ভান করে যেন সবাই কালা আর বোবা।

সত্যি বলতে কি, এই কনসেনট্রেশন ক্যাম্পগুলোর অত্যাচারের কথা শুনেই ফেডার মনস্থির করেছিলো। নাৎসীবিরোধী দলে নাম লিখিয়েছিলো। নইলে অন্যান্য চুপ করে থাকা জার্মানদের মতো নিজেও অপরাধী হতো।

নাৎসীবিরোধী দলে নাম লেখাতে যেটুকু অসুবিধা ছিলো, বেলসন্ এবং দাচাউ কনসেনট্রেশন ক্যাম্পের কথা শুনে সেটুকু দ্বিধা মুহূর্তে উবে গিয়েছিলো। ও দুটো ক্যাম্পে অনাহারে দৈনিক এতো লোক মরছে যে পোড়ানো বা কবর দেওয়ার কোনো প্রশ্নই ওঠে না। মৃতদেহগুলো এদিক ওদিক ছড়িয়ে ছিটিয়ে পড়ে থাকে। মানুষ খেতে না পেয়ে এমন এক জায়গায় পৌঁছে গেছে, যে ইঁদুরের মাংস পেলে তাই বর্তে যায়। এখানে বোধহয় নাৎসীদের প্রচেষ্টা সফল হয়েছে। মানুষকে তার মনুষ্যত্বের সিংহাসন থেকে চরম ধুলোয় টেনে নামিয়েছে।

ক্রিসাউ সার্কেলের নেতা ভন্ প্লুজে ঠিক এই কারণেই একদল ছেলেমেয়ে নিয়ে প্রতিজ্ঞায় নেমেছে, যেমন করে হোক, এ হিটলারী বাহিনীকে ধ্বংস করতেই হবে। যে দেশে নাৎসী সেলাম না দিলে প্রাণ রাখা দায়, সেখানে ভন্ প্লুজের মতো সাহসী পুরুষ সত্যই বিরল। সেই ভন্ প্লুজের অর্গানাইজেশনে কাজ করতে পেরে নিজেকে ভাগ্যবান মনে করে ফেডার।

ঠিক এই মুহূর্তে ভন্ প্লুজে অথবা নাৎসীদের কথা ভাবে না ফেডার। ওর মনটাকে একটা সুচিমুখ জিজ্ঞাসাই ক্ষতবিক্ষত করছে। কে ওর প্রতি বিশ্বাস-ঘাতকতা করলো?

নিশ্চয়ই ক্রিসাউ সার্কেলের কেউ নয়! ক্রিসাউ সার্কেলের সভ্যদের পক্ষে বিশ্বাসঘাতকতা করা সম্ভব নয়। বাইরের কেউ। কারণ জার্মানির সবাই জানে, এতোটুকু কথা গেষ্টাপোদের কানে ওঠাতে পারলেই ওরা গ্রেপ্তার করে। আর কোনোক্রমে ওদের হাতে পড়লে, বাইরের পৃথিবীতে জীবন্ত আসা অসম্ভব।

কিন্তু বাইরের কে হতে পারে? মিছিমিছি মানুষকে সন্দেহ করে ছোট করা কারোর পক্ষেই উচিত নয়। ফেডার তো পরিচিত কারোর মুখে বিশ্বাস-ঘাতকতার ছাপ দেখতে পায় না! অবশ্য যদি সত্যি কেউ ওর প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা করে থাকে, শুধুমাত্র সেন্টিমেন্টের দোহাই দিয়ে তাকে ছেড়ে দেওয়াও উচিত নয়। সুতরাং আপ্রাণ চেষ্টা করে খুঁজে বার করবে ফেডার, কে সেই বিশ্বাসঘাতক।

চিন্তাভাবনার সাগরে হঠাৎ একটা মুখ ঝিলিক দিয়ে ওঠে। ওর প্রেমের

ক্ষেত্রে প্রতিদ্বন্দ্বী। অর্থাৎ ওর প্রেমিকা কেটোর জন্য প্রায় পাগল হাইনরিখ্ গ্লোভ। বার্লিনের অভিজাত ওয়েষ্ট এণ্ড অঞ্চলের সিগারেট ব্যবসায়ী। গ্লোভ হলো সেইসব ব্যবসায়ীদের একজন, যারা প্রচুর টাকা ঘুষ দিয়ে তবে নাৎসী পার্টির ঝামেলা এড়িয়ে ব্যবসা করছে। হিটলার যখন ফ্যুয়েরার হয় নি, তখনই গ্লোভ প্রচুর টাকা দিয়েছে পার্টিকে। যার জন্য ওকে নাৎসী পার্টির মেম্বার পর্যন্ত হতে হয় নি। তবে ওকে নাৎসী পার্টির গোয়েন্দা বলে সন্দেহ করে।

কিন্তু গ্লোভের বিরুদ্ধে অভিযোগ আনার মতো প্রমাণ ওর হাতের কাছে কোথায়? আর থাকলেই বা কি হবে?

যদি ও সত্যই নাৎসী পার্টির গোয়েন্দা হয়, তবে তো সাতখুন মাফ। অবশ্য অন্যান্য ব্যবসায়ীদের মতো ওকেও প্রটেক্শান-মানি দিতে হয়।

ফেডাব যখন রাশিয়ান ফ্রণ্টে, তখনই শুনেছিলো গ্লোভ নাকি কেটোর পেছনে ঘুরঘুর করছে।

কেটো অবশ্য গ্লোভকে ভালোভাবেই চিনতো। আসলে কেটোর বাবাবও সিগারেটের ব্যবসা ছিলো। সেই ব্যবসাসূত্রেই উভয়ের আলাপ।

কেটোর পেছনে গ্লোভের ঘোরাটা যদি সত্যিও হয়, ফেডার কি করতে পারতো? তখন জীবন-মৃত্যুর মাঝখানে দাঁড়িয়ে ও যুদ্ধ করছে, রাশিয়ান ফ্রণ্টে। ওর লেখা চিঠির উত্তরে, কেটো ওকে ববাবব নিশ্চিন্ত থাকতে বলেছে। ও যেন কোনোরকম চিন্তা না করে। অন্ততঃ এসব বিষয়ে। কেটো ওব। একান্তভাবেই ফেডারের।

আসলে ব্যাপারটা হলো, মা যেতে রাজী হয় নি বলে বাবার সঙ্গে কেটোকে যেতে হয়েছিলো একটা পার্টিতে, সেখানেই বাবা পরিচয় করিয়ে দিয়েছিলেন হাইন্রিখ গ্লোভের সঙ্গে। তারপরের কয়েকমাস ধরে গ্লোভ ক্রমাগত চেষ্টা করেছে ওর ঘনিষ্ঠ হবার জন্য।

কেটোর এই চিঠি পাওয়ার পরেই ফেডার চেষ্টা চরিত্র করছিলো ছুটির জন্য। যাতে ছুটির মধ্যে বিয়েটা সেরে ফেলতে পারে। প্রথমে ওরা ঠিক করেছিলো এ যুদ্ধ শেষ না হলে বিয়ে করবে না। কিন্তু রাশিয়ানদের অগ্রগতি এবং গ্লোভের ঘুরঘুর, এ দুটোকে যোগ করে ফেডার মনস্থির করে ফেলে। না, আর দেরী না করে বিয়েটা সেরে ফেলাই উচিত!

কিন্তু ব্যাপারটার গুরুত্ব বুঝতে না পেরে কেটো-ই গোলমালটা করে দিলো। কেটো বিয়ের সংবাদটা চেপে না রেখে চাউর করে দিতেই ওর মঞ্জুর হওয়া ছুটিটা যুদ্ধকালীন জরুরী অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে হঠাৎ বাতিল হয়ে যায়।

—ছ' মাসেব মধ্যে আবাব আমার বেশীর ভাগ দিন বোতলের মধ্যে কেটেছে।

—বোতল? সেটা আবার কি?

ফেডাবের বিস্মিত জিজ্ঞাসায় ডলম্যান ব্যাপারটার বিস্তারে আসে,—সেটা হলো একটা বিশেষ ধরনের সলিটারী সেল। ঢোকার জায়গাটা বোতলের গলার মতো সরু; কোনো সিঁড়িটিড়ি নেই। ম্যান্‌হোলের ভেতর দিয়ে ছুঁড়ে দেয়। আব লোকটা গিয়ে ধপাস করে পড়ে প্রায় আট ফুট নীচে। অন্ধকার। গোল বোতলেব মতো চারিদিকটা। কিন্তু গলায় কড়া আর্ক লাইট্ ফিট করা। যেন ছিঁপি আঁটা। গার্ডরা সময় সময় লাইট্‌টা জ্বালিয়ে দেখে লোকটা কি করছে? আলোটা জ্বালালে মনে হয়, অন্ধকারই ভালো। আর অন্ধকারে মনে হয়, আলোটা জ্বললেই বাঁচি। গোলাকার দেওয়ালের গুপ্ত একটা জায়গায় মাইক্রোফোন লাগানো। ঘুমের ঘোরেও যদি আপন মনে বকো, সেটাও শক্তিশালী মাইক্রোফোনে ধবা পড়ে যাবে। যদিও বোতলেব মধ্যে ঘুমোবার উপায় নেই।

—কিন্তু তোমায় দেখে তো মনে হয় না অন্যান্য বন্দীদের মতো তোমাব ওপরেও অত্যাচার করেছে! সত্যি বলতে কি, অনাহারে হাড় পাঁজরা বার করা অন্যান্য বন্দীদের চেয়ে ডলম্যান অনেক স্বাস্থ্যবান।

—আমার ওপরে এক্সপেরিমেণ্ট চালাচ্ছে বলেই আমার স্বাস্থ্য ভালো দেখতে পাচ্ছো।

কথাটা শুনে ভয়ে কুঁকড়ে যায় ফেডার। যতোটুকু বা বাঁচার আশা ছিলো তা' মুহূর্তে উবে যায়।

—তার মানে মানুষকে গিনিপিগ্ হিসেবে ব্যবহার?

বাইবে থাকতেই ফেডার শুনেছিলো, দাচাউ, আউস্‌ভিৎজ্ প্রভৃতি কন্‌-সেনট্রেশন ক্যাম্পে বন্দীদের ওপর বিভিন্ন ধরনের এক্সপেরিমেণ্ট চালানো হয়।

—সেই জন্যই তো আমাকে খাইয়ে দাইয়ে মোটা করে রেখেছে যাতে ভালোভাবে এক্সপেরিমেণ্ট চালাতে পারে!

—তাব মানে গিনিপিগ্ হতে রাজী হলেই ভালো খাওয়া দাওয়া আর ভালো সেলে থাকতে দেয়?

ওর কথায় ডলম্যান ফেডারের দিকে তাকায়। আগাপাস্তলা জরীপ করে নিয়ে কানে কানে বলে,—দেখো বাপু, আউস্‌ভিৎজেব অন্যান্য সেলের তুলনায় এ সেলটা হলো মার্কগ্রাফেন ষ্ট্রাসের ফার্ষ্ট ক্লাস হোটেলের লাক্‌সারী রুমের

মতো। বুঝলে? আর কোনো ব্যাপারেই রাজী-গররাজীর প্রশ্ন আউস্‌ভিৎজে আসে না।

ফেডার বোঝে প্রশ্নটা বোকার মতো হয়ে গেছে। তাই একটু ঘুরিয়ে নিয়ে বলে, — না, ঠিক রাজী নয়; যদি বাধা দেয়?

— আউস্‌ভিৎজে কনসাল্ট করা হয় না। বাছা হয়। দেখো, আমার মতো ভাগ্যবান খুব কমই আছে। হয়তো এরা আমার কিডনীর ওপরে অথবা গল-ব্লাডারের ওপরে এক্সপেরিমেন্ট চালাবে। সেই জন্যই ছ' মাস ধরে খাইয়ে দাইয়ে মোটা করেছে। এখানে একবার এক্সপেরিমেন্ট চালাতে শুরু করলে কেউ ছ' সপ্তাহও টেঁকে না। আর যদি বা ভাগ্যক্রমে টিঁকে যায়, তবে বাকী জীবনটা পঙ্গু হয়েই কাটাতে হয়। তবু তো আমাকে এগারো নম্বর ব্লকে থাকতে দিয়েছে। যে রকমই হোক না কেন! নইলে লেবার ক্যাম্পে যেতে হতো। আর লেবার ক্যাম্পে কোমর পর্যন্ত বরফ জলে ডুবিয়ে নর্দমা খোঁড়াখুঁড়ি অথবা খনির নীচের অন্ধকারে কাজ। খুব কম শ্রমিকই এর পর বেঁচে থাকে।

— ওরা মানুষকে কেন গিনিপিগ্‌ হিসেবে ব্যবহার করে?

ফেডারের জিজ্ঞাসায় ডলম্যান উত্তর দেয়, — এর সব কারণ আমারও জানা নেই ভাই। তবে বিভিন্ন ধরনের জীবাণু ইনজেক্‌সান করে শরীরের ভেতরে ঢুকিয়ে দেয়। এক কথায় শরীরটাকে জীবাণু চাষের জমি হিসেবে ব্যবহার করে বলতে পারো। জানি না, আমাকেও সে হিসেবে ব্যবহার করছে কিনা! সে ক্ষেত্রে আমি ভবিষ্যতে বুঝতে পারবো। যখন শরীরের ভেতরে জীবাণুগুলো নড়াচড়া করে উঠবে।

ফেডার বুঝতে পারে, এখানে — এই আউস্‌ভিৎজে সবকিছুই লটারীর মতো। ন্যায়-অন্যায়, ইচ্ছে-অনিচ্ছে বিচার-অবিচার বলে কিছুই নেই। কি ধরনের অপরাধী সে প্রশ্ন ওঠে না। একজন খুনী অথবা ফ্যুয়েরারকে স্যালুট করতে গররাজী হওয়া কোনো ব্যক্তির আত্মীয়র মধ্যে কোনো তফাৎ নেই। যতো এসব ভাবে ফেডার, ততো এদের বিরুদ্ধে লড়বার জন্য মনের ভেতরে দৃঢ়তা আসে।

—তোমাকে এখানে কী অপরাধের জন্য নিয়ে আসা হয়েছে? ফেডার জিজ্ঞাসা করে।

—যে অপরাধের জন্য সবাই এখানে এসেছে! অর্থাৎ দেশের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র।

—সত্যি কি তুমি ষড়যন্ত্র করেছিলে?

ফেডারের এ প্রশ্নে ডলম্যান এবার কিছুটা উত্তেজিত হয়ে ওঠে,—তোমার এ প্রশ্নের উত্তর আমি দেবো না। না, কখনো না। এমন কি তোমায় যদি বহু বছর ধরে জানতাম, অন্তরঙ্গ বন্ধু অথবা নিকটতম আত্মীয়—যাই হও না কেন?

—স্যরি! ফেডার বোঝে সোজাসুজি এ ধরনের প্রশ্ন করাটা ঠিক হয় নি। বরং অন্যায়।

—দেখো, তোমায় সতর্ক করে দিচ্ছি, যখন অন্যান্য বন্দীদের সঙ্গে মিশবে, কেউ তোমায় তোমার কথা জিজ্ঞাসা করলেও মুখে রা-টি কাটবে না। কি করে জানবে কে স্পাই? এমন কি তুমিও স্পাই হ'তে পারো!

—তার মানে ওরা বন্দীদের ভেতরেও ওদের এজেন্ট ছেড়ে রাখে! এর চেয়ে ঘৃণ্যতম কাজের কথা যে চিন্তা করাও যায় না।

ফেডার ছোট্ট সেলটাতে কয়েকবার অস্থির ভাবে পায়চারী করে। ওপরের যে দেওয়ালের ফাঁক দিয়ে আলোব কয়েকটা রশ্মি আসছে, সেদিকে তাকায়। জুডাস জানালাটা আড়াআড়ি ভাবে পার হয় কয়েকবার। তারপর এগিয়ে এসে বিছানায় বসে থাকা ডলম্যানের মুখোমুখি স্থির হয়ে দাঁড়ায়।

—আমাকে চব্বিশ ঘণ্টা সময় দিয়েছে। মনস্থির করার জন্য। যা জানি, তা' যদি ওদের বলি তবে ওরা আমার মুক্তির ব্যবস্থা করে দেবে বলে শপথ করেছে। অবশ্য ওদের শপথের মূল্য কতোটুকু তা আমি জানি! সুতরাং ভেবেছি কিছুই বলবো না। কিন্তু না বললে কপালে কি জুটতে পারে?

—সব কিছু। একমাত্র আরাম ছাড়া। ডলম্যান নিরাসক্ত ভঙ্গীতে উত্তর দেয়।

সারাদিন ফেডারকে কিছু খেতে দেয় নি। পরের দিন সকালে এক বাটি জলের মতো পাত্‌লা স্যুপ। এটাই সারাদিনের খাওয়া।

প্রথম বারোটা ঘণ্টা কোনোরকমে কেটে গেছে। কিন্তু পরের বারো ঘণ্টা

যেন কাটতেই চায় না। প্রতিটি মুহূর্তকে অত্যন্ত ভারী আর দীর্ঘ বলে মনে হয়। সবচেয়ে বড়ো কথা, নির্দিষ্ট সময় যতো এগিয়ে আসে, উদ্বেগ ততো বাড়ে। একবার যা হোক্ কিছু একটা মীমাংসা হয়ে গেলে মনটা হয়তো স্থির হবে। অন্ততঃ পরের শাস্তির জন্য মনটাকে ঠিক করতে পারা যায়।

সেলের ভেতরে অশান্ত পায়ে পায়চারী করে ফেডার। এগারো নম্বর ব্লকেব বাইরের পৃথিবীর সঙ্গে যেটুকু যোগাযোগ তা' ঐ দেওয়ালের ফাঁকটুকু দিয়ে।

ডলম্যানের সঙ্গে কথাবার্তা বলতে যা দু'এক টুকরো। কারণ উভয়েই অপেক্ষা করছে গেষ্টোপাদের মুখোমুখি হবার জন্য। কার কপালে কি শাস্তি লেখা আছে কে জানে! সমস্ত ব্লকটাই নিশ্চুপ। মাঝে মাঝে বন্দীদের অস্পষ্ট কোলাহল। গেষ্টোপাদের কর্কশ গলার চিৎকার—শব্দগুলো যেন মৃত : জীবনের কোনোরকম চিহ্ন সেখানে নেই।

রাত্রিবেলা সরু বিছানাটাতে ডলম্যানের সঙ্গে ভাগাভাগি করে শোয়। কিন্তু ওর ঘুমের মধ্যে ছট্‌ফটানি, মাঝে মাঝে আর্তনাদে, ফেডার সারাটা রাত দু' চোখের পাতা এক করতে পারে না। একই সেলে আরেকজন বন্দীর ঘুমের ঘোরে কাতরোক্তি, জুডাস জানালাটায় হঠাৎ গেষ্টোপাদের মুখ—সব মিলিয়ে এটাও একটা চরম অত্যাচার।

শেষমেষ, ঘুমের আশা ছেড়ে দিয়ে বিছানা ছেড়ে উঠে পড়ে ফেডার। কিছু সময় সেলের মধ্যে ঘোরাঘুরি করে ঘরের কোণে বসে পড়ে। হাঁটুর ওপর মুখ রেখে দরজার দিকে তাকায়।

ধীরে ধীরে দেওয়ালের ফাঁকের অন্ধকারটা পাতলা হয়ে আসে। হাল্‌কা আলোর রেখা দেখা দেয়। ফেডার বোঝে আরেকটা দিনের সকাল হলো। সামনের দিনটায় কি অত্যাচার ওকে সহ্য করতে হবে, একমাত্র ভবিতব্যই তা' বলতে পাবে। ভয়ে বুকটা কেঁপে ওঠে।

সেলের দরজাটা খোলে। ওয়ার্ডার একবাটি স্যুপ দেয়। একবার ভাবে ফেডার, হঠাৎ ওয়ার্ডারকে আক্রমণ করে বসলে হয়, তা'হলে গেষ্টোপারা ওকে গুলি করে হত্যা করবে। অন্ততঃ তিলে তিলে মরতে হবে না এই ভাবে। কিন্তু পরের মুহূর্তে নিজেকে সামলে নেয়। ওকে যদি মেরে ফেলাটাই উদ্দেশ্য হতো, তা'হলে অনেক আগেই গুলি করতো। কিন্তু ওদের প্রয়োজনেই ওকে বাঁচিয়ে রাখা হয়েছে। এবং হবেও। তা' সে ও যাই-ই করুক না কেন।

শেষের বারো ঘণ্টা পার হলে ওকে আবার ইন্‌ট্রোগেটারের অফিসে নিয়ে যাওয়া হয়।

ক্রাউসেন্‌হাইন ডেস্কে বসে আছে। দৃঢ় ভঙ্গিতে। গার্ড দু'জন ওকে নিয়ে ঘরে ঢুকলে ফুট দু'য়েক জায়গাটা দেখিয়ে দিয়ে বলে,—এবার তোমরা বাইরে যেতো পারো। তারপর ওর দিকে ফিরে বলে,—ইয়েস্ মিষ্টার সেলেনবার্গ, মনে হয় মনটাকে স্থির করতে পেরেছো এতোক্ষণে! অতি মোলায়েম কণ্ঠস্বর ক্রাউসেন্‌হাইনের।

—আমি তো আপনাকে আগেই বলেছি। ফেডার জোর করে গলার স্বরের কাঁপুনিটাকে দমন করে। আমার মনস্থির করার কিছুই নেই। এ বিষয়ে আমি সম্পূর্ণ অজ্ঞ। আর আমার বিরুদ্ধে যেসব অভিযোগ আনা হয়েছে, তা' সর্বৈব মিথ্যে।

—তাই নাকি? ক্রাউসেন্‌হাইন সহজ ভঙ্গীতে বলে। যাইহোক, ভেবেছিলাম মিছিমিছি আব তোমাকে বিবক্ত করবো না। তা' তুমি যখন এতো একগুঁয়ে তখন আমাদের দিকটাও ভেবে দেখতে হবে বৈকি। অবশ্য তাড়াহুড়োর কিছু নেই। যথেষ্ট সময় আছে। সুতরাং একটু আধটু দাওয়াই শুরু করা যাক্। কি বলো?

কথাটা শেষ করে ক্রাউসেন্‌হাইন টেবিলের ওপরের বেলটা টেপে। একটা গার্ড প্রায় সঙ্গে সঙ্গে এসে হাজির হয়।

—ডাক্তার ষ্ট্রপকে বলো যেন কয়েক মিনিটের জন্য এখানে আসেন। ওঁর জন্য একটা ইন্‌টারেসটিং কেস্ আছে।

বেশ কিছুক্ষণ ফেডার বেঞ্চে বসে মেঝের দিকে তাকিয়ে থাকে। কিছুক্ষণ পরে সাদা এপ্রোন পবিহিত ডাক্তার ঘরে ঢোকে। এই সেই কুখ্যাত ডাক্তাব উইলহেলম্ ষ্ট্রপ। কলোনিয়ল-ইন্-চার্জ। এক্সপেরিমেন্টাল ডিপার্টমেণ্ট। দু' নম্বর আউস্‌ভিৎজের।

ডাক্তার ষ্ট্রপ ঘরে ঢুকতেই ক্রাউসেন্‌হাইন আহ্বান জানায়,—আসুন ডাক্তার। একজন অসুস্থ কিন্তু একগুঁয়ে রুগীর সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিই। আপনার একটু আধটু দাওয়াইয়ে বোধকরি উপকার হবে।

মোটা লেন্সের চশমার কাঁচের ভেতর দিয়ে ডাক্তার ষ্ট্রপ ওকে নিরীক্ষণ করে। কয়েক মুহূর্ত ধরে।

—ষ্ট্যাণ্ড্ আপ! একটু ভদ্রতাজ্ঞান পর্যন্ত নেই; ইউ সোয়াইন্। চিৎকার করে ওঠে ক্রাউসেন্‌হাইন।

ক্রাউসেন্‌হাইনের হঠাৎ চিৎকারে বেশ হকচকিয়ে যায় ফেডার। উঠে দাঁড়ায়। এবার থেকে বোধহয় সত্যিকারের গেষ্টাপোদের মুখোমুখি হতে হলো।

—ঘুরে দাঁড়াও। ষ্ট্রপ বলে।

পেছন থেকে হয়তো বা গুলি করবে, ভয়ে ভয়ে ফেডার ঘুরে দাঁড়ায়। দেওয়ালের দিকে মুখ করে।

হঠাৎ ষ্ট্রপ ওর মাথার চুলগুলো মুঠো করে টেনে ধরে প্রায় গালের কাছে নামিয়ে আনে। কয়েক মিনিট চোখে চোখ রেখে তারপর ছুঁড়ে দেয়! ভারসাম্য বজায় রাখতে না পেরে এতো জোরে মাটির ওপরে হুমড়ি খেয়ে পড়ে যে সানের সঙ্গে মাথা ঠোকার শব্দে মনে হয় মাথাটা ফেটে বুঝি চৌচির হয়ে গেল। ঘোরের মতন লাগে।

—ঠিক আছে, মনে হয় ঠাণ্ডা করে দিতে পারবো। ক্রাউসেন্‌হাইনের দিকে তাকিয়ে বলে ডাক্তার ষ্ট্রপ। আমার ল্যাবরেটারীতে পাঠিয়ে দিন।

পুরো করিডরটা পেরিয়ে গিয়ে ছোট্ট একটা ঘরের ভেতরে ওকে ছুঁড়ে দেয় গার্ডটা। একেবারে ওপরের দিকে একফালি একটা জানালা। ছাদের কাছাকাছি।

আবার সেই নিঃসঙ্গতা। ফেডারের নিজেরই আশ্চর্য লাগে, তেমন নিষ্ঠুর ব্যবহার এরা এখনো করেনি। এই শয়তানের রাজ্যে যেটুকু পেয়েছে, তা' কিছুই নয়। অবশ্য এবার ও পড়েছে কুখ্যাত ডাক্তার ষ্ট্রপের হাতে। ভাগ্যে কি আছে, কে জানে!

এই ডাক্তারগুলো কার ওপরে কি ধরনের এক্সপেরিমেণ্ট চালাবে তা' স্থির করতে মুহূর্ত সময়ও নেয় না। রুগী কতোখানি দুর্বল তা' দেখে না। দেখে কতোখানি সহ্য করতে পারবে। যার চোখ খুব ভালো, তার চোখ উপড়ে নিয়ে চোখের ওপর এক্সপেরিমেণ্ট চালাবে। যার কিডনীর অসুখ, তার দিকে ফিরেও তাকাবে না। কিন্তু কিডনীর এক্সপেরিমেণ্ট চালাবে, সুস্থ লোকের ওপর। মেডিকেল এক্সপেরিমেণ্টের নামে এগুলো নিছকই অত্যাচার। নিরীহ বন্দীদের ওপর।

ফেডার চিন্তা করতে চেষ্টা করে ওর ওপরে কি ধরনের এক্সপেরিমেণ্ট চালাবে। যে ভাবে ওর চোখের দিকে তাকিয়েছিলো, হয়তো বা চোখ দুটো উপড়ে নেওয়া বিচিত্র নয়। তার মানে, চিরজীবনের জন্য এ পৃথিবীটা ওর কাছে অন্ধকার হয়ে যাবে। নিদেন একটা চোখ তো উপড়ে ফেলবেই। এটা ওদের একটা হবি। আই এক্সপেরিমেণ্টের নামে এরা যে কোনো একটা ভালো চোখ বেছে নিয়ে উপড়ে ফেলে।

কথাটা ভাবতেই ভয়ে সিঁটিয়ে ওঠে ফেডার। এর থেকে যে কোনো অত্যাচারও ভালো।

অবশ্য সময়ের সঙ্গে সঙ্গে নিজেকে কিছুটা প্রস্তুত করে নেয় ফেডার। ভয় পেয়ে লাভ কি ? বরং নার্ভাস হলে শত্রুপক্ষের সুবিধে।

শেষ পর্যন্ত কনসাল্‌টিং রুমে নিয়ে আসা হয় ওকে। ডাক্তার ক্রাম্‌নিৎস পরীক্ষা করে। এই ক্রাম্‌নিৎস এয়ারফোর্সের লোক। মেডিক্যাল ট্রেনিং বলতে কিছু নেই। কিন্তু হাই-অল্‌টিচুয়েডে মানুষের দৈহিক কী পরিবর্তন হতে পারে—তাই নিয়ে পরীক্ষা নিরীক্ষা চালাচ্ছে।

ফেডার বুঝতে পারে চোখ রেহাই দিয়ে মানুষের শরীরে সর্বনিম্ন কতো উত্তাপে প্রাণ স্পন্দন বজায় থাকে, তাই নিয়ে ওর ওপরে পরীক্ষা চালানো হবে। এ বিষয়ে ক্রাম্‌নিৎস নিজেকে একমাত্র বিশেষজ্ঞ দাবী করে।

ক্রাম্‌নিৎস প্রথমে এয়ার ফোর্সে যোগ দিয়েছিলো ফাইটার পাইলট্‌ হিসেবে। কিন্তু যুদ্ধ শুরু হতে না হতেই ওর প্লেনকে গুলি করে ফেলে দেওয়ায় লাইসেন্স বাতিল হয়ে যায়। তখনই নাৎসী পার্টিতে যোগ দিয়ে এক কনসেনট্রেশন ক্যাম্প ঘুরে ঘুবে যথেচ্ছ এবং নারকীয় এক্সপেরিমেণ্ট শুরু করে।

ক্রাম্‌নিৎসেব গর্ব যে ও সুস্থ মানুষের দেহের উত্তাপ এতো নীচে নামাতে পেরেছে যে তাকে মৃত-ই বলা চলে। সেখান থেকে আবার দেহের উত্তাপ বাড়িয়ে বাঁচিয়ে তুলেছে। কিন্তু কতো হাজার লোকের ওপর এক্সপেরিমেণ্ট চালিয়ে মাত্র ক'জনকে বাঁচিয়েছে, তার ইয়ত্তা নেই। তবু তাই নিয়েই ক্রাম্‌নিৎস সাফল্যের ঢাকঢোল পিটিয়ে চলেছে।

ক্রাম্‌নিৎস প্রথমে ওকে বিজ্ঞ চিকিৎসকের মতো পরীক্ষা করে। হার্টবীট্‌, ব্লাডপ্রেসার ইত্যাদি নোট করে। তারপর হাসিমুখে রায় দেয়,—হ্যাঁ, ফেডার এক্সপেবিমেণ্ট চালাবার উপযুক্ত।

ওকে ল্যাবরেটারীতে নিয়ে আসা হয়। ছোট একটা ঘর। দেখে মনে হয় আগাগোড়া ইস্পাতে গড়া। ঠিক ঘরের কেন্দ্রবিন্দুতে বেঞ্চ ধরনের একটা তক্তপোশ। শক্ত। ইটের মতো। ফেডারের মনে হয়, ওরা ওকে পাগল করে দেবে।

সেই তক্তপোশের ওপর ওকে জোর করে শোওয়ানো হয়। পা দুটো একত্রে আর হাত দুটো মাথার ওপর তুলে বাঁধে। পেটের ওপরে চামড়াব বেণ্ট কষে। যাতে এতোটুকু নড়াচড়া না করতে পারে। যদিও ফেডার চেষ্টা করে ভেতরের ভয়টাকে গার্ডদের কাছ থেকে লুকিয়ে রাখতে; তবু পারে না। শরীরটা কাঁপতে থাকে।

এতোক্ষণের চেপে রাখা ভয়টা আর যেন চেপে রাখা যায় না। মনের

জোরও অনেকটা কমে আসে। এখন ফেডার সম্পূর্ণ অত্যাচারীদের হাতে। আউস্‌ভিৎজ ক্যাম্পে যতোরকম ভয়াবহ অত্যাচারের কথা শুনেছে, সবগুলো একে একে চোখের সামনে ভেসে ওঠে।

ডাক্তার ট্রুপ আর ক্র্যাম্‌নিৎস পরীক্ষা করে ওকে। ওর বাঁধা কবজিতে আর হাতের ওপরে ডায়ালের মতো দুটো যন্ত্র বাঁধে। ঠিক বুকের ওপরেও অনুরূপ একটা যন্ত্র ফিট্‌ করে। এতোটুকু নড়বার উপায় নেই। শুধু মাথাটাই যা এদিক ওদিক হেলানো যায়। তবু অবজারভেশন প্যানেলটা নজরে আসে না। বাঁধাছাঁদা হলে সবাই ঘর ছেড়ে বেরিয়ে গেলে দরজাটা অটোমেটিক বন্ধ হয়ে যায়। ভয়ে উৎকণ্ঠায় ফেডার আপ্রাণ চেষ্টা করে নিজেকে ছাড়িয়ে নিতে। কিন্তু—।

ধীরে ধীরে বুঝতে পারে, ঘরটা ক্রমশঃ ঠাণ্ডা হয়ে আসছে। প্রথমদিকে অবশ্য বুঝতে পারে নি। ভয়ে তখন দরদর করে ঘামছে ফেডার। কিন্তু পরেই সুতীব্র ঠাণ্ডা লাগে। কাঁপতে শুরু করে সারাশরীর। এ্যাপিলেপসী রুগীর মতো। কিন্তু ঘরের টেম্‌পারেচর তখন আরো নীচে নামছে। হিমাংকের কাছাকাছি। সারা শরীর বরফের মতো জমাট বেঁধে আসছে। বোধশক্তি লুপ্ত হয়ে আসে। মনে হয়, ও যেন তুষার-ঢাকা কোনো এক পাহাড়ের দিকে এগিয়ে চলেছে। সূর্যভরা সবুজ উপত্যকার পাশ দিয়ে। শ্বাস-প্রশ্বাসের সঙ্গে যেন হল্‌কা বেরোচ্ছে। জামাকাপড়গুলো সেঁটে বসেছে। নিঃশ্বাস নিতে কষ্ট হচ্ছে! শরীরের অনুভূতি ছাড়া অন্য কোনো কিছুতেই মুহূর্তের জন্যও মনটা স্থির করা যাচ্ছে না। রক্তকণিকাগুলো শিরার মধ্যে জমে আসছে। পায়ের আঙুলগুলো অসাড় হয়ে আসছে। সমস্ত পায়ের অনুভূতিটাই হারিয়ে ফেলে ফেডার। ধীরে ধীরে অসাড়ত্বটা ওপরের দিকে উঠতে থাকে। হার্টের দিকে এগোয়। হার্ট পর্যন্ত পৌঁছে গেলে, তারপর—। মস্তিষ্কে ঠাণ্ডাটা পৌঁছোন পর্যন্ত কি ও বেঁচে থাকবে? এ যন্ত্রণাদায়ক অত্যাচারের হাত থেকে যতো তাড়াতাড়ি রক্ষা পায়, ততোই মঙ্গল। কায়মনোবাক্যে প্রার্থনা করে ফেডার ততোক্ষণ যেন ও বেঁচে না থাকে।

প্রচণ্ড ভাবে চেষ্টা করে কোমরের নীচের মাংসপেশীগুলোকে নড়াবার। কিন্তু পারে না। কোমরের নীচ থেকে সম্পূর্ণ অসাড় হয়ে গেছে। মাথাটা উঠিয়েও দেখার উপায় নেই।

ধীরে ধীরে সমস্ত বোধশক্তি স্তিমিত হয়ে আসে। জ্ঞান আর অজ্ঞানের মাঝামাঝি একটা স্তরে পৌঁছে গেছে ও। সমস্ত রকমের অনুভূতি লোপ পেয়ে গেছে।

সম্পূর্ণ জ্ঞান হারালে তবু এতোটা যন্ত্রণা পেতো না। নিজের ভেতরে রুদ্ধ একটা ক্রোধ জেগে ওঠে। বেল্ট ছিঁড়ে যন্ত্রগুলোকে টুকরো টুকরো করে দিতে চায়। কিন্তু হায়! সামান্য মাংসপেশী নাড়াবার ক্ষমতা পর্যন্ত যে ওর নেই।

চোখের সামনে কতোগুলো কাঁচের মতো টুকরো চিক্‌চিক্ করে। একটু পরে বুঝতে পাবে, শরীরে যে বরফ জমেছে তারই প্রতিফল এগুলো।

আস্তে আস্তে মৃত্যুটা যেন নেকড়ের মতো গুঁড়ি মেরে এগিয়ে আসছে। বাব বাব চোয়াল খুলে আব বন্ধ কবে শরীবটাকে গবম করতে চেষ্টা করে। আপ্রাণ চেষ্টা করে নিঃশ্বাস নিতে।

কিন্তু এইভাবে কতোক্ষণ ফেডার নিজেকে বাঁচিয়ে রাখতে পারবে? এক সময় ঠাণ্ডাটা মস্তিষ্কে গিয়ে পৌঁছবে। তখন –।

ফেডাব মনেপ্রাণে প্রার্থনা করে শৈত্য-প্রবাহটা যেন মস্তিষ্কে গিয়ে না পৌঁছোয়। এবং এই ভয়টাই ওব দেহেব অস্বস্তি আব ব্যথার অনুভূতিটা কেড়ে নেয়।

ডলম্যানেব ওপবেও এই ধবনেব পরীক্ষা চালিয়েছে কিনা কে জানে!

ফেডাবের মনে হয়, কোনোবকমে এ পবীক্ষার পর ও যদি প্রাণে টিঁকে যায়, তবু সাবাটা জীবন পঙ্গু হয়েই ওকে কাটাতে হবে।

ক্রমশঃ বুঝতে পাবে চোখেব পাতার লোমগুলো শক্ত এবং স্থিব হয়ে আসছে। তাব মানে চোখেব পাতাব লোমের ওপব বরফ জমেছে। পাতা দুটোকে দ্রুত ওঠানামা করায়। তা'তে যদি কোনোরকমে ববফ জমাব হাত থেকে রেহাই পাওয়া যায়। কিন্তু পাতাব ওপবে বিন্দু বিন্দু তুষাবকণা জমতে থাকে। কিছু দেখবার উপায় নেই। একটু পরে স্থির বরফে ভারী হয়ে ওঠা পাতাদুটো গালের ওপবে পড়ে। ফেডাবের মনে হয়, সারা জীবনেব জন্য ও অন্ধ হয়ে গেল।

চোখেব পাতা পড়ে গেল ক্র্যাম্‌নিৎস ওর দেহের টেম্‌পারেচর ধীরে ধীরে ওপরের দিকে তুলতে থাকে। ক্রাউসেন্‌হাইনকেও খবর পাঠানো হয় যে বন্দী জিজ্ঞাসাবাদের জন্য সম্পূর্ণ তৈরী।

অজ্ঞান হওয়ার পূর্ব মুহূর্তে ফেডার অতি দূর থেকে অস্পষ্ট ভেসে আসা গলার স্বর শুনতে পায়। সে স্বর ক্রাউসেন্‌হাইনের। কিন্তু ঠিক পুরো ব্যাপারটা

চিন্তা করতে পারে না ফেডার। মস্তিষ্কটা সম্ভবতঃ আর কাজ করছে না।

ক্রাউসেন্‌হাইন সোজাসুজি কোনো প্রশ্ন করে না ওকে। বরং ওর বন্দী হওয়ার আগের দিনের ঘটনাগুলোর পুনরাবৃত্তি করে। জীবন-মৃত্যুর সন্ধিলগ্নে ফেডারের মনে হয়, কে যেন আগের দিনগুলোর মাঝে ওকে নিয়ে গিয়ে ছেড়ে দিয়েছে।

আঠারো বছর বয়েসে এক বছরের জন্য ও মিলিটারীতে ছিলো। ইষ্টার্ণ ফ্রণ্টে কর্মরত। কিন্তু লোক্যাল রাজনৈতিক নেতার সঙ্গে সম্পর্কটা ছিলো রীতিমতো টানাপোড়ানের। আসলে সমস্ত জার্মানিটাকে রাজনৈতিক দিক থেকে অনেকগুলো ভাগে ভাগ করা হয়েছে। প্রাদেশিক লিডার, আন্তঃজেলা লিডার, গ্রুপ লিডার ইত্যাদি ইত্যাদি। পরস্পবের সঙ্গে পবস্পবের সংযোগ রাখে লোক্যাল নেতারা।

এই লোক্যাল নেতারাই স্থানীয় যুবকদের গতি প্রকৃতির ওপরে নজর রাখে। এবং ওপরের মহলকে সেই মতো ওয়াকিবহাল করে! ওর এই বন্দীত্বের পেছনে লোক্যাল লীডার করপোর নিশ্চয়ই হাত আছে।

'গেষ্টোপা আর ইহুদী' নাটকটা মঞ্চস্থ করার সময়েই ফেডার লোক্যাল লিডারেব নজরে আসে। করপোর ওকে ডেকে হিটলার যুব-বাহিনীতে যোগ দিতে বলে। ওব মতো সপ্রতিভ ছেলের ভবিষ্যৎ নাকি হিটলার যুব-বাহিনীতে খুব উজ্জ্বল। এয়ারফোর্সের হোমরাচোমবা অফিসার, পদাতিক বাহিনীর জেনারেল, যে কোনো একটা উঁচু জায়গায় পৌছে যাওয়া যাবে।

ফেডারের কোনোদিনই এই খুনী বাহিনীতে যোগ দেওয়াব ইচ্ছে ছিলো না। কাঁচা বয়স বলেই মুখের ওপর না কবে দিয়েছিলো। সেই মুহূর্তে লোক্যাল লিডার ওকে যেতে বললেও নোটবুকে নামেব পাশে 'সন্দেহজনক' কথাটা লিখে রেখেছিলো।

ক্রাউসেন্‌হাইন এই কথাগুলোই বারবার আবৃত্তি করছিলো। স্বাভাবিক অবস্থায় হলে ফেডার সমস্ত কথাবার্তা শুনে হয়তো বা চমকে উঠতো। কিন্তু এখন সে সব বোধ-ই ওর নেই।

টেমপারেচর ধীরে ধীরে বাড়াতে কিছু কিছু স্মৃতিশক্তিও ফিরে আসে ফেডারের।

আরো দু'জন সঙ্গীর সঙ্গে ফক্‌স-হোলে বসে কথা হচ্ছিলো ওর। জায়গাটা বিপজ্জনক। যে কোনো মুহূর্তে রাশিয়ান আক্রমণ হতে পারে। কিন্তু তার জন্য ওরা প্রস্তুতই ছিলো। কথাবার্তা বেশীর ভাগ-ই রাজনৈতিক। জার্মান সৈন্যদের আলোচনার বিষয় হিসেবে একেবারেই নিষিদ্ধ। ও ছাড়া স্মিড্‌ আর ডাণ্টঝাইন্‌।

স্মিড্ অনার্য অর্থাৎ ইহুদী একটা মেয়ের সঙ্গে এক বিছানায় রাত কাটিয়েছিলো বলে ওকে ওর পোষ্ট থেকে নামিয়ে দিয়ে রাশিয়ান ফ্রণ্টে ঠেলে দেওয়া হয়েছিলো। পাতলা হাল্‌কা চেহারার ক্যাডেট্। আর ডাণ্টঝাইন্ মোটাসোটা বেঁটে ধরনের লোক। যুদ্ধে জিতলো বা হারলো সে সম্পর্কে কোনোরকম মাথাব্যথা নেই। ওর যতো ব্যগ্রতা নাগরিক জীবনে ফিরে আসা নিয়ে। চমৎকার উঠতি পিয়ানোবাদক, হঠাৎ যুদ্ধে আসায় প্রতিভায় ছেদ পড়ে গেছে।

—বাশিয়ানরা যদি হঠাৎ আক্রমণ শুরু করে তবে আমাদের আর বাঁচার আশা নেই। স্মিড্ বলে।

—তার জন্য কি ওদেব কিছু দোষ দেওয়া যায়? অন্ততঃ আমি যা শুনেছি তারপব! ডাণ্টঝাইন্ হাল্‌কা ভাবেই উত্তর দেয়।

—কি শুনেছো তুমি? ফেডার জিজ্ঞাসা করে।

—সাত হাজাব রাশিয়ান যুদ্ধবন্দীকে গ্যাস চেম্বারে হত্যা করা হয়েছে। আউস্‌ভিৎজ্ ক্যাম্পে।

ফেডার বলে,—কিন্তু এ তো যুদ্ধের নিয়ম বিরুদ্ধ কাজ। আমি বিশ্বাস করতে পারছি না যে আমাদের নেতাদের বোকামী এতো দূর গড়াবে যে যুদ্ধবন্দীদের পযন্ত হত্যা করবে!

ডাণ্টঝাইন্ সতর্ক চোখে তাকায়। এমনকি ফ্রণ্ট লাইনেব ট্রেঞ্চে পযন্ত পঞ্চম বাহিনীব লোক ছাড়া আছে। ট্রেঞ্চের দেওয়ালের পাশেই হয়তো বা কোন ফক্‌স-হোলে ওৎ পেতে বসে কান দিয়ে রয়েছে। অবশ্য গোলাগুলির শব্দে কথাবার্তা শোনা অসম্ভব।

—যার জন্য রাশিয়ানরা আমাদের হাতে পেলে নিশ্চয়ই আমাদের ছেড়ে দেবে না। অবিশ্বাসের ভঙ্গীতে ফেডার বলে,—কিন্তু আমরা কি দোষ করলাম যে আমাদের এ ধরনের শাস্তি পেতে হবে। আসলে নেতারা আমাদের জন্য যদি এতোটুকু ভাবে! এতোটুকু ভাবলেও একাজ ওরা কখনো করতো না।

—না, না। ওরা আমাদের জন্য কেন ভাববে? যদি ভাবতো তবে কি গ্যাসভ্যানে করে বন্দীদের নিয়ে যেতো?

—গ্যাস-ভ্যান? সেটা আবার কি? ফেডার জিজ্ঞাসা করে?

—উক্রাইনে বন্দী ধরা পড়লে অন্য জায়গায় নিয়ে যাওয়ার নাম করে গ্যাস-ভ্যানে ভর্তি করে। তারপর রাস্তায় ভ্যানের মধ্যেই গ্যাস ছেড়ে বন্দীদের হত্যা করে সোজা কবরখানায়। যে ক'টা পরমায়ুর জোরে তবু বেঁচে যায়, তাদের গুলি করা হয়।

ফেডার আতংকে কেঁপে ওঠে। ছোটবেলা থেকে শুনে আসছে ইহুদী হত্যা করা হচ্ছে। চোরাগোপ্তা। কিন্তু হত্যা জিনিসটা যে ঠিক কী, অনুভব করতে পারে নি। যখন প্রথম শত্রু অর্থাৎ একজন রাশিয়ানকে গুলি করে মারে, তারপর থেকে হত্যা জিনিষটাকে উপলব্ধি করতে পারে।

সাধারণভাবে ইহুদী নিধনকে জার্মানরা আত্মরক্ষার্থে ইঁদুর বা মাছি মারাব মতো মনে করতো। পারিপার্শ্বিক পবিবেশে ওর মানসিক গঠনটাকেও একই ভাবে বদলে দেওয়া হয়েছিলো। সারা জার্মান জাতির মতো ফেডারও ভাবতো ইহুদীরা নীচুস্তরের জন্তু জানোয়ারের সামিল। খুঁজে বের করে হত্যা করাটা প্রতিটি জার্মানের প্রধান কাজ। জিপ্‌সী এবং বাশিয়ানরা নাকি একই সমপর্যায়ভুক্ত। পৃথিবীর অন্যান্য ধর্ম এবং জাতির জার্মানদেব দাস হয়ে একমাত্র বেঁচে থাকার অধিকার আছে।

বড়ো হয়ে যখন বুঝতে শিখেছে, তখন থেকেই মানসিক পরিবর্তন হতে আরম্ভ করেছে। নিজেদের নেতাদের প্রতি ঘৃণা জন্মেছে। মিলিটারীতে ঢুকে সমস্ত মানসিকতাটাই ওলট-পালট হয়ে গেছে। এতোদিনের শিক্ষা অমানবিক। অন্যায়।

গত কয়েকমাস রাশিয়ান ফ্রন্টে কাজ করে, ফেডাবের মনে হয়, ও একটা বর্বর জাতি আর ততোধিক বর্বর পরিবেশের মধ্যে বড়ো হয়েছে। আব এই চিন্তাধারাটাই ওর সমস্ত মানসিকতাটাকে বদলে দিয়েছে।

সেই কারণে কোনোরকমে নাৎসী পার্টিতে নাম না লিখিয়ে সোজাসুজি ইন্‌ফেনট্রি ডিভিসনে গিয়ে নাম লিখিয়েছে। যতোদূর পেরেছে, এইসব নিষ্ঠুরতা থেকে নিজেকে সরিয়ে রেখেছে। কিন্তু ডাণ্টঝাইনের খবরগুলো যেন ওর মনের সেই অনুভূতিটার মূল সুদ্ধ উপড়ে দিয়েছে।

একজন সৈনিক হিসেবে দেশের জন্য ওর যুদ্ধ করা উচিত। এবং নিজের মাতৃভূমি রক্ষার একটা আনন্দও আছে বটে।

কিন্তু এই মুহূর্তে মনে হয় সৈনিক হিসেবে দেশকে নাৎসীদের হাত থেকে রক্ষা করার দায়িত্বও ওর কম নয় সেই জন্য প্রয়োজন হলে দেশের ভেতরের যেসব দল নাৎসীদের বিরুদ্ধে সক্রিয়, তা'তে যোগ দেওয়া উচিত।

ফেডার নিজেও জানে না, ক্রাউসেন্‌হাইনের কথার উত্তরে ও কি বলেছে। অবশ্য যা বলেছে, কন্‌ট্রোল প্যানেলের সামনে রাখা টেপ রেকর্ডারে নিশ্চয়ই তা' রেকর্ড হয়ে গেছে।

জ্ঞান ফিরে আসার সঙ্গে সঙ্গে ফেডার সারা শরীরে প্রচণ্ড ব্যথা অনুভব

করে। আসলে এতোক্ষণ জমে থাকা শিরা-উপশিরাগুলোয় হঠাৎ রক্ত চলাচল শুরু করতেই এই ব্যথা।

অনেকক্ষণ চেষ্টার পর চোখের পাতা দুটো একটু নড়ে। ফেডার বেঁচে আছে এখনো তা'হলে। চোখের তারার ওপর বরফ জমে থাকায় দৃষ্টি অস্বচ্ছ। পরিষ্কার কিছু দেখার উপায় নেই। মাংসপেশীগুলোর কট্ কট্ শব্দ।

ধীরে ধীরে বরফ গলে। সেই বরফ-গলা ঠাণ্ডা জল ওর গাল বেয়ে নীচে নেমে আসছে। বরফের টুক্‌রোগুলো চামড়াকে কেটে কেটে বসছে। তবু পুরো জ্ঞানটা ফেরে নি বলে অনুভূতিটা মন্দ লাগে না। বরফ গলতে আরম্ভ করায় ধোঁয়ায় সারা ঘরটা ভর্তি হয়ে গেছে। ফেডারের মনে হয়, ও যেন শূন্যে ভাসছে।

এতোক্ষণ বুঝতে পারে নি, ও ঠিক কোথায়! কিন্তু জ্ঞানটা পুরো আসতেই ভয়টা আরো চেপে ধরে। অত্যাচার কি শেষ হয়ে গেছে? নাকি, এখনো শুরু-ই হয় নি? স্মৃতিটা ফিরে আসে। ক্রাউসেন্‌হাইনের স্বরটা মনে পড়ে। ও কি তা'হলে সব কথা বলে ফেলেছে? তার মানে পুরনো সঙ্গীদের প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা করেছে? নাকি, হিটলারকে হত্যা করার পরিকল্পনাটা পুরো ফাঁস করে দিয়েছে।

অবশ্য ফেডারের স্বীকারোক্তিতে ক্রাউসেন্‌হাইন বুঝে নিয়েছে, ওকে আরো জিজ্ঞাসাবাদ কবার প্রয়োজন আছে। ক্রাউসেন্‌হাইনের ওটাই লাভ।

এই পরীক্ষাতে প্রমাণিত হয়ে গেছে, ফেডার সেলেনবার্গ দোষী। এখন খালি চেষ্টা করে বাকী কথাগুলো পেট থেকে টেনে বার করা।

ক্রাউসেন্‌হাইন ফেডারকে ডাক্তারের হাতে ছেড়ে দেয়। টেম্পারেচর যতো বাড়ছে, অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের ব্যথাটাও যেন ততো তীব্র হচ্ছে। কান ফেটে যেন রক্তের স্রোত বাইরে বেরিয়ে আসতে চাইছে। ডাক্তার ক্রাম্‌নিৎস ওর অবস্থার বিবরণ মাঝে মাঝে নোটবুকে টুকে নিচ্ছে।

একসময় সারা শরীরের ব্যথাটা মরে আসে। কিছুটা আরাম বোধ হয়। লোহার দরজাটা হঠাৎ খুলে যায়। দু'জন গার্ড ঘরে ঢুকে ওর বাঁধনগুলো খোলে। জোর করে ওকে দাঁড় করায়। পা দুটো অবশ। সুতরাং গার্ড দু'জন ওর হাত ধরে মৃতদেহের মতো ছেঁচড়াতে ছেঁচড়াতে ওর সেলে নিয়ে এসে ডলম্যানের মতোই ভেতরে ছুঁড়ে দেয়।

উল্টোদিকের দেওয়ালে ধাক্কা খেয়ে মাটিতে আছড়ে পড়ে ফেডার। সারা শরীর চুলকোচ্ছে। দাঁড়াবার চেষ্টা করে ফেডার। ডলম্যান চুপচাপ বিছানায়

বসে। চোখে সেই ভাবলেশহীন দৃষ্টি।

ফেডার নিজের হাতেই যতোটা পারে পায়ের মাংসপেশীগুলোকে ডলে দেয়। মনে হয়, দাঁড়াবার শক্তিটা যেন একটু একটু করে ফিরে আসছে। দেওয়ালে ভর দিয়ে উঠে দাঁড়ায় ফেডার।

—ওরা আমাকে আইস্ চেম্বারে নিয়ে গিয়েছিলো ডলম্যান। ফেডার বলে। ডলম্যান সেই আগের মতো ভাবলেশহীন দৃষ্টি নিয়েই উত্তর দেয়,—তার মানে তোমার কাছ থেকে অনেক খবব পাওয়া যাবে বলে ওদের ধারণা। যাদের সম্পর্কে এরকম ভাবে, তাদেরই শুরু হয় আইস্ চেম্বার দিয়ে। কথাটা শেষ করে আগের মতো মুখে কুলুপ আঁটে ডলম্যান।

প্রায় বন্দীরাই সেলের দেওয়ালের গায়ে দাগ কাটে। আলোবাতাসহীন সেলে বোঝার উপায় নেই, কখন সূর্য ওঠে অথবা ডোবে। দিন বাতের হিসেব মেলে না। তাই দেওয়ালের গায়ে দাগ কেটে কেটে বাখে। সেই কারণেই গেষ্টাপোরা বন্দীদের এক সেলে বেশী দিন রাখে না। অবশ্য বেশীর ভাগ বন্দীই শেষে এক সময় মুক্তি আর এ জীবনে পাবে না ধরে নিয়ে দাগ কাটা আপনা থেকেই বন্ধ করে দেয়। ফেডার তবু দেওয়ালের গায়ে দাগ কেটে চলে।

আজ দেওয়ালের গায়ে পাথর দিয়ে অষ্টম দাগটা দেয়। তার মানে ওর বন্দীত্বের আজ আট দিন পার হলো। ও ধরে নিয়েছে একদিন এ বন্দীত্ব শেষ হবে। আব এই ধারণাটা সমস্ত ব্যাপারটাকে অন্যরকম ভাবে ভাবিয়েছে। আশার শেষ মানেই তো মৃত্যু। অবশ্য মিত্রশক্তি যদি ওর মৃত্যুর আগে জার্মানি অধিকার করতে পারে, তবেই বাঁচার আশা আছে নচেৎ নয়।

আরেকটা চিন্তা পাশাপাশি মনের ভেতরে জেগে ওঠে। জিজ্ঞাসাবাদের সময় যদি আত্ম-সমর্পণ করে! এরা কি তাহলে ওকে মুক্তি দেবে? নাকি, রক্তলোলুপ নাৎসীদের কাছে এটা আশা করা যায়?

মনের দিক থেকে ফেডার এমন এক জায়গায় এসে পৌঁছেছে, যে কারোর কাছে মন খুলে কথা বলার দরকার। কিন্তু কার কাছে মন খুলবে? ডলম্যানের তো মুডের ব্যাপার। মুড ভালো থাকলে কথাবার্তা বলবে। আর না হলে পাথর চাপা। নিজে থেকে মুখ খুলবে না, ফেডার যদি কিছু বলে এমন ভাব-

জীবনে কখনো সেই দিনটার কথা ভুলতে পারবে না ফেডার।

শেষে অনেক টালবাহানার পর কয়েক সপ্তাহ পিছিয়ে দিয়ে ছুটিটা ম্যানেজ করে। ইষ্টার্ণ ফ্রণ্টের সৈন্যরা ছুটি পেলে প্রথম বার্লিনের আলেকজাণ্ডার প্লাট্‌ৎজে এসে জমায়েত হয়। ফেডারের বিয়ের আয়োজন সম্পূর্ণ; এখন শুধু দিনক্ষণ স্থির করলেই হয়। বিবাহ-পর্বটা পৌছনোর কয়েকদিনের মধ্যে সেরে ফেলবে বলে স্থির করেছে ফেডার।

গত দশ দিন ধরে রোজ কেটো স্টেশনে হাজিরা দিচ্ছে। হাজার হাজার সৈন্য ছুটি পেয়ে ঘরে ফিরছে। যদি তার মধ্যে ফেডার থাকে! কিন্তু প্রতিদিন নিরাশ হয়েই ওকে ফিরতে হয়েছে।

তারপর একদিন সেই মুহূর্তটা আসে। ট্রেন স্টেশনে এলে গভীর প্রত্যাশায় কেটো নিরীক্ষণ করে, —বাঁ হাতে স্যুটকেশটা নিয়ে ফেডার প্লাটফরমে নামছে। অন্যান্য সৈন্যদের ব্যস্ততার সঙ্গে সরিয়ে দিয়ে বাইরের লোকের জন্য সীমানা টানা বেড়াটার দিকে দ্রুতপায়ে এগিয়ে আসছে।

সৈন্যদের ভীড়ের জন্য সিবিলিয়ানদের বেড়ার ওপাশে সরিয়ে দেওয়া হয়েছে। প্রথম টিকিট কালেক্‌টারের হাতে পাসের বাকী অংশটা গুঁজে দিয়ে এগোতেই ফেডার দেখে কিছুটা দূরে দাঁড়িয়ে কেটো হাত নাড়ছে।

ও নজরে পড়তে কেটো এক টুকরো হাসি ছুঁড়ে দেয়। উভয়ে উভয়ের দিকে এগোয়। ব্যবধান মাত্র দশ গজের। ঠিক তখনই দুজন মিলিটারী পুলিশ ওদের দুজনের মাঝখানে এসে দাঁড়ায়।

—লিভ পাস্‌টা দেখি? একজন মিলিটারী পুলিশ জিজ্ঞাসা করে।

ফেডার স্থির দৃষ্টিতে পুলিশটার দিকে তাকায়। হাজার সৈন্য প্ল্যাটফরমে ইতঃস্তত ঘুরে বেড়াচ্ছে। বেছে বেছে ওকেই কেন-বা জালে তোলা?

স্যুটকেশটা মাটিতে রেখে পাসটা রেখে পাসটা তন্নতন্ন করে খোঁজে ফেডার। জানে, এটা দেখালেও রেহাই নেই। এর পেছনের উদ্দেশ্য অন্য। যার সঙ্গে পাস চেকের কোনো সম্পর্ক নেই।

—পেয়েছি। ফেডার বলে। সব কিছুই তো ঠিক আছে।

সেই মুহূর্তেই কেটো ওর কাছে এসে পৌছায়। এতোক্ষণের বিলম্বে কাছে পাওয়ার ব্যগ্রতা ওর আরো বেশী তীক্ষ্ণ হয়েছে। দু'হাতের বেড়ে ফেডারের গলাটা গভীর আবেগে জড়িয়ে ধরে কেটো। একেবারে বুকের কাছে ওকে টেনে নেয় ফেডার। চুমু খায়। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে ওর হাতটা শক্ত

করে ধরে টেনে নেয় মিলিটারী পুলিশ। আরেকজন ধাক্কা দিয়ে সরিয়ে দেয় কেটোকে। যেন ও কেটোর সঙ্গে পালিয়ে যাওয়ার মতলব ভাঁজছে।

—এখানে দাঁড়িয়ে থাকো। কর্কশ স্বরে কেটোকে একজন মিলিটারী পুলিশ বলে। তারপর মন দিয়ে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে পরীক্ষা করে ফেডারেব লিভ পাসটা। আরেকজন অবশ্য ওদের দিকে তীক্ষ্ণ নজর রাখছে। যাতে দুজনে আবার এই অবসরে কাছাকাছি না আসে।

—আপনার নাম ফেডার সেলেনবার্গ ?

মিলিটারী পুলিশের জিজ্ঞাসায় ফেডার বেগেমেগে উত্তর দেয়,—হ্যাঁ, আর সেটা তো পাসেই লেখা আছে।

—আসুন আমাদের সঙ্গে।

—কিন্তু কেন ? কেন আমি আপনাদের সঙ্গে যাবো ? আমি কি করেছি ?

—সেটা আমাদের থেকে আপনি-ই ভালো করে জানেন। নির্লিপ্ত স্বরে উত্তর দেয় মিলিটারী পুলিশ। কেটোকে বাড়ীতে যেতে বলে ফেডার মিলিটারী পুলিশ দুজনের পেছনে পেছনে হাঁটে।

চলতে চলতে একজন পুলিশ আরেকজনকে বলে,—মনে হয় ঠিক লোককেই ধরেছি।

—কিন্তু আমাকে কেন ধরলেন ? ফেডার জিজ্ঞাসা করে।

—দেখুন, আমরা কিছুই জানি না। আমাদের নির্দেশ দিয়েছে বেডাব ওপারে যাওয়ার আগে আপনাকে এ্যারেষ্ট করে কর্তৃপক্ষের হাতে তুলে দিতে।

—কর্তৃপক্ষ ? মানে ?

—মানেটানে আমরা কিছু জানি না। আর মনে হয় এসব বিষয়ে আমাদের থেকে আপনি বেশী জানেন। সুতরাং ঝামেলা টামেলা করে কোনো লাভ নেই। কারণ আমরা আপনাকে কোনো সাহায্য করতে পারবো না।

ফেডার কিংকর্তব্যবিমূঢ়। পুরো ব্যাপারটা ঠিক বুঝে উঠতে পারে না। রাইখ্ চ্যান্সেলারী অফিসের ভেতরে কেটো ঢুকতে চেষ্টা করে। কিন্তু কেটো যাতে ওর সঙ্গে কোনোরকম যোগাযোগ করতে না পারে, তার ব্যবস্থা আগে থেকেই শক্ত হাতে করে রেখেছে।

টিপিক্যাল নাৎসী চক্রান্ত! এই জন্যই ওর ছুটিটা হঠাৎ বাতিল করে দিয়েছিলো।

মনের গভীরে ডুব দিলে অনুমান করতে কষ্ট হয় না কেন হঠাৎ ওকে এই ভাবে এ্যারেষ্ট করা হয়েছে। আর যদি কারণটা সত্যি হয়, তবে ওর ভাগ্যে

কি আছে, সেটা ভাবতে ও শিউরে ওঠে। পাঁচ মিনিটের জন্য যদি কেটোর সঙ্গে নিরালায় কথা বলতে দিতো, তা'হলে অন্ততঃ মনের দিক থেকে কিছুটা হালকা হতো। তবে সে সম্ভাবনা একেবারেই নেই। মিনিট কুড়ি ধরে যে ঘরে ওকে রেখেছে, সেখান থেকে বাইরে অপেক্ষারতা কেটোকে এক নজরেও দেখার উপায় নেই।

বাড়ীটার পেছনে কালো রঙের একটা স্টেশন ওয়াগন দাঁড়িয়ে। গাড়ীটাকে দেখামাত্র ফেডারের বুকটা ছ্যাঁৎ করে ওঠে। এটা নাৎসীদের গাড়ী। গেষ্টোপাদের ব্যবহারের জন্য। সুতরাং এর পরের অধ্যায়টা ভাবতে গিয়ে ওর বুকটা হিম হয়ে যায়।

মাঝখানের ফাঁকা জায়গাটা থেকে বিরাট মাথা উঁচু করা পুলিশ হেড কোয়ার্টার বিল্ডিংটা দেখা যায়। ফেডার জানে ওখানে ওকে নিয়ে যাওয়ারও উপায় নেই। চেষ্টা করলেই পেছনের নাৎসী গার্ড গুলি করবে।

গাড়ীতে ওঠার আগে ফেডার বলে,—আমার ব্যাগটা আমি অফিসে ফেলে এসেছি।

গার্ডটা ভাবলেশহীন মুখে উত্তর দেয়,—তার জন্য চিন্তার কিছু নেই। ওটাকে যত্নে রাখা হবে।

ও গাড়ীতে উঠলে গাড়ীটা চলতে শুরু করে। ডান দিকে বাঁক নেয়। বার্লিন ওয়েষ্ট এণ্ড অঞ্চলের ভেতর দিয়ে। পুরো বার্লিনটাকে এমন ভাবে চক্কর মারে গাড়ীটা, যেন কন্‌ডাকটেড্ ট্যুরে বেরিয়েছে ওরা।

ওল্ড রয়্যাল প্যালেসকে বাঁয়ে রেখে, মার্কগ্রাফেন ষ্ট্রাসে, লাইপজিগার ষ্ট্রাসে পেরিয়ে এসে পড়ে উইলহেলম্ ষ্ট্রাসেতে। কিছুটা এগিয়ে ডান দিকে মোড় ঘুরে প্রিন্‌স এ্যলবাখট্ ষ্ট্রাসে। সেই রাস্তার ওপরেই গেষ্টোপাদের হেড কোয়ার্টার।

রিসেপসান ডেস্কে নাম লিখিয়ে একপাশে বসে ফেডার। নিরবধি কাল। শ্লথ গতিতে এগিয়ে চলেছে। কে জানে ফেডারের ভবিতব্য ওকে কোথায় নিয়ে যাবে?

বেশ কিছুক্ষণ অপেক্ষা করার পর ওর ডাক পড়ে। ওকে একজন অফিসারের কাছে নিয়ে যাওয়া হয়। বেঁটে, ঝুলে পড়া গোঁফটাকে পাকাতে পাকাতে সোজাসুজি ওকে প্রশ্ন ছোঁড়ে অফিসারটা,—দেশের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রের জন্য আপনাকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। এ বিষয়ে আপনার কিছু বলার আছে?

—অভিযোগটা সম্পূর্ণ মিথ্যা। ক্রুদ্ধ স্বরেই উত্তর দেয় ফেডার। গত এক বছর ধরে ইষ্টার্ণ ফ্রন্টে আছি, আমার পক্ষে ওসব ষড়যন্ত্র-টন্ত্রের সুযোগ কোথায় বলতে পারেন?

আগাপাস্তলা জরীপ করে নিয়ে গোঁফটায় পাক দিতে দিতে অফিসারটা বলে,—আপনার সঙ্গে তর্ক করার মতো সময় আমার নেই। আর পরে নিজের ওকালতি করার অনেক সময় পাবেন। সুতরাং—।

গার্ড এসে ওকে সরিয়ে নিয়ে গিয়ে উঠোনে দাঁড়িয়ে থাকা কালো একটা ভ্যানে তোলে। এসে নামে পটাশডাম্ টারমিনাসে। একটা ট্রেন আগে থেকেই স্টেশনে দাঁড়িয়ে। কম্পার্টমেণ্টটায় পুরুষ মেয়েছেলে গাদাগদি করে ঠাসা। গরু ছাগলের মতো। কয়েকটা বাচ্চাও আছে।

ফেডার জীবনে কখনো একসঙ্গে এতোগুলো হতাশার কালো সমুদ্রে ডোবা মানুষ দেখে নি। আর সেও একফালি এতোটুকু জায়গায়। অধৈর্য প্রতীক্ষার পর একসময় ট্রেনটা চলতে আরম্ভ করে। কিন্তু অনিশ্চিতের পথে যাত্রারম্ভের আগেই ফেডার অসুস্থ বোধ করে।

বিশ্রী দুর্গন্ধে বমি হওয়ার জোগাড়; তার ওপর এতোটুকু কম্পার্টমেণ্টে এতো প্রচণ্ডভাবে গাদা করে বন্দী ভরা হয়েছে যে হাওয়া আসারও উপায় নেই। দরজাটায় তালাবন্ধ। হাওয়া ঢোকার জন্য এক চিলতে ফাঁকও তাতে নেই। এমনভাবে ঠাসা হয়েছে যে মরলে পর্যন্ত নামানো যাবে না।

বেশীর ভাগই ইহুদী। ইউরোপের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে ধরে নিয়ে আসা। চলেছে লেবার ক্যাম্পে। ইষ্টের।

ওদের মধ্যে অনেকেরই ধারণা ইষ্টের কোনো লেবার ক্যাম্পে শ্রমদানের জন্য ওদের নিয়ে যাওয়া হচ্ছে। ওর মধ্যে একজন বৃদ্ধ, পুরনো একটা ছেঁড়া সার্ট দিয়ে মাথাটা জড়ানো। চোখে ক্ষয়ে যাওয়া মোমবাতির ম্লানতা। বৃদ্ধটা

বলে,—আমাদের কাজের জন্য নিয়ে যাওয়া হচ্ছে।

ফেডার অবাক হয়। লোকগুলো এখনো জানে না, ওদের কিসের জন্ম নিয়ে যাওয়া হচ্ছে! তবু ও মুখ ফুটে কিছু বলে না। এতোগুলো নৈরাশ্যবাদী লোককে আরো নৈরাশ্যের গভীরে ঠেলে দিতে মন চায় না। ইহুদীতে ঠাসা দেখে বুকের ভেতরে আরো বেশী শির-শিরানি অনুভব করে ফেডার। এদের পথযাত্রা শেষ হবে গিয়ে গ্যাস চেম্বারে। এরা না জানলেও ফেডার জানে। কিন্তু ওর ধমনীতে তো খাঁটি আর্য রক্ত প্রবাহিত। সুতরাং ওকে নিশ্চয়ই গ্যাস চেম্বারে ঠেলে দেওয়া হবে না। আর এ ধারণাটাই বোধহয় অকূল সমুদ্রে ওর একমাত্র খড়কুটো।

গেষ্টোপাদের হাতে বন্দী হয়ে সামান্যতম স্বাচ্ছন্দ্যও আশা করাটা অন্যায়। বাধ্য হয়ে নড়ে চড়ে কোনোরকমে ওরই মধ্যে একটু ফাঁকা জায়গা করে নেয়। একপাশে মাথায় পট্টি বাঁধা বৃদ্ধটা, অন্যপাশে একটা মেয়ে। ছেঁড়া দু'টুকরো কম্বল দিয়ে অতিকষ্টে বুক আর কোমরের নিম্নাংশ ঢেকে রেখেছে। মাথার চুলগুলো এতো ছোট করে ছাঁটা যে হঠাৎ দেখলে টাক পড়েছে বলে মনে হয়।

এই ভয়ংকর যাত্রাপথ শেষ হতে যেন আর চায় না। পুরোটা দিন আর রাত পার করে পরের দিন সকালে কম্পার্টমেন্টের ভেতরের অবস্থা এতোই শোচনীয় যে নিঃশ্বাস নেওয়ার ক্ষমতা পর্যন্ত হারিয়ে ফেলেছে। দু'একজন তো রাত্রেই কম্পার্টমেন্টেব ভেতরে মরে পড়ে রয়েছে।

এক সময় এই দুঃসহ জার্নির শেষ হয়। ট্রেন আউস্‌ভিৎজ্‌ ক্যাম্পের লম্বা সাইডিংয়ে এসে দাঁড়ায়। দরজাটার তালা খুলে দিয়ে জনা-বারো সশস্ত্র গার্ড প্লাটফরমে পজিসন নেয়। আরো কয়েকজন গার্ড কর্কশ গলায় ট্রেন থেকে নেমে আসার আদেশ দেয়।

প্রথমে মৃতদেহগুলোকে নামায়। তারপর অসুস্থদের পালা। একেবারে শেষে যাদের তখন পর্যন্ত হেঁটে যাওয়ার মতো ক্ষমতা আছে।

কয়েকটা ট্রাককে ট্রেনের কাছাকাছি নিয়ে আসে। বন্দীরা ভাবে, ওদেরই নিয়ে যেতে। কিন্তু না। ট্রাকগুলোয় মৃতদেহগুলোকে ছুঁড়ে ছুঁড়ে ভর্তি করা হয়। ইতিমধ্যে লাউডস্পীকারে আদেশ আসে,—যা দের হাঁটার মতো ক্ষমতা নেই, তারা নিকটবর্তী ট্রাকের সামনে সারিবদ্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে পড়।

এতে কয়েকজন বন্দী, যারা সত্যই খুব অসুস্থ, ট্রাকের পেছনে সারি দিয়ে দাঁড়ায়। সঙ্গে সঙ্গে গার্ডরা মেসিনগান থেকে গুলি বৃষ্টি করে। লোকগুলো মাটিতে গড়িয়ে পড়ে।

ঠাণ্ডা মাথায় এই হত্যাকাণ্ড দেখে ভয়ে বাকীরা আর্তনাদ শুরু করলে, গার্ডগুলো হাতের লাঠি ঘুরিয়ে চুপ করার জন্য হুংকার ছাড়ে।

নতুন মৃতদেহগুলো বোঝাই হয়ে গেলে ট্রাকগুলো গন্তব্যস্থলে যাত্রার তোড়জোড় শুরু করলে, আবার লাউডস্পীকার মুখর হয়,—যাদের হাঁটার ক্ষমতা নেই, এখনো সময় আছে এগিয়ে আসার। শেষ ট্রাক ছেড়ে গেলে আর কোনো ব্যবস্থা করা আমাদের পক্ষে সম্ভব হবে না।

ফেডার রাগে দাঁতে দাঁত চেপে ধরে। অনুমান করতে কষ্ট হয় না, রাশিয়ান বন্দীরা এই ক্যাম্পে কী ব্যবহার পেয়েছে। নিছকই গরু ছাগলের মতো ওদের হত্যা করা হয়েছে।

পৃথিবী যেদিন জানবে, সেদিন ইতিহাসে ওদের সভ্যজাতি তো দূরের কথা, মানুষ বলে গণ্য করবে কিনা সন্দেহ। নাজী কুকুর হিটলারের বিরুদ্ধে লড়বার জন্য মনের আকাশে যে কয়েক টুকরো দ্বিধার মেঘ জমেছিলো, এ মুহূর্তে তা' সম্পূর্ণ উবে যায়।

প্লাটফরমে প্রায় হাজার দুই বন্দী ট্রেন থেকে নেমে জড়ো হয়েছে।

স্টেশনের চারপাশটা জলাভূমি। হঠাৎ দেখলে কবরখানা বলে মনে হয়। লাইন বেঁধে প্লাটফরমে দাঁড়িয়ে থাকা বন্দীদের কাবোর পেটে গত চব্বিশ ঘণ্টার ওপর জল পর্যন্ত পড়ে নি। ফেডার তো খেয়েছে তারও অনেক আগে।

সঙ্গীদের অনেকে থেকে থেকে জ্ঞান হারাচ্ছে। পাশেব লোকদের তাদের ধরে দাঁড় করিয়ে দিতে হয়। নইলে খুনী গার্ডগুলোর হাত তো গুলি করাব জন্য নিস্‌পিস্ করছে। অবশ্য বর্তমান অবস্থার চেয়ে মরাটাও অনেক বেশী ভাগ্যের দরকার।

অনেকক্ষণ লাইন বেঁধে দাঁড়িয়ে থাকার পর আদেশ হয় এগোবার। কিন্তু কয়েক পা এগোতে আবার থামার নির্দেশ। প্লাটফরমের মাঝামাঝি পৌঁছতে ফেডারের ঘণ্টাখানেক সময় লাগে। বড়জোর শ' খানেক গজ পথ হাঁটতে মনে হয় যেন একশো মাইল পথ হেঁটেছে। প্রচণ্ড পরিশ্রান্ত লাগে। এক সময় ক্যাম্পের সীমানার বেড়াটা নজরে আসে।

এস-এস ইউনিফর্ম পরা দু'তিনজন ডাক্তার বেড়ার মুখে দাঁড়িয়ে। প্রত্যেকের হাতে ছোট একটা ছড়ি। অনাহারে আর হতাশায় ভেঙ্গে পড়া দলটাকে ডাক্তারদের মাঝখান দিয়ে এগোতে হয়। ডাক্তার হাতের ছড়ি দিয়ে দেখিয়ে দিলে, গার্ডগুলো ডাক্তার নির্দেশিত ব্যক্তিদের ঘাড়ে ধরে সঙ্গে সঙ্গে বাঁ দিকের লাইনে চালান করে দেয়; বাদ বাকীরা ডানদিকে।

ওর দিকে ডাক্তার ছড়ি দেখায় নি। সুতরাং ফেভার ডানদিকের লাইনে। দুটো লাইন পাশাপাশি বেড়ার ভেতরে ঢুকে খোলা মাঠে গিয়ে দাঁড়ায়।

দুটো সারির মধ্যে কয়েক গজের ফারাক। উভয় সারিতেই স্ত্রী-পুরুষ ছোট ছোট ছেলেমেয়ে মেশানো। প্রত্যেক সারিতে কম করে হাজারখানেক লোক হবে। পরে জানতে পারে, ডাক্তার যাদের হাতের ছড়ি দিয়ে দেখিয়ে বাঁ দিকের লাইনে দাঁড় করিয়েছে তাদের সোজা গ্যাস চেম্বারে নিয়ে যাবে।

ওদের আউস্‌ভিৎজ্‌ দু'নম্বর ক্যাম্পে নিয়ে যায়। চারদিকে কাঁটা তারের বেড়া দেওয়া বিরাট বড়ো কম্পাউণ্ড। কয়েক হাত দূরে মেসিনগান হাতে নিয়ে গার্ডরা প্রস্তুত।

কম্পাউণ্ডের ভেতরে ছোট ছোট দলে ভাগ করে, এক একজন গার্ড এক একটা দলের চার্জ নেয়। প্রত্যেক দলে প্রায় শ'খানেক বন্দী। কম্পাউণ্ড থেকে এদেব সোজা নিয়ে যাওয়া হবে বাথ-হাউস অর্থাৎ স্নানঘরে।

হঠাৎ দলগুলোর মধ্যে একটা আতংক ছড়িয়ে পড়ে। প্রাণভয়ে সবাই এদিক ওদিক ছোটাছুটি শুরু কবে। অনেকেই এসেছে দাসাউ আর বেল্‌সন ক্যাম্প থেকে। পশ্চিম জার্মানি থেকে আপার সিলিসিয়ায় ট্রানস্‌ফারের অর্থ ই হলো দিন ফুরানো।

চিৎকার হৈ হল্লা শুরু হতেই ঝাঁকে ঝাঁকে বুলেট এসে এফোঁড় ওফোঁড় করে দেয়। গণহত্যা আরম্ভের আগেই এইরকম এলোপাথাড়ি বুলেটে প্রায় গোটা তিরিশেক লাশ মাটিতে লুটিয়ে পড়ে। এতোটুকু বিদ্রোহের আগুন জ্বালার আগেই নিষ্ঠুর হাতে তা' নিভিয়ে ফেলে। যাতে সেই আগুনের শিখা আর বাড়তে না পারে।

স্ত্রী-পুরুষ এবং ছোট ছোট ছেলেমেয়ে মেশানো দলগুলো এক এক করে এগিয়ে চলে বাথ-হাউসের দিকে।

বাথ-হাউসে ঢোকার পর বন্দীদের সমস্ত জামাকাপড় খুলে দেওয়ালের হ্যাঙ্গারে ঝুলিয়ে রাখতে বলে। অর্থাৎ সম্পূর্ণ উলঙ্গ হতে হয়। ওদের অবশ্য বলা হয়, স্নান করার ফাঁকে জামাকাপড়গুলো বৈজ্ঞানিক উপায়ে বীজাণুমুক্ত করা হবে।

বেশীর ভাগ বন্দী-ই ওদের কথায় বিশ্বাস করে অতি দ্রুত মৃত্যুর দিকে এগিয়ে যায়। কিন্তু কিছু বন্দী মরার আগামী মুহূর্তটার অস্তিত্ব সম্ভবতঃ টের পায়। হয়তো সহজাত অনুভূতিতে। তারা আপ্রাণ চেষ্টা করে কোলের বাচ্চাগুলোকে ঝোলানো কাপড় জামাগুলোর পেছনে লুকিয়ে রাখতে।

গার্ডরা মা'দের এ চালাকিতে অভ্যস্ত। হাতের লাঠি দিয়ে ঝোলানো কাপড়জামাগুলোয় জোরে জোরে ঘা দিতেই বাচ্চাগুলো চিৎকার করে কাঁদতে কাঁদতে চেম্বারের ভেতর মা-বাবার কাছে ছোটে।

বিরাট বড়ো চেম্বার। ইস্পাতের সুদৃঢ় দরজা। তারপরে শাটার লাগানো। দেওয়ালের অনেক উঁচুতে একটা ছোট্ট ঘুলঘুলি। শক্ত করে বন্ধ করা যায়। ভেতরে ইলেকট্রিক ফ্যান ঘুরছে।

সমস্ত বন্দীরা ভেতরে ঢুকে গেলে ফ্যানটা হঠাৎ বন্ধ হয়ে যায়। দরজা আর শাটার বন্ধ হয়ে গেলে ঘুলঘুলিটা নিজে থেকে খুলে যায়।

ছাদের কার্নিস ধরে একটা গার্ড হেঁটে এসে খোলা ঘুলঘুলি দিয়ে ছোট একটা টিন ভর্তি প্রুসিক এ্যাসিড বা *Zyklon B* ভেতরে ছুঁড়ে দেয়।

টিনটা দেওয়ালে ধাক্কা খেয়ে ঢাকনাটা খুলে গিয়ে খুনী ধোঁয়া উদ্‌গীরণ শুরু করে।

বড়ো জোর ঘণ্টাখানেক। তার মধ্যেই সব শেষ। হাজারখানেক জীবন পঞ্চভূতে মিলিয়ে যায়।

পুরো ব্যাপারটাই ভাগ্যের ব্যাপার। সেই ভাগ্যের এতোটুকু অঙ্গুলি হেলনে ফেডারের ঠাঁই জুটেছিলো ডানদিকে। নইলে বন্দী জীবনের প্রথম দিনেই ভবলীলা সাঙ্গ হয়ে যেতো।

হাজারখানেক বন্দী, যাদের হত্যা করা হয় নি—তাদের ছোট ছোট দলে ভাগ করে বিভিন্ন সেলে আটকে রাখে। পরে ঠিক করা হবে, কাকে কোথায় পাঠাবে! আউস্‌ভিৎজ্‌ এক নম্বর, দু'নম্বর-নাকি তিন নম্বরে?

ওর বন্দী হওয়াটা এতোই আকস্মিক যে পুরো ব্যাপারটা থিতিয়ে দেখার অবকাশ হয় নি। দিন গড়াতে শুরু করলে যে বিশ্বাসঘাতক ওকে এই নরকে ঠেলে দিয়েছে, তার ওপর আক্রোশটা খর হয়ে ওঠে। কিন্তু কে সে হতে পারে? একমাত্র সেই সিগার মার্চেণ্ট হাইন্‌রিখ্‌ গ্লোভ ছাড়া বন্ধুবান্ধব পরিচিত জন কাউকে সন্দেহ হয় না।

আরো বেশী জ্বলে ওঠে কেটোর কথা মনে হলে। ও যদি গ্লোভকে বিয়ে করতে রাজী না হয়, তবে হয়তো কেটোর কপালেও এই একই খড়্গ ঝুলছে।

মনটাকে শান্ত করার একমাত্র উপায়, যদি মন থেকে কেটো, গ্লোভের কথা সাময়িকভাবে মুছে ফেলতে পারে। কিন্তু বিষয়টা মস্তিষ্কের এতো গভীরে শিকড় গেড়েছে যে ও ভুলতে চাইলেও গ্লোভের ওপর প্রতিশোধের আক্রোশটা ওকে ভুলতে দেবে না।

নির্জন সেলের দিনগুলো ক্ষয় হলে পরে ডলম্যানের সঙ্গে ওকেও লেবার ক্যাম্পে পাঠানো হয়।

সব জাতের বন্দীতে মেশানো এই লেবার ক্যাম্প। অন্ততঃ ছ'মাস কাজ করার ক্ষমতা আছে, এমন বন্দীকেই লেবার ক্যাম্পের জন্য বাছাই করা হয়। ক্যাম্প ইনচার্জ সাউথেল্। সাউথেলের এক কথা, কাজ করতে করতে মাটিতে শুয়ে না পড়া পর্যন্ত খাওয়া দেওয়া হবে। কিন্তু তারপরে আর নয়।

বন্দীরা কাজ করতে করতে শারীরিক দিক থেকে অপটু হয়ে পড়লে সঙ্গে সঙ্গে খাওয়া দাওয়া বন্ধ করে দেওয়া হয়। তাতেও মরতে বেশী সময় নিলে গ্যাস চেম্বার তো রয়েছেই।

গ্যাস চেম্বারে মরার পর মৃতদেহগুলো বহন করে নিয়ে যেতে হয় লেবার ক্যাম্পের বন্দীদের। কম্পাউণ্ডের একটা ধারে ডাঁই করে জমা করে ডেড্-বডিগুলোকে পোড়ানোর জন্যে। ছাইগুলো ব্যবহার করে ফার্টিলাইজার হিসেবে। অর্থাৎ শেষ বিন্দুটাকে পর্যন্ত জার্মানরা নিজেদের স্বার্থে ব্যবহার করে।

লেবার ক্যাম্পে ফেডারের প্রথমদিনের কাজ হলো ঠেলাগাড়ীতে গুঁড়ি আর চ্যালাকাঠ ভর্তি করে কম্পাউণ্ডের ধারে উনোনগুলোব কাছে ঠেলে নিয়ে যাওয়া। মৃতদেহেব সংখ্যা এতো বেশী যে উনোনের গহ্বর পর্যন্ত গিলতে অস্বীকার করছে। তাই আধপোড়া অবস্থায় ওগুলোকে উনোন থেকে তুলে নিয়ে খোঁড়া গর্তে ছুঁড়ে ফেলে পেট্রোল ছিটিয়ে কাঠে আগুন ধরিয়ে দিতে হয়। বেশীর ভাগ ডেড-বডিরই এই অবস্থা।

এক বাটি পাতলা জলের মতো স্যুপ আর মিনিট দশেকের বিরতি। ক্যাম্পের ভাষায় লাঞ্চ ব্রেক। ঠিক সেই ব্রেকের পবেই ঘটনাটা ঘটলো।

একদল বন্দী ঠেলাগাড়ীতে কাঠের গুঁড়ি বোঝাই করছিলো। দীর্ঘদিনের অনাহারে দুর্বল। ঠিক সেই সময় গাড়ীটার একসেল্ গেল ভেঙে। বেশ কয়েকজন সেই কাঠের গুঁড়ির নীচে চাপা পড়লো। অন্যরা কাঠের গুঁড়িগুলো সরিয়ে তাদের মুক্ত করার চেষ্টা করতে গার্ডগুলোর গ্রুপ লিডার দৌড়ে গাড়ীটার কাছে এসেই চিৎকার করে,—সব দূর হঠো।

—তার মানে লোকগুলোকে জীবন্ত কবর দেওয়া হবে? ভয় পাওয়া মেষের

মতো জড়োসড়ো হয়ে দাঁড়িয়ে থাকা বন্দীদের মধ্যে একজন একটু সাহস করে বলে।

গ্রুপ লিডার আড়চোখে তাকায়,—এটাই বদমায়েশদেব ঠিক শাস্তি। যে শূয়োরগুলোকে দিয়ে ঠেলা-গাড়ীতে কাঠ বোঝাইয়ের কাজ পর্যন্ত হয় না, সেগুলোর এইভাবেই মরা উচিত। সবাই সরে দাঁড়াও।

—এটা ঠাণ্ডা মাথায় খুন করা। থাকতে না পেরে একজন বন্দী বলে।

গার্ডটা সঙ্গে সঙ্গে খেঁকি কুকুরের মতো গর্জন করে উঠে কোমরের খাপ থেকে পিস্তলটা টেনে বার করে। তারপর যে বন্দীটা বলেছিলো, তার ঘাড ধরে কাছে টেনে এনে ঘাড়ের পিছনে গুলি করে। মৃতদেহটা অন্যান্যদের দিকে ছুঁড়ে দিয়ে বলে,—খোঁড়া গর্তের কাছে নিয়ে যাও। এটা যেন তোমাদের দৃষ্টান্ত হয়।

চারজন বন্দী এগিয়ে এসে মৃতদেহটাকে তুলে নিয়ে খোঁড়া গর্তেব দিকে এগোয়।

ততোক্ষণে কাঠের গুঁড়ির নীচে চাপা পডা লোকগুলো চেষ্টা করছে উঠে দাঁড়াবার। কয়েকজন গার্ড গ্রুপ লিডারের আদেশে ওদের টেনে হিঁচড়ে দাঁড করিয়ে খোঁড়া গর্তগুলোর দিকে মার্চ করাব আদেশ দেয়।

—নোংরা শূয়োরগুলোর মজাটা দেখাচ্ছি! স্যাবোটেজ কবা? এমন শিক্ষা দেবো যাতে জীবনে আর স্যাবোটেজ করতে না হয়।

সারাটা পথ খিস্তি খেউড় করতে কবতে গ্রুপ লিডাব গরু ছাগলেব মতো খেদিয়ে লোকগুলোকে গর্তের কাছে নিয়ে আসে।

সাতজনকে সারিবদ্ধভাবে দাঁড় করায় গর্তের পাশে। এবং একজন গার্ড এগিয়ে গিয়ে প্রত্যেকের ঘাড়েব পেছনে পিস্তল রেখে গুলি করে। মৃতদেহগুলো গড়িয়ে গর্তের মধ্যে পড়ে যায়।

এ নাটক এখানে প্রবাহমান। হত্যা কবার কারণ রকমাবী। অবশ্য যদি সেগুলোকে কারণ বলা যায়। দুষ্টের কি ছলের অভাব? এখানে একজন বন্দীর জীবনের দাম একটা মুরগীর চেয়েও কম। মুরগীগুলো তবু ডিম দেয়, মাংস পাওয়া যায়; কিন্তু বন্দীরা?

অনেক সময় এই ধরনের হত্যা করে, ক্যাম্পের মাঝখানে পোঁতা লোহার পোলের ওপর কয়েকদিন পর্যন্ত এক নাগাড়ে মৃতদেহটাকে ঝুলিয়ে রাখা হয়। যাতে অন্যান্য বন্দীরা বুঝতে পারে। ওদের জীবন গার্ডদের মর্জির সুতোয় ঝুলছে।

এই ভয়াবহ ঘটনা দেখে ফেডার হতভম্ব হয়ে পড়ে। সেবার স্কোয়াডের

মরালিটির নিদর্শনের সঙ্গে প্রথম পরিচয়ই ওকে বিমূঢ় করে দেয়। মাটিতে বসে পড়ে ফেডার। কাজ করার সমস্ত শক্তি যেন চোখের সামনে ঘটা ঘটনাটা শুষে নিয়েছে।

কয়েকজন সঙ্গী ওর অবস্থা দেখে এগিয়ে এসে বলে,—চট্‌পট্‌ উঠে দাঁড়াও। গার্ডের নজরে পড়লে সোজা গুলি করে দেবে।

—কিন্তু আমি যে পারছিনে! কাতরোক্তি করে ফেডার।

—পারছিনে বললে তো চলবে না! এখানে এক নিয়ম। হয় কাজ করো, না হয় মরো। যেখানে দৈনিক হাজার হাজার লোক হত্যা হচ্ছে, সেখানে সাত আটজনের জীবনের মূল্য আর কতোটুকু?

তবু নিজের মনকে বোঝাতে পারে না ফেডার। যে দর্শনে অভ্যস্ত হয়ে গেলে এ ঘটনাগুলো মনের ওপরে রেখাপাত করে না, জীবন দর্শনের সেই দিকটা এখনো রপ্ত করতে পারেনি ফেডার। একই ভাবে দু'হাতে মাথাটাকে চেপে ধরে মাটিব ওপরে বসে থাকে ফেডার। প্রতিবাদের জন্য নয়, অসুস্থ বোধ করে।

মিনিট পনেরো পরে হঠাৎ দেখে ওর সামনেব মাটিতে দীর্ঘাকৃতি একটা ছায়া পড়েছে। মুখ না তুলেই বুঝতে পারে। সেই গার্ড যে গুলি করার আদেশ দিয়েছিলো।

লোকটা ওর দিকে স্থির দৃষ্টিতে তাকায়। তারপর বক্রোক্তি করে,—ওয়েল মাই ফ্রেণ্ড, টায়ার্ড লাগছে?

ফেডার কোনোরকমে উঠে দাঁড়াতে চেষ্টা করে।

—আমি অসুস্থ। উত্তর দেয় ফেডার।

সহসা গার্ডটা জোরে ওর গালে একটা থাপ্পড় কষায়। টাল সামলাতে না পেরে মাটিতে পড়ে যায় ফেডার। কয়েক পা ওর দিকে এগিয়ে এসে গার্ডটা জিজ্ঞাসা করে,—তা'হলে তুমি অসুস্থ! তাই না? আর নোংরা অনার্য মাগীগুলোর সঙ্গে রাত কাটালে কি কেউ সুস্থ থাকে?

ফেডার কথাগুলোর কোনো উত্তর দেয় না। কোনোরকমে পা দুটোর ওপর ভর দিয়ে উঠে দাঁড়াতে চেষ্টা করে। কি হবে মিছিমিছি বিপদ বাড়িয়ে? আর আত্মহত্যার সময় এটা নয়।

—জানো, আমরা অসুস্থদের নিয়ে কী করি? গার্ডটা জিজ্ঞাসা করে।

—না। ছোট্ট হলেও উত্তর দেয় ফেডার। নইলে এখনই হয়তো বা মারধোর শুরু করবে।

—সোজা কথা। আমরা তাদের চিকিৎসা করার সব রকম সুযোগ দিয়ে আরোগ্য করে তুলি। এসো আমার সঙ্গে।

ওকে সঙ্গে নিয়ে একটা তাঁবুর কাছে আসে গার্ডটা। তাঁবুর বাইরে ছোট্ট একটা বোর্ড টাঙানো। সীক্—বে।

—হানস্, তোমার জন্য রুগী নিয়ে এসেছি। দেখো তো শূয়োরটাব কি রোগ হয়েছে? তোমার স্পেশাল দাওয়াইয়ে সারিয়ে দিও, কেমন? একটা কাঠের বাক্সের ওপর ভুঁড়িওয়ালা এস-এস ডেথ্ রেজিমেণ্টের পোশাক পরে বসে থাকা গার্ডটার উদ্দেশে কথাগুলো ছুঁড়ে দেয়। পুষ্টিহীন বানরের মতো ভুঁড়িওয়ালা গার্ডটা সঙ্গে সঙ্গে উঠে দাঁড়িয়ে বাজপাখীর মতো শ্যেন দৃষ্টিতে ওর আগাপাস্তলা জরীপ করে। তারপর ওর হাতটা ধরে কাঠের বাক্সের ওপর জোর করে বসাতে বসাতে নিয়ে আসা গ্রুপ লিডারকে হানস্ বলে,—ঠিক আছে। চিন্তা করো না। আমি এ্যাটেণ্ড্ করছি।

—তা'হলে তুমি অসুস্থ, তাই না? কিন্তু কি হয়েছে?

হানসের কথায় ফেডার ধরে নেয়, এক ডোজ্ সল্ট অথবা বড়ো জোর কয়েকটা আর্মি পিল দেবে। তাই বলে,—জানি না, হঠাৎ কেন অসুস্থ বোধ হচ্ছে; পেটে একটা ফিক্ ব্যথা উঠেছে, তাব সঙ্গে বমি।

ইচ্ছে করে ফেডার অল্প করে বলে। বিস্তারিত সিমটম্ বলে কিছু লাভ হবে না এখানে।

—তোমাদের মতো শূয়োরগুলোকে বেশী খাইয়েই বিপদ হয়েছে, বুঝলে? জামা কাপড় খোলো। কুৎসিত হানস্ আরো কুৎসিত অঙ্গভঙ্গি করে।

ফেডার উদোম হয়ে তাঁবুর দোরগোড়ায় দাঁড়ায়। হানস্ ওর শরীরের বিভিন্ন জায়গায় আঙুল দিয়ে খোঁচা মারে। তারপর আরেকটা টেবিলের ওপর ছড়ানো একরাশ কার্পেনটারী টুলসের থেকে বেছে-টেছে একজোড়া সাঁড়াশি তুলে নেয়। সেই সাঁড়াশিটা দিয়ে শরীরের বিভিন্ন জায়গার চামড়া টানে। দারুণ যন্ত্রণায় ফেডার চিৎকার করে উঠে কয়েক পা পেছনে সরে যায়। ততোক্ষণে সাঁড়াশির মুখে কয়েক টুকরো মাংস উঠে এসেছে।

—এইবার ঠিক দাওয়াই পড়েছে। তাই না?

—কিন্তু আমি এখন সুস্থ বোধ করছি। যেতে পারি কি?

ফেডারের নরম গলায় জিজ্ঞাসায় হানস্ খেঁকিয়ে ওঠে,—না, যেতে পারো না। একবার যখন সিক্ রিপোর্ট করেছো, তার ফল হাতে হাতে পেতে হবে। এমন শিক্ষা দেবো, যাতে এ জন্মে যেন আর সিক্ রিপোর্ট করার কথা মনে না আসে।

কথাটা শেষ করে পকেট থেকে ছোট্ট একটা হুইসেল বার করে বাজায়। সঙ্গে সঙ্গে দুজন গার্ড দৌড়ে এসে দু'পাশ থেকে চেপে ধরে।

—যতো সব শূয়োরের দল। চিকিৎসেটা পর্যন্ত পুরোপুরি করতে দেবে না! নিজের মনেই গজরাতে থাকে হানস্।

—শক্ত করে ধরো শূয়োরটাকে। একবার যখন বলেছে অসুস্থ বোধ করছে, সুস্থ না করে ছাড়ি কি করে?

ফেডারের হাত দুটো এতো শক্ত করে চেপে ধরেছে যে এতোটুকু নড়াচড়া করার উপায় নেই। নতুন কি অত্যাচার হবে সেই কথাটাই ভাবতে থাকে ফেডার।

—একটু রক্ত বার করে দিলেই সব ঠিক হয়ে যাবে। কথাটা বলে ধারালো একটা রেজার ব্লেড বাব করে বাঁ হাতটা কাঠের বাক্সের ওপব ধরে খানিকটা জায়গা চিড়ে দেয়। তারপর বলে,—এইবার মনে হয় আর অসুখের ভান করবে না। আর করলেও আমার সময় নষ্ট করতে আসবে না। নিজের মনেই কথাগুলো বলে, পেটের যে জায়গা থেকে সাঁড়াশি দিয়ে মাংস খাবলে নিয়েছে, সেই জায়গাটা নুনজল দিয়ে ধুয়ে ব্যাণ্ডেজ করে দেয়। তারপব ওর দিকে তাকিয়ে টেবিলের ওপরের কার্পেনটার টুলস্‌গুলোকে দেখিয়ে বলে,—এই ছেনী দিয়ে অনেক এ্যাপেনডীসাইটিসের অপারেশন করেছি, বুঝলে? আবাব যদি কিড্‌নীর গণ্ডগোল হয়েছে শুনি, তা'হলে এই ছেনী দিয়ে কিড্‌নীটাকেই উপড়ে দেবো। সুতরাং চটপট কেটে পড়ো।

ফেডার সঙ্গে সঙ্গে ওখান থেকে হাওয়া হয়। কপালের জোরে বেঁচে গেছে এবার। ব্যথাটা বেশ চাগিয়ে ওঠাতে মনে হয় না ভারী কোনো কাজ করা এ মুহূর্তে ওর পক্ষে সম্ভব। তবু বিশ্রাম যে দেবে, এ আশা করার মতো বোকা ও নয়।

ও জায়গায় ফিরে এলে, গ্রুপ লিডার গার্ড ওর দিকে তাকিয়ে অপেক্ষাকৃত নরম গলায় বলে,—যাও, টেলর ওয়ার্কশপে কাজ করো গিয়ে। ক্লান্ত হাড়গুলো কিছুটা জিরোবে।

এতো নরম গলায় কথাগুলো শুনে ফেডার বেশ কিছুটা অবাক হয়। আসলে এটা ওর প্রতি দয়া দেখানো নাকি নতুন ধরনের কোনো অত্যাচারের শুরু বুঝে উঠতে পারে না।

এই সেই টেলর ওয়ার্কশপ! ইনচার্জ ডাইনি এলিজা বার্গার। ডলম্যানের কাছে যার সম্পর্কে ভূরিভূরি শুনেছে। এমন শয়তান ছেলেমেয়ে খুব কমই

দেখা যায়। বিশেষ করে, পুরুষের ওপর ওর জাতক্রোধটা সর্বজনবিদিত। এখানে হত্যা করা বন্দীদের জামাকাপড় কেটে ছেঁটে ঠিক করা বন্দীদের কাজ।

ফেডার লম্বা ওয়ার্কশপের দরজায় এসে দাঁড়িয়ে দেখে, বন্দীদের বেশীর ভাগই মহিলা; কাজ করছে। দু'পাশের বেঞ্চগুলো ঘরের পুরোটা আড়াআড়ি ভাবে পাতা। বেঞ্চের সামনে টানা উঁচু টেবিল। দু'পাশের মাঝখানের ফাঁকা করিডরটায় হাতে ঘোড়া পিটানোর ছিপটি নিয়ে শ্যেন চোখে পায়চারী করছে এলিজা বার্গার।

রোগা দীর্ঘাঙ্গী, উদ্ধত স্তন দুটো আর ভেজা শনের মতো খাড়াখাড়া চুল; পরনে টাইট সোয়েটার, হাঁটুর অনেক ওপরে ওঠা স্কার্ট, জ্যাক্ বুটস্ পরে ঈগল চোখে তদারকি করছে। বন্দীরা মুখ নীচু করে একমনে কাজ করে চলেছে। কাটা ছেঁড়া বা তাপ্পি দেওয়া। মৃতদেহ থেকে জামাকাপড়গুলো সোজা খুলে নেওয়া হয়েছে। ধোওয়া পর্যন্ত হয় নি।

ফেডারকে এলিজার কাছে নিয়ে যায়। অনেকক্ষণ অপেক্ষা করাব পব ওর ডাক পড়ে। এলিজা ওকে ঘুবিয়ে ফিরিয়ে দেখে। যেন দাস-বাজার থেকে দাস কিনছে। চোখ দুটোতে ঈগলের তীক্ষ্ণতা! ওর মনে হয়, ডাইনিটা যেন শরীরের হাড়গুলো থেকে সব মাংস চেটেপুটে খাচ্ছে।

সার্টেব নীচের অংশটা রক্তে ভিজে জ্যাব্ জ্যাব্ করছে। এতোক্ষণে এলিজার নজরে পড়ে সেটা। সার্টটা খুলতে বলে। নোংরা আঙুল দিয়ে টিপে টিপে জায়গাটা দেখে। তারপর গর্জন করে ওঠে,—হানস্‌টা একটা গবেট্। মিছিমিছি ফাদারল্যাণ্ডের টাকা আর সময় নষ্ট করায় ওর জুড়ি নেই। কোথায় এই সব ষণ্ডা চেহারাদের সুদে আসলে খাটিয়ে নেবে, নাকি আমার কাছে পাঠিয়ে দিয়েছে। এতো লাইট্ কাজ তো বিকলাঙ্গদের জন্য। যাক্‌গে। কথাটা শেষ করে টেবিলের কাছে ফিরে গিয়ে দু'তিন গজ লম্বা এক টুকরো কাপড় ওর দিকে ছুঁড়ে দিয়ে বলে,—জায়গাটা বেঁধে নাও। সেপটিক্ হয়ে গেলে তো আবার বসে বসে খালি গিলবে।

ফেডার দু'ভাঁজ করে জায়গাটা বাঁধে। ভেতরে ভেতরে একটু কৃতজ্ঞতা বোধ করে। এলিজার কাছ থেকে এতোটুকু হিউম্যানিটি ও আশা করে নি।

বাঁধাছাঁদা হলে এলিজা ওকে জিজ্ঞাসা করে,—দর্জির কাজটাজ কিছু জানা আছে?

ফেডার নরম করে উত্তর দেয়,—না, আমি কোনোদিন এ কাজ করি নি।

—ঠিক আছে, শিখে যাবে। বেঞ্চের একটা খালি জায়গা দেখিয়ে এলিজা

বলে,—যাও, ওখানে গিয়ে বসে পড়ো। দুটো ট্রাউজার আর কাপড় আছে। যে যে জায়গায় প্রয়োজন তাপ্পি লাগাও। যদি কুঁড়েমি দেখি, হাতের চাবুকটা দেখছো তো? সোজা পিঠে পড়বে।

কথাটা শেষ করে একটু এগিয়ে গিয়ে হাতের চাবুকটা বাতাসে কয়েকবার ঘোরায়। হিস্ হিস্ একটা শব্দ ওঠে। চাবুকটা সোজা সপাং সপাং শব্দে একটা লোকেব পিঠের ওপব নেমে আসে। লোকটা হাতের কাজ বন্ধ রেখে ওদের কথাবার্তা শুনছিলো।

ফেডার ট্রাউজার দুটো আর কাপডগুলো নিয়ে কাজ করার বেঞ্চে এসে বসে। ট্রাউজার দুটোর জায়গায় জায়গায় ছেঁড়া। কাঁটা তারের বেডায় লেগে ছিঁড়েছে। রক্তে মাখামাখি। মনে হয় এর মালিক যারা, তারা কাঁটা তারের বেড়ার ফাঁক দিয়ে পালাতে চেষ্টা করে গুলি খেয়ে মরেছে ।

মনে মনে স্বস্তি অনুভব করে ফেডার। একে তো কাজটা অন্যান্য কাজের চেয়ে অনেক সহজ। মাথার ওপরে একটা আচ্ছাদন আর বসার সুযোগও রয়েছে। জল-ঝড়-রোদে পুড়ে সারাটা দিন দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে কাজ করার চেয়ে এটা অনেক ভালো।

এখানে আসতে পারায় নিজেকে ভাগ্যবান মনে হয়। কিন্তু অসুবিধে সুতোগুলোকে নিয়ে। তাপ্পির মোটা কাপড়ে সূচটা ঢোকালেই হাতের বুড়ো আঙুলের সঙ্গে সুতোটা জড়িয়ে যায়। এলিজার প্রধান কাজ খুঁজে খুঁজে খুঁত বার করে হাতের চাবুক দিয়ে এলোপাথাড়ি পেটানো। পুরোপুরি স্যাডিষ্ট মেয়েছেলে। এটাই বোধহয় ওর চরম আনন্দ লাভের পথ। ফেডার লক্ষ্য করেছে, সব সময় খুঁত ধরার অপেক্ষাটুকুও করে না। হাতের চাবুক যার ওপর যখন খুশী নেমে আসে। কোনো কারণ ছাডাই।

এলিজার মারার ঝোঁক আঙুলগুলোর সন্ধিতে। সেইজন্য কর্মরত অধিকাংশ মেয়েদেরই আঙুলগুলো ভাঙা। এবং তা' দিয়ে চুইয়ে চুইয়ে রক্ত পডছে। কিন্তু পুরুষের বেলায় আঙুল নয়, সোজাসুজি চাবুক চালায় মুখে। ভয়ে জড়ো সড়ো লোকগুলো কাজ করে চলেছে।

পরের তিনদিন ফেডার টেলরশপে কাজ করে। সাধারণতঃ এখানে কাজ করাটাকে হলি-ডে হিসেবে ধরা হয়।

একদিন কাজ করতে করতে দেখে, ওর একটু দূরে একটা মেয়ে কাজ করতে করতে হঠাৎ সামনের উঁচু টেবিলটার ওপর শুয়ে পড়ে শরীরটাকে মোচড়াচ্ছে। সঙ্গে সঙ্গে এলিজা ছুটে এসে মুখে মাথায় হাতের আঙুলে চাবুক চালায়।

—ওঠ্, শূকরী কোথাকার! কাজে ফাঁকি দেওয়ার মতলব?

এক নাগাড়ে হাতের চাবুক চালানো ছাড়াও অশ্রাব্য গালি গালাজ দিয়ে চলেছে। রাগের চোটে উভয় পাশে বসা দুটো মেয়ের ওপরেও চাবুক চালায়। হঠাৎ সারা শরীরে একটা ঝাঁকুনী দিয়ে মেয়েটা মাটিতে গড়িয়ে পড়ে। দৌড়ে এসে মেয়েটার মুখে কয়েকটা লাথি মারে এলিজা। তারপর চুল ধরে টেনে একপাশে দেহটাকে ছুঁড়ে দিয়ে বলে, —মাগীটা মরেছে।

ফেডাব একটু দূরে বসে সমস্ত ব্যাপারটা লক্ষ্য করে শিউরে ওঠে। ততক্ষণে ওরও ডাক পড়েছে। মৃতদেহটাকে বয়ে নেওয়ার জন্য।

অন্যান্যদের সঙ্গে ফেডার মৃতদেহটাকে ঠেলা গাড়ীতে তুলে খোঁড়া গর্তের পাশে নিয়ে যেতেই হাঁ হাঁ করে একটা গার্ড ছুটে এসে হাতের ছুরি দিয়ে পরনের স্কার্টটা কেটে সামনের একটা বাস্কেটে ছুঁড়ে জমা করে। ফেডারকে উলঙ্গ মৃতদেহটাকে চিত্ করতে বলে। চিত্ করে শোয়ানো হলে, গার্ডটা মুখের ভেতরে নজর ফেলেই উল্লাসে চিৎকার করে ওঠে। কয়েকটা দাঁত সোনা দিয়ে বাঁধানো। সাঁড়াশি দিয়ে এক হেঁচকায় তুলে নিয়ে পকেট থেকে ছোট চামড়ার একটা পাউচ্ বার করে তাতে যত্ন করে রেখে, মৃতদেহটাকে গর্তে ছুঁড়ে ফেলে দিতে নির্দেশ দেয়।

এসব কাজ সেরে ফেডাব টেলবশপে ফিরে আসে। ডলম্যানের কথাগুলো মনে পড়ে। ধীরে ধীরে ওবও যেন মনের সমস্ত সূক্ষ্ম অনুভূতিগুলো, মানবিক দিকটা শুকিয়ে যাচ্ছে। দৈনন্দিন জীবনে নিজেকে বাঁচানোর তাগিদায় অন্য বন্দীদের দুর্দশা মনে এতোটুকু আঁচড় কাটে না। আর বন্দী জীবনে এটাই ভয়ংকর। এই কারণেই পরস্পর একত্রিত হয়ে এদেব বিরুদ্ধে দাঁড়াতে পাবছে না।

যদিও ফেডারের একার পক্ষে ক্যাম্পের এই অমানুষিক অত্যাচার বন্ধ করা সম্ভব নয়, তবু ভেবে পায় না, কেন এতোগুলো প্রাণী মুখ বুজে এই যন্ত্রণা দিনের পর দিন সহ্য করে চলেছে? কেন এরা বিদ্রোহ করে না?

মনের ভেতরে অবিরাম পাক খাওয়া চিন্তাটা একদিন রাত্রে ডলম্যানকে খুলে বলে। সব চুপ করে শুনে, ডলম্যান বলে, —এখানে যে বিদ্রোহের চেষ্টা

একেবারে হয়নি, তা' নয়। অন্ততঃ আমি এই ক্যাম্পে আসার পর একবার হয়েছিলো। অবশ্য তা' অঙ্কুরেই নষ্ট করে দিয়েছে মেশিনগান হাতে গার্ডগুলো। আর তার পরের সাতদিন কাউকে এক টুকরো খেতে দেয় নি। সম্পূর্ণ অনাহারে রেখেছে।

—কিন্তু সবাই যদি রুখে ওঠে ?

ফেডারের জিজ্ঞাসায় ডলম্যান বলে,—ভেবো না সেটা একটা খুব সহজ কাজ। ক্যাম্পের তিনটে শিবিরে মোট তিন হাজার গার্ড মেশিনগান হাতে চব্বিশ ঘণ্টার জন্য প্রতি মুহূর্তে প্রস্তুত।

—আমার তো মনে হয় না, শীঘ্র-মৃত্যু সবাইকে উদ্বিগ্ন করছে ?

—না, তা' ঠিক নয়। আসলে শীঘ্র-মৃত্যু হলে অনেকেই এগিয়ে আসতো হয়তো বা। কিন্তু এরা যে তিলে তিলে মারবে। আর সেটাকেই অনেকে ভয় করে।

তবু ফেডারের মনে হয় বিদ্রোহ ছাড়া এই পশুগুলোর হাত থেকে রেহাই পাওয়ার কোনো পথ নেই। অবশ্য সেই বিদ্রোহ সফল করতে পরিকল্পনা এতো নিখুঁত হওয়া চাই, যেটা হয়তো বা এ পরিবেশে একেবারেই অসম্ভব। তবু তো ষড়যন্ত্রের অভিজ্ঞতা ওর আছে, নইলে ওকে এখানে আসতেই হতো না। যারা এখানে বন্দী, অনেকেরই হয়তো ষড়যন্ত্রে হাত পাকানো।

এতোদিনে আউস্‌ভিৎজের বীভৎস অত্যাচারগুলোর সঙ্গে পরিচয় হয়ে গেছে, অথবা লোকের মুখে শুনেছে। ক্যাম্পের পারিপার্শ্বিক অবস্থা সম্পর্কেও ধারণা আছে। বেশীর ভাগ গার্ডের ধরণ-ধারণ এবং অভ্যাস বুঝে নিয়েছে। সুতরাং কয়েকজন বিশ্বস্ত সহকর্মী পেলে ওর পক্ষে বিদ্রোহে নেতৃত্ব দেওয়া সম্ভব। অবশ্য এতো অত্যাচার সহ্য করেও এক মুঠো বেশী রেশনের জন্য বন্দীদের মধ্যে অনেকেই বিশ্বাসঘাতকতা করতে পারে। বলেও লাভ নেই। কারণ এখনো অনেকে জীবনের আশা রাখে। এটুকু বোঝে না, খুনী গার্ডগুলো কাউকে রেহাই দেবে না, আজ না হয় কাল। মেরুদণ্ডহীন বন্দীকে কিছুতেই দলে নেবে না ফেডার। গেষ্টাপোরা চরম শত্রু,—সুতরাং শত্রুদের সঙ্গে কোনোরকম আপোষ নয়। বন্দীরা দলবদ্ধ নয় বলেই এরা এই চরম অত্যাচারের রথ যেভাবে এবং যেদিকে খুশী চালিয়ে যাচ্ছে। ডলম্যানের কথাটা কোনোক্রমেই মনেপ্রাণে মেনে নিতে পারে না, যে তিন হাজার গার্ডের পক্ষে এই এতোগুলো বিদ্রোহী বন্দীকে দাবিয়ে রাখা সম্ভব। ওর মনে হয়, তিন হাজার কেন, দশ হাজার গার্ডের পক্ষেও দেড লক্ষ বিদ্রোহীকে কোনোরকমেই দমানো যাবে না।

অবশ্য যদি এই সব বন্দী মনে প্রাণে মুক্তি চায়!

পারিপার্শ্বিক যতোটা বিবেচনা করেছে, তা'তে বুঝেছে, এক সঙ্গে সব বন্দী দূরে থাক্, এক তৃতীয়াংশকেও পাওয়া মুশকিল। তিনটে ক্যাম্পের এক একটা শিবিবে পঞ্চাশ হাজার করে ভাগ করা। এই পঞ্চাশ হাজারের মধ্যে হাজার পঁচিশেককে তো ক্যাম্পে ঢোকার কয়েকদিনের মধ্যে গ্যাস চেম্বারের সামনে লাইন দিয়ে দাঁড়াতে হয়। বাকী পঁচিশ হাজারের মধ্যে দশ হাজার রুগ্ন, দুর্বলচিত্ত, শিশু এবং স্ত্রীলোক। সুতরাং এদের প্রথমেই বাদ দিতে হবে। বাকী পনেরো হাজারের মধ্যে যারা গ্যাস চেম্বারের কাছাকাছি কাজ করে, তাদেরও যে কোনো সময়ে গ্যাস চেম্বারে ঢোকানো হবে। সেটার সংখ্যাও হাজার পাঁচেকের কম নয়। সুতরাং যদি বিদ্রোহ করতেই হয়, অবশিষ্ট দশ হাজারের মধ্যে থেকে বেছে-টেছে দল গড়তে হবে।

দশ হাজার নিরস্ত্র বন্দী তিন হাজার সশস্ত্র গার্ডের বিরুদ্ধে লড়াটা খুব সহজ নয়; ববং শক্তই বলা যায়। তবে সুবিধে এইটুকু, বন্দীরা মরীয়া। নিজেদের জীবনের মূল্য তাদেব কাছে বর্তমানে কানাকড়িও নয়। কিন্তু গার্ডরা নিশ্চয়ই নিজেদেব জীবনের ততোটা ঝুঁকি নেবে না।

অবশ্য এ মুক্তিযুদ্ধে অনুপ্রাণিত করতে হলে, বিদ্রোহীদের ভালো করে তাদেব লক্ষ্য বোঝাতে হবে। আউস্‌ভিৎজে দুটো জিনিষ হলো বিভীষিকাময়। ক্ষুধা আর মৃত্যু। ঠিক এই দুটো জিনিষকেই মুক্তিযুদ্ধে অনুপ্রাণিত করার চাবিকাঠি হিসেবে ব্যবহার করতে হবে। বিশেষত, এই নরক থেকে মুক্তি পাওয়ার সম্ভাবনা। এ সম্ভাবনার স্বাদ যদি একবার ওদের মধ্যে ছড়িয়ে ছিটিয়ে দেওয়া যায়, তবে ব্যস। বাকীটুকু সেই স্বাদের নেশাতেই এগিয়ে যাবে। পুরো বিদ্রোহটাকে চারটে ধাপে ভাগ করে ফেডার। প্রথমে যতোটা পারা যায় খাদ্যদ্রব্য কেড়ে নেওয়া। পবে খুন করার জন্য আয়োজিত গ্যাস চেম্বার আর ওভেন ধ্বংস করা। ষ্টোর রুমটা দখল আর ঠিক তারপরেই নিরস্ত্র বন্দীদের সশস্ত্র করার জন্য অস্ত্রাগার লুণ্ঠন। যদি দু'নম্বরে বিদ্রোহ শুরু হয়ে যায়, তখন ক্যাম্প কর্তৃপক্ষ নিশ্চয়ই তিন নম্বর ক্যাম্প থেকে গার্ড সরিয়ে নিয়ে এসে দু' নম্বরে জড়ো করবে। সেই সুযোগে যদি এক আব তিন নম্বর ক্যাম্পের বন্দীরাও এসে যোগ দেয়, তবে তো কথাই নেই। অবশ্য এ মুক্তিযুদ্ধের সফলতা নির্ভর করছে পরস্পর তিনটে ক্যাম্পের সঙ্গে যোগাযোগ রাখার ব্যবস্থা আর প্রত্যেকটি বন্দীর বিশ্বস্ততার ওপর। পুরোপুরি যদি সাফল্য নাও আসে, তবু ষ্টোর রুম দখল আর গ্যাস চেম্বার ধ্বংস করতে পারলেও অনেক। আর ও-তরফের থেকে

শাস্তি বলতে মৃত্যুর বেশী তো নয়। ক্ষুধা, অত্যাচার আর মৃত্যু—এ-তো ক্যাম্পজীবনের প্রতিটি মুহূর্তের সঙ্গী। তার জন্য ভয় পাওয়ার অর্থ হয় না।

যদি কিছু হারাবার ভয় থাকে, সেটা গেষ্টাপোদের। বন্দীদের তো হারাবার মতো কিছু নেই।

মুক্তিযুদ্ধের প্ল্যান প্রোগ্রামটাকে ঠিক মতো ছকে ফেলার আগেই আবার ওকে জিজ্ঞাসাবাদের জন্য নিয়ে যায়। প্রতিটি ইন্‌ট্রোগেসানের শেষ হয় মারধোর আর বিভিন্নরকম দৈহিক যন্ত্রণার মধ্য দিয়ে। তবু শাস্তি, বিন্দুমাত্র খবরও ওরা ওর কাছ থেকে বার করতে পারেনি, যেটা ওদের বিন্দুমাত্র সাহায্যে আসতে পারে। অথবা, যার কোনরকম মূল্য আছে।

ওকে এবারের ইন্‌ট্রোগেসানের জন্য অন্য একটা ঘরে নিয়ে আসে। সেই ক্রাউসেন্‌হাইনের দয়ার ওপরেই ওর ভাগ্য এখনো নির্ভরশীল।

বিরাট বড়ো ঘর; বেশ সাজানো গোছানো। মাঝখানে একটা বোর্ড-রুম টেবিল। টেবিলটাকে ঘিরে এস-এস ডেথ্‌-রেজিমেণ্টের ছ'জন অফিসার বসে।

প্রথমে ভেবেছিলো, সবাই বোধহয় একযোগে প্রশ্ন ছুঁড়ে বিব্রত করে পেট থেকে কথা বার করার চেষ্টা করবে। কিন্তু একটু পরে বুঝতে পারে ঠিক তা' নয়। ওরা সবাই নোটবুক নিয়ে তৈরী। ওর কথাবার্তার নোট নেবে। ভবিষ্যতে যাতে ব্যবহার করা যায়।

ঘরের কোণের দিকের একটা টেবিলের ওপর একটা টেপ-রেকর্ডার রাখা আছে। ফেডারের মনে হয়, এতোদিনে ছেঁড়া ছেঁড়া ওর যা কথাবার্তা এরা টেপে ধরে রেখেছে, সেটা থেকেই কাটছাঁট করে কাঁচি চালিয়ে কনফেসান গোছের কিছু তৈরী করেছে।

ক্রাউসেন্‌হাইন বসেছে একেবারে মাঝখানে। ওকে এবারে বসার জন্য এমন একটা জায়গায় চেয়ার দেওয়া হয়েছে, যেখান থেকে সবাই ওকে দেখতে পায়।

—ইয়েস সেলেনবার্গ, ক্রাউসেন্‌হাইনের কর্কশ স্বর। তোমার অবাধ্যতা আমরা অনেক সহ্য করেছি, কিন্তু আর নয়। আমাদের সহ্যের সীমা পার হয়ে গেছে। তারপর বসে থাকা ছ'জনকে দেখিয়ে বলে,—এদের জুরী বলে ধরে নিতে পারো। তোমার উত্তর যদি এদের সন্তুষ্ট করতে না পারে, তবে এঁরাই তোমার ভবিষ্যত ঠিক করবেন। আমার কোনো হাত নেই এতে।

ফেডার বসে থাকা ছ'জনের দিকে তাকায়। ভাবলেশহীন ঠাণ্ডা মুখাবয়ব।

—হিটলারের বিরুদ্ধে তোমার ষড়যন্ত্রের কথা অস্বীকার করে আর লাভ

নেই। আমরা খুব ভালো ভাবেই প্রমাণ পেয়েছি যে তুমি এ ষড়যন্ত্রে পুরোপুরি লিপ্ত ছিলে। সব জেনেশুনেও তোমার প্রতি আমরা নরম ব্যবহার করেছি।

—কিন্তু আমি তো আপনাকে বহুবার বলেছি, ইষ্টার্ণ ফ্রণ্টে আমি সাধারণ সৈনিক হিসেবে ছিলাম। সুতরাং আমার পক্ষে রাজনৈতিক কোনো ব্যাপারে কি করে নিজেকে জড়ানো সম্ভব? বেশ জোরের সঙ্গেই কথাগুলো বলে ফেডার।

—দেখো সেলেনবার্গ, ভেবো না তুমিই একমাত্র চালাক। আমরাও চালাক হতে পারি। ক্রাউসেন্‌হাইন বিরক্তির সঙ্গে বলে। যাই হোক্, তোমার কমাণ্ডারের নাম কি?

—রুডলফ্ হোয়েস্। ছোট্ট করে উত্তর দেয় ফেডার।

ক্রাউসেন্‌হাইন রাগে ফেটে পড়ে এবার। টেবিলের উপরে সশব্দে প্রচণ্ড জোরে ঘুষি মেরে বলে,—তোমায় সাবধান করে দিচ্ছি, বেশী বদমায়েসী করলে জ্যান্ত পিঠের চামড়া তুলে নেবো। তুমি সহ্যের সীমা কিন্তু ছাড়িয়ে যাচ্ছো। আমি তোমার কমাণ্ডারের নাম জিজ্ঞেস করেছি, ক্যাম্প কমাণ্ডার নয়।

—সেটা আমাকে পরিষ্কার করে বলা উচিত আপনার, আমি তো বর্তমানে কোনো রেজিমেন্টে নেই। সুতরাং কি করে জানবো আপনি কোন কমাণ্ডারের কথা বলছেন? মরীয়া হয়ে সোজাসুজি কথাগুলো ছুঁড়ে দেয় ফেডার।

—আমি জিজ্ঞাসা করছি শেষ যে রেজিমেন্টে তুমি ছিলে তার কমাণ্ডারের নাম।

—ওঃ, তাই বলুন। অবজ্ঞার স্বরেই উত্তর দেয় ফেডার। মানে কর্ণেল সোয়াজ্‌ং! কিন্তু তাঁর নাম তো আপনি জানেন!

—হ্যাঁ, আমি জানি। কিন্তু এদের তো পুরোটা জানা দরকার। নইলে কি করে বুঝবেন যে বিনা দোষে তোমাকে ফাটকে পোরা হয় নি? তোমার এ্যারেষ্টের তিন মাস আগে থেকে তুমি ছুটির দরখাস্ত করেছিলে; তাই না?

—হ্যাঁ, করেছিলাম।

বসা ছ'জনকে দেখিয়ে নাটকীয় ভাবে ক্রাউসেন্‌হাইন বলে,—তার পরের ব্যাপারটা এদের একটু বুঝিয়ে বলবে কি?

ছ'জনের দিকে তাকিয়ে ফেডার বলে,—তার পরের ব্যাপার আর কি? ছুটির দরখাস্ত বাতিল।

সঙ্গে সঙ্গে ক্রাউসেন্‌হাইন ফুঁসে ওঠে,—বাতিল যে হয়েছিলো, তা' এরা জানেন। কিন্তু কেন বাতিল করা হলো?

—তার কারণ আমার জানা নেই। ফেডার উত্তর দেয়।

—তা'হলে আমি-ই তোমাকে বলে দিচ্ছি। তোমার ওপর আমাদের বিশ্বাস ছিলো না। গুপ্তচর বিভাগের রিপোর্টে অবশ্য ছিলো, ইষ্টার্ণ কমাণ্ডে তোমার বেঁচে থাকার সম্ভাবনা খুব কম। নেই বললেই চলে।

—তা'হলে আমি বেঁচে থেকে আপনাদের গুপ্তচর বিভাগের ধারণাটা মিথ্যে করে দিয়েছি, ফেডার ব্যঙ্গ করে বলে।

ক্রাউসেন্‌হাইন ওর ব্যঙ্গটাকে উপেক্ষা করে বলে চলে,—সেই সময় তোমার কমাণ্ডার তোমাকে ডেকে পাঠিয়েছিলো, তাই না?

—আমার ঠিক স্মরণ নেই। ফেডারের নির্লিপ্ত জবাব।

খিঁচিয়ে ওঠে ক্রাউসেন্‌হাইন,—মুড়ি-মুড়কির মতো সাধারণ সৈনিক হয়ে তুমি মনে করতে পারছো না কমাণ্ডার তোমাকে ডেকে পাঠিয়েছিলো কি না?

—কমাণ্ডার আমাকে ডেকে পাঠিয়ে ছুটি বাতিল হওয়াব কথাটা বলেছিলেন।

—ঠিক ঠিক। তার ছ'সপ্তাহ পরে কমাণ্ডার আবার তোমায় ডেকে পাঠিয়েছিলো?

—হ্যাঁ। এবার আমায় ডেকে পাঠিয়েছিলেন, বলতে যে অনেক চেষ্টা করা সত্ত্বেও বাতিল ছুটি গ্রাহ্য করাতে পারেন নি।

—তোমার রেজিমেণ্টের হেড কোয়ার্টাস কোথায় ছিলো?

—ফ্রণ্ট লাইনের আধ মাইল পেছনে জঙ্গলের মধ্যে একটা ভাঙ্গা বাড়ীতে।

—এর ছ' সপ্তাহ পরে তুমি ছুটিতে আসো, তাই না?

ফেডাব তিক্ত স্বরে জবাব দেয় এবার,—সেটা তো আপনি ভালো ভাবেই জানেন। নইলে বার্লিনে আমাকে এ্যারেষ্ট করলেন কি করে?

—তা'হলে এবার শোনো। আমাদের নির্দেশ ছিলো তোমায় ছুটি না দেওয়ার। তবু তোমার কমাণ্ডার তোমায় ছুটি দেয়। ছুটি না দিলে তোমায় এ্যারেষ্ট করা হতো না। আর এইজন্য তুমি-ই দায়ী।

—আমি কী করে দায়ী হলাম? ফেডার বেশ জোরের সঙ্গেই বলে। আমার ছুটি স্যাংশান হয়েছিলো এটুকুই আমি জানি।

—আষাঢ়ে গল্প সব। আমাদের আদেশ অমান্য করে কি করে কর্ণেল সোয়াজ্‌ৎ তোমায় ছুটি দিলো?

—এটা তো আমার জানার কথা নয়। হয়তো বা আমাকে এ্যারেষ্ট করার জন্য এটা একটা ফাঁদ!

—আমরা তো তোমাকে যখন খুশী এ্যারেষ্ট করতে পারতাম। তার জন্য ফাঁদের দরকারটা কী? কিন্তু আমাদের সন্দেহ কর্ণেল সোয়াজ্‌ৎ দেশের বিরুদ্ধে কোনো ষড়যন্ত্র করছে। সেই জন্য তাকে দড়িটা একটু আলগা দিয়েছিলাম, আর তা'তেই সে ঝুলে পড়েছে।

—কিন্তু এতে আমার কি দোষ?

—না, না। তোমার কোনো দোষ নেই। কিন্তু—।

—কিন্তু মানে? আমি এবং কর্ণেল সোয়াজ্‌ৎ একই ব্যাপাবে ষড়যন্ত্র করছিলাম, এটাই তো বলতে চান?

—আমাদের তো তাই মনে হয়। ক্রাউসেন্‌হাইন হালকা করে বলে।

—আমার মতো সাধারণ একজন সৈনিকেব সঙ্গে মিলে একজন কর্ণেল ষডযন্ত্র করবে! তা'হলে তো আপনারা সঙ্গে সঙ্গে সন্দেহ কববেন!

—ঠিক তার উল্টোটা। যাতে কেউ সন্দেহ করতে না পারে। প্রথম বারে তোমার ছুটিব দরখাস্ত বাতিল হয়েছে বলাব নামে তোমাকে ডেকে পাঠিয়েছিলো। আসলে ওটা তোমাকে মেসেজ দেওয়ার জন্য।

—মেসেজ? কিন্তু কমাণ্ডাবের তো কোনোরকম মেসেজ দেওয়া রীতিবিরুদ্ধ!

—ঠিক বলেছো। আমরা তাই মেসেজ সম্পর্কে বিস্তারিত জানতে চাই।

—কিন্তু কোনোরকম মেসেজ তো কর্ণেল আমায় দেননি।

ক্রাউসেন্‌হাইন জায়গা থেকে উঠে ওর টেবিলের সামনে এসে দাঁড়িয়ে চিৎকার করে বলে,—তোমায় আবার স্মরণ করিয়ে দিচ্ছি, এরা অত্যন্ত পদস্থ এস্. এস্. অফিসার। তোমার ভাগ্য বর্তমানে সম্পূর্ণ এদের হাতে। সুতরাং মিথ্যে না বলে সোজাসুজি বলে দাও কর্ণেল তোমায় কি মেসেজ দিয়েছিলো।

—আমাকে কোনো মেসেজ দেন নি।

ক্রাউসেন্‌হাইন সঙ্গে সঙ্গে বিরাশি সিক্কার একটা প্রচণ্ড চড় কষায় ওর গালে। চেয়ার থেকে পড়তে পড়তে হাতল ধরে কোনোরকমে সামলে নেয় ফেডার। কয়েক মুহূর্তের জন্য চোখের সামনে ঝাপসা দেখে।

—কর্ণেল ফ্রণ্ট লাইনের তিন মাইল দূরের একটা জায়গায় ক্রিসাউ সার্কেলের একজন মেম্বারের কাছে মেসেজটা পৌছে দিতে বলেছিলো এবং যথাসময়ে তুমি তা' পৌছে দিয়েছো।

—সব মিথ্যে। ফেডার বিড় বিড় করে বলে।

—ঠিক আছে। ক্রাউসেন্‌হাইন তার সিটে ফিরে আসে। তা'হলে দেখছি আমাদের আরো কিছুটা এগোতে হবে।

ক্রাউসেন্‌হাইন বেল টেপে। দু'জন গার্ড ঘরের ভেতরে ঢোকে। ক্রাউসেন্‌-হাইনের ইঙ্গিতে গার্ড দু'জন ফেডারকে চেয়ারের সঙ্গে বাঁধে। ইস্ত্রি বোর্ডের মতো সরু চাকা লাগানো একটা টেবিল ঠেলতে ঠেলতে ওর সামনে নিয়ে আসে।

ফেডারের ডান হাতটা সেই সরু টেবিলের ওপর বাঁধা হয়। একজন গার্ড দুটো ছোট সাঁড়াশি নিয়ে আসে। আরেকজন ওর পেছনে দাঁড়ায়। যাতে বেশী ছটফট করলে চেপে ধরতে পারে।

ক্রাউসেন্‌হাইন গলার স্বরে যতোটা সম্ভব স্বাভাবিকতা এনে বলে,—তোমাকে সত্যি কথা বলার জন্য আরেকটা সুযোগ দেওয়া হচ্ছে। কিন্তু আবার যদি সেই মিথ্যে কথাগুলোই আওড়াও, তবে বুড়ো আঙুলের নখটা ধীরে ধীরে সাঁড়াশি দিয়ে তোলা হবে, যতক্ষণ না পেট থেকে সত্যি কথা বেরোয়।

এ বীভৎসতায় কেঁপে ওঠে ফেডার। চোখ দুটো ওদিক থেকে ফিরিয়ে নেয়। যাতে অন্ততঃ সাঁড়াশি দুটো নজরে না আসে। ওদিকে গার্ডটা সাঁড়াশির মুখটা খোলা আর বন্ধ করায় ব্যস্ত। ফেডার বুঝতে পারে, গার্ডটা ভেতরে ভেতরে রীতিমতো অধৈর্য হয়ে পড়েছে।

দু'একজন অফিসার নড়েচড়ে বসে। যাতে দৃশ্যটা পুরোপুরি উপভোগ করা যায়। ফেডার জানে, এ অত্যাচারের হাত থেকে কোনো কিছুই ওকে রেহাই দিতে পারবে না, এমন কি কনফেসন করেও লাভ নেই। মজা দেখার জন্যই এরা এখানে সমবেত হয়েছে।

সমস্ত কিছু প্রস্তুত হলে, ক্রাউসেন্‌হাইন জায়গা ছেড়ে ওর চেয়ারেব কাছে উঠে এসে দাঁড়ায়,—তুমি কমাণ্ডারের জন্য যা করেছো, তার জন্যই সে অনেক চেষ্টা করে তোমাকে ছুটি পাইয়ে দিয়েছে, তাই না ?

ভেতরের ভয়টাকে চেপে রেখে, যতোদূর পারা যায় গলার স্বরটাকে নরম করে ফেডার বলে,—কর্ণেল আমায় বলেন নি, কি করে ছুটি তিনি মঞ্জুর করিয়েছেন।

ক্রাউসেন্‌হাইন উঁচু গলায় বলে,—একটা সর্তে তোমার ছুটি মঞ্জুর করা

হয়েছে। আর সে সর্তটা হলো, বার্লিনের একটা নির্দিষ্ট বাড়ীতে তোমাকে মুখে মুখে একটা বিশেষ সংবাদ পৌছে দিতে হবে।

—না। ফেডার অস্বীকার করে। এটা আমি আপনার কাছ থেকে প্রথম শুনছি।

সঙ্গে সঙ্গে বুড়ো আঙুলের নখে একটা তীব্র যন্ত্রণায় তীক্ষ্ণ চিৎকার করে ওঠে ফেডার।

—তুমি যদি তোমার কমাণ্ডারকে প্রোটেকট্ করার চেষ্টা করো, তবে তার চেয়ে মারাত্মক ভুল আর কিছু নেই। আসলে ব্যাপারটা আমারা সবাই জানি! আর তোমার কর্ণেল সোয়াজ্‌ৎ এই মুহূর্তে গেষ্টোপা হেড কোয়ার্টার্সে বন্দী। এবং সে স্বীকার করেছে তোমায় একটা বিশেষ বার্তা বহন করার জন্য দিয়েছিলো।

ফেডার মাথাটা উঁচু করে। গলার স্বরটা অপেক্ষাকৃত দৃঢ় করে বলে,—তা'হলে আর আমার মুখ থেকে সেটা শোনার জন্য চাপাচাপি করছেন কেন? কর্ণেল সোয়াজ্‌ৎ-এর কথা আমার থেকে নিশ্চয়ই অনেক বেশী মূল্যবান।

দ্বিতীয়বার আবার বুডো আঙুলের যন্ত্রণায় চিৎকার করে ওঠে ফেডার। ক্রাউসেন্‌হাইনের ইঙ্গিতে গার্ড সাঁড়াশিটা আলগা করে।

—তুমি কি নিজেকে খুব বেশী চালাক বলে মনে করো! আর গেষ্টোপারা কি এতোই বোকা? আমি জানতে চাই, মেসেজটা কি ছিলো এবং কোন ঠিকানায় নিয়ে গিয়েছিলে?

—আমি কোনো বার্তা কোনো ঠিকানায় নিয়ে যাই নি! ওর ভেতরে আবার দৃঢ়তা ফিরে আসে।

তৃতীয়বারের প্রচণ্ড যন্ত্রণায় বাঁ হাত দিয়ে মুখটা ঢেকে ফেলে ফেডার। মনে হয় এবারে নখটা উপড়ে ফেলেছে।

বসে থাকা দু'জন অফিসারের একজন এতোক্ষণে মুখ খোলে। ফেডারের মনে হয়, ওর ওপরে এতোক্ষণের অত্যাচারে লোকটা সত্যি বিচলিত।

—ইয়ংম্যান, তুমি একটা ইডিয়ট্। যা জানো বলে দিলেই তো ল্যাঠা চুকে যায়।

ফেডার এ কথার কোনো উত্তর না দিয়ে সাঁড়াশি হাতে গার্ডটার শয়তানি মুখের দিকে তাকায়। আউস্‌ভিৎজে ঢোকার পর এই প্রথম ও চরম অত্যাচারের মুখোমুখি হয়েছে। এবং যদি মনের দৃঢ়তা ও হারিয়ে ফেলে, তবে শত্রুরা ওকে ধ্বংস করে দেবে, টুকরো টুকরো করে ফেলবে।

যখন মাথার মধ্যে বিদ্রোহের পোকা নড়ে-চড়ে বেড়াচ্ছে, ঠিক তখনই এ ধরনের অত্যাচার কিছুটা নিস্পৃহ করে যাতে না দেয়, তার জন্য মানসিক দৃঢ়তাকে যতোটা পারে টেনে উঁচুতে রাখে ফেডার। এবং ওকে এই বিদ্রোহের আয়োজন সম্পূর্ণ করতে হলে সাধারণভাবে পুরো ক্যাম্পে ঘুরে বেড়াবার স্বাধীনতা দরকার। যাতে দেখে-শুনে লোকজন নির্বাচন করা যায়। সুতরাং কোনোরকমেই পঙ্গু হয়ে পড়লে চলবে না।

—আমি এসব বিষয়ে কিছু জানি না। দৃঢ়তার সঙ্গে একই কথার পুনরাবৃত্তি করে ফেডার।

চতুর্থবার নখটার ওপর সাঁড়াশির চাপ দিতেই সারা দেহটায় মোচড় দিয়ে তীব্র চিৎকার করে ওঠে ফেডার। বসে থাকা ছ'জন অফিসার নিজেদের মধ্যে নীচু গলায় পরামর্শ করে ক্রাউসেন্‌হাইনকে কাছে ডাকে। ক্রাউসেন্‌হাইনের ইঙ্গিতে হঠাৎ সাঁড়াশি দিয়ে নখ তোলা গার্ডটা বন্ধ করে দেয়। তারপর ওর বাঁধন খুলে টেনে হিঁচড়ে করিডর দিয়ে একটু দূরের একটা ঘরে নিয়ে যায়। সেই ঘরে সিমেণ্ট দিয়ে শক্ত করে পোঁতা একটা পোল। মেঝেতে কয়েকটা লোহার রিং গাঁথা। ওর পা দুটো সেই রিংয়ে শক্ত করে আটকে, হাত দুটোকে পোলের সঙ্গে বাঁধে।

বাঁধাছাঁদা হয়ে গেলে ক্রাউসেন্‌হাইন তিন জন অফিসারকে সঙ্গে নিয়ে ঘরে এসে ঢোকে। গার্ডরা তখন ওকে নতুন শাস্তি দেবার জন্য প্রস্তুত হচ্ছে।

ওর কোমর পর্যন্ত আদল করে, ষণ্ডা একটা গার্ড পাতলা চামড়ার একটা লম্বা ফালি হাতে নিয়ে দাঁড়ায়। ক্রাউসেন্‌হাইন ওর চারপাশটা ঘুরে টুরে দেখে নিয়ে বলে,—এটাই তোমার শেষ সুযোগ। নইলে বেত মারা হবে। তোমাকে বলতেই হবে, এখন না বললেও পরে। সুতরাং ব্যাপারটাকে প্রলম্ব করে লাভ কী?

—আমার কিছু বলার নেই। ফেডার মৃদুস্বরে কথা ক'টা বলে মাংসপেশী-গুলোকে সংকুচিত করে। যাতে বেতের আঘাতগুলোকে সহ্য করতে পারে।

প্রথম বেতের আঘাতটায় যতোটা যন্ত্রণা বোধ হয়েছিলো, পরের পাঁচ ঘাতে আর ততোটা অনুভূত হয় না। শরীর যেন অনেকটা অসাড় হয়ে এসেছে। মাথা থেকে পা পর্যন্ত জ্বলছে। কেউ যেন সারা শরীরে পেট্রোল ঢেলে দিয়ে আগুন ধরিয়ে দিয়েছে। মস্তিষ্কটা নিঃসাড়। সমস্ত শরীরটা ধুঁকছে। উলঙ্গ করে ওকে যেন বরফের ওপর শুইয়ে রেখেছে। ক্রাউসেন্‌হাইন আবার সেই আগের কথার পুনরাবৃত্তি করে,—মেসেজটা কী এবং কোথায় নিয়ে গিয়েছিলে?

ফেডারের বাক্‌শক্তি প্রায় লুপ্ত হয়ে এসেছে। বিড বিড় করে বলা কথাও দুর্বোধ্য।

আরো ছ' ঘা বেত পড়ে। অবশ্য তখন ও প্রায় অজ্ঞান। ওর মনে হয়, বহুদূর থেকে এখনো ক্রাউসেন্‌হাইনের ক্রুদ্ধ স্বরের অস্পষ্ট প্রশ্নটা শুনতে পাচ্ছে। কিন্তু তখন ফেডারের বাক্‌শক্তি সম্পূর্ণ লুপ্ত হয়ে গেছে। কনফেসান করার ইচ্ছে থাকলেও সে উপায় আর নেই। কিছু অস্পষ্ট একটা অনুভূতি।

সারা শরীরটা জ্বলছে। কিন্তু ক্রাউসেন্‌হাইন উন্মত্ত। পাগলের মতো ক্রমাগত বেত্রাঘাতের আদেশ দিয়ে চলেছে। আরো বারোটা বেতের আঘাতের পর গার্ডটা যখন থামে, ওর সারা পিঠটা তখন চিরে ফালাফালা হয়ে গেছে। পা বেয়ে দরদর করে রক্তের স্রোত নামছে। অবশ্য এ সবের স্পষ্ট কোনো বোধ নেই ওর।

ওর হাত পায়ের বাঁধন খুলে দু'জন গার্ড দুর্গন্ধময় সরু একটা কবিডর দিয়ে হিঁচড়ে ওকে নিয়ে আসে। কিছুটা দূরে এসে একটাম্যান্‌হোলের সামনে থামে। ঢাকনাটা তুলে ওর প্রায়-অজ্ঞান হয়ে যাওয়া শরীরটাকে উঁচু করে তুলে ধরে ম্যান্‌হোলের ভেতরে ছুঁড়ে দেয়। কয়েক গজ নীচে মেঝের ওপরে ওর আচ্ছন্ন দেহটা ধপাস্ করে সজোরে পড়ে। মনে হয় হঠাৎ কয়েকশ' ফুট নীচে যেন ওকে ছুঁড়ে দিয়েছে। যেটুকু বা জ্ঞানের আভাস ছিলো, তা'ও হারিয়ে ফেলে।

কতক্ষণ এই অবস্থায় পড়ে ছিলো তা' নিজেই জানে না ফেডার। জ্ঞান ফিরে এলে প্রথমেই মনে হয়, এখন রাত। আর ওকে এক গাদা আবর্জনাব মধ্যে ছুঁড়ে দিয়েছে।

এতো ঘন অন্ধকারের মুখোমুখি জীবনে কখনো হয় নি। নিশ্ছিদ্র অন্ধকার। চারিদিকে তাকায় ফেডার। কয়েক ইঞ্চি দূরের জিনিষ দেখা যায় না। রাতের অন্ধকারও এতো ঘন হয় না।

চকিতে মনে পড়ে যায় ডলম্যান ওকে বোতল-ঘরের কথা বলেছিলো। তা'হলে এটা নিশ্চয় সেই বোতল-ঘর।

হাত পায়ের মাংসপেশীগুলো পর্যন্ত মারের চোটে শক্ত হয়ে গেছে। নড়া-চড়ার উপায় নেই। কোনোরকমে চেষ্টা করে ফেডার উপুড হয়ে শোয়। কিছুক্ষণ উপুড় হয়ে শুয়ে থাকার পর ব্যথাটা যেন কিছুটা কম লাগে। মেঝের ওপর উঠে বসে চারিদিকে হাতড়ে বোঝে ওপরের দিকে সরু হয়ে গেছে পাতাল-ঘরটা। এবার নিঃসন্দেহ হয় ফেডার। হ্যাঁ, এটাই আউস্‌ভিৎজের বিখ্যাত পাতাল-ঘর। তবু কিছুটা স্বস্তি অনুভব করে। ডলম্যান বলেছিলো, বোতল-

ঘরে কষ্ট হলেও থাকার অর্থ হলো বাইরের অত্যাচারের হাত থেকে রেহাই পাওয়া। তবু এটার ভেতরে কয়েক সপ্তাহ তো দূরের কথা, কয়েকটা দিন কাটানোর কথা ভাবতেও সারা শরীর শিউরে ওঠে ফেডারের।

একটু আঁলোর ইসারার জন্য চারদিকে ভালো করে তাকায় ফেডার। কিন্তু না। একটা রশ্মিও নজরে পড়ে না। তবে বাতাস ঢুকছে কি করে? হয়তো-বা ওপরের ঢাকনাটা খুলে রেখেছে।

যদি কেউ ঢাকনাটা বন্ধ করে দেয়? তবে? ভাবতেই শরীরটা কেঁপে ওঠে। তবে তো জীবন্ত কবর। এর চেয়ে গ্যাস-চেম্বার অথবা উনোনে পুড়িয়ে মারাও অনেক ভালো। এবার মনে হয় নিশ্চয়ই ঢাকনাটা বন্ধ করে দিয়েছে। তার মানে দমবন্ধ হয়ে মারা যাবে।

কোনোরকমে খাড়া হয়ে দাঁড়ায় ফেডার। মেঝেটার একটা দিক ঢালু। ঘরটা অনেকটা থালার মতো। মসৃণ পাথরের দেওয়াল। পিচ্ছল। হাত দিয়ে ধরার উপায় নেই। সুতরাং দেওয়াল বেয়ে ওপরে ওঠবার কোনো প্রশ্নই ওঠে না। সারা ঘরটা ঘুরে দেখে ফেডার।

বোতল-ঘরের গলার দিকে নজব দেয় এবার। যদি লাফ দিয়ে গলাটাব কাছটা ধরা যায়। গোড়ালিব ওপর ভর দিয়ে যতোটা উঁচু হওয়া যায়, হয়ে চেষ্টা করে বুক ভরে মুক্ত বাতাস টেনে নিতে। এবার ভাগ্য বোধহয় একটু প্রসন্ন। ঠাণ্ডা বাতাসের ঝলক অনুভব করে ফেডাব। যাক্ অন্ততঃ দমবন্ধ হয়ে মারা যাওয়ার ভয় নেই। আশায় আশায় আর এক পা এগোয় ফেডার। সঙ্গে সঙ্গে উজ্জ্বল বিদ্যুতের জোরালো আলো ওর মুখের ওপর এসে আছড়ে পড়ে। কয়েক পা পিছিয়ে আসে ফেডার। আলোটা নিভে যায়। তার মানে লাইটটা অটোমেটিক্। ওর চলাফেরার ওপর নিজে থেকে জ্বলে অথবা নেভে।

ফেডার সরে এসে ঠাণ্ডা স্যাঁতসেতে মেঝেতে বসে পড়ে। বুঝতে পারে, ওর নড়াচড়ার ওপর সতর্ক দৃষ্টি রাখার জন্যই আলোটাকে রাখা হয়েছে। যখনই আলোটা জ্বলে ওঠে, গার্ডরা ওর ওপরে নজর রাখে। প্রয়োজন মতো বাইরে থেকেও আলোটা জ্বালানো-নেভানো যায়। ওকে যেন পর্যবেক্ষণের জন্য কাঁচের খাঁচায় রেখে দেওয়া হয়েছে। খাওয়ার সময় খাবার মেঝেতে ছড়িয়ে ছিটিয়ে দেওয়া হবে। যাতে ওকে ঘুরে ঘুরে খুঁটে খেতে হয়। আর এপাশ-ওপাশ করলেই আলোটা জ্বলবে, নিভবে। গার্ডরা যাতে বুঝতে পারে, ও ঠিক কোথায় আছে। এ যেন এ্যাকুরিয়াম বা চিড়িয়াখানায় শো-কেশে রাখা সরীসৃপ। যদিও তাদের অবস্থা ওর চেয়ে অনেক ভালো। আলোটা নেভানো মানেই ও চুপ-

চাপ বসে আছে; ওর এতোটুকু চলাফেরা পর্যন্ত আলোটার সংকেতের সঙ্গে সঙ্গে রেকর্ড হয়ে যায়। হঠাৎ মাথায় একটি ফন্দী আসে ওর। নিশ্চুপ এক জায়গায় স্থির নিশ্চল হয়ে বসে থাকলে, গার্ডরা ভাববে ও মরে গেছে। তখন ওকে দেখতে নীচে নামলে সেই গার্ডকে হত্যা করে সোজা তার ইউনিফর্ম পরে যদি ও বেরিয়ে যায়? পর মুহূর্তে নিজের পরিকল্পনায় নিজেরই হাসি পায়। গার্ডগুলো এমন বোকামী ভুলেও করে না, যেখানে বন্দীর করুণার মুখোমুখি ওদের দাঁড়াতে হয়।

মরার ভান করে যে পড়ে থাকবে তারও উপায় নেই। গেষ্টোপারা এতো সহজে বিশ্বাস করে না। সোজা শরীরের যেখানে ইচ্ছে পুরো আলপিন ফুটিয়ে দেবে।

এক জায়গায় বসে বসে ঝিমুনি আসে ফেডারের। সেই ঝিমুনির ঘোরে ওর মনে হয় বোতল-ঘরের দেওয়ালগুলো যেন ওর দিকেই এগিয়ে আসছে পিশে মারার জন্য। এখন ডলম্যানের মানসিকতাটা উপলব্ধি করতে পারে। ডলম্যান বলেছিলো, আলোটা জ্বললে মনে হয় অন্ধকারই ভালো, অন্ধকারে মনে হয় আলো জ্বললে বেঁচে যাই।

ফেডার চুপচাপ যেখানে বসেছিলো, নিশ্চলভাবে সেখানেই বসে থাকে। মনের পরতে পরতে ভাসতে থাকে এ ক্যাম্পে আসার পর থেকে আজ পর্যন্ত যন্ত্রণাদায়ক অত্যাচারের ঘটনাগুলো। ও যেন অন্ধকার একটা সিনেমা হল্-এর ভেতরে বসে আছে। সামনে সেলুলয়েডের ফিতের ওপর সারিবদ্ধ ছবি; ছবির মিছিল। উঁচু মাথাগুলোকে ভয়ের দাপটে জোর করে মাটিতে নুইয়ে দেবার চেষ্টা। পুরো দেশটাই যেন কনসেনট্রেশন ক্যাম্পে পরিণত হয়েছে। বন্দী আর গার্ডের মধ্যে পার্থক্য সামান্যই। বন্দীরা যুদ্ধ করছে বন্দীত্বের বিরুদ্ধে; আর গার্ডগুলো এ বন্দীত্ব মেনে নিয়েছে। উভয়ের জীবন নির্ভর করছে বেগ্‌টাগাদেনের শকুনগুলোর ওপরে। এই দেশজোড়া কনসেনট্রেশন ক্যাম্পের একটা ক্ষুদ্র অংশই হলো এই আউস্‌ভিৎজ্। এতোবড়ো জার্মানিতে একজনও স্বাধীন আছে! তা' সে যতো পদস্থ অফিসারই হোক না কেন বরং উপরিওয়ালার কাছে তাদের পরাধীনতা ততো বেশী। এ চিন্তাটা কয়েক মুহূর্তের জন্য হলেও মনে কিছুটা শান্তি এনে দেয়।

হিটলার পুরো একটা জাতকে দাসে পরিণত করেছে। আর এই শ্রেণীবদ্ধ দাসদের প্রথম সারিতে হলো বন্দীরা। যারা মাথা উঁচু করে চলতে চায়; হিটলার ঈর্ষায় তাদের এ নরকে ঠেলে দিয়েছে। সমস্ত দেশটাই যেন অন্ধ।

এক চোখ কবন্ধের মতো হিটলার রক্তচক্ষু দেখিয়ে চলেছে। সামাজিক স্তর হিসেবে বিচার করলে যে যতো বড়ো নাজী, সে ততো নীচের স্তরের। হিমলার, গোয়েরিং, গোয়েবেল্‌স প্রভৃতিরা একেবারে সিঁড়ির নীচের ধাপে দাঁড়িয়ে আছে। আর নাজী-ঈশ্বর হলো হিটলার। এতো বড়ো শয়তানের শৃঙ্খল পৃথিবীর ইতিহাসে আগে কখনো দেখা যায়নি। পৃথিবীর মনুষ্যত্বটাকে জ্বালিয়ে পুড়িয়ে খাক্ করার জন্য পুরো একটা জাত নিজেকে উৎসর্গ করে বসে আছে। হিটলার সারা পৃথিবীব ওপরে প্রভুত্ব করতে চায়। যারা তার উপকারে আসবে না তাদের নিশ্চিহ্ন করার পরিকল্পনা। কোটি কোটি লোক ক'টা লোকের দাস হয়ে বেঁচে থাকুক, এটাই হিটলার চায়।

চিন্তার সূত্রটা হঠাৎ ছিঁড়ে যায়। বোতল-ঘরের ওপর থেকে কোলাহল ভেসে আসছে।

আলোটা জ্বলে ওঠে। একটা গার্ড সেলের ভেতরে উঁকি দেয়। একটু পরে এক ক্যানেস্তারা খাবার নামে। মাছের মতো ঘোলাটে দৃষ্টি নিয়ে তাকিয়ে দেখে ফেডাব। কিন্তু এগিয়ে গিয়ে হাত বাড়িয়ে ক্যানেস্তারাটাকে নেওয়ার কোনো চেষ্টা করে না।

ওকে স্থির হয়ে এক জায়গায় বসে থাকতে দেখে গার্ডরা চিৎকার করে ওঠে, – মনে থাকে যেন, তোমাকে এক মিনিট সময় দেওয়া হবে। সুতরাং ভালো ছেলের মতো ক্যানেস্তারাটা ধরো নইলে কাল এই সময় পর্যন্ত নিরম্বু উপবাসে থাকতে হবে।

ফেডার টলতে টলতে কোনোরকমে জায়গা থেকে উঠে গিয়ে তারের হুক্ থেকে ক্যানেস্তাবাটা খুলে নিয়ে জায়গায় ফিরে আসে। ক্ষিদেয় শরীরটাকে মিছিমিছি কষ্ট দিয়ে লাভ কী? তবু ভেতর থেকে খাওয়াব প্রতি একটা বিতৃষ্ণা জেগে ওঠে। এর ভেতরে তো আছে সেই জলের মতো পাতলা বিস্বাদ সুপ।

সুপটুকুকে অতিকষ্টে চোখ মুখ বুজে গলার ভেতরে ঢেলে দেয়। সামনে অফুরন্ত সময়। অবশ্য অত্যাচার যদি ওর মনটাকে পঙ্গু করে না ফেলে।

ফেডার ঠিক বুঝে উঠতে পারে না, কতোক্ষণ ধরে ও সেলের ভেতরে আছে! তবে বেত্রাঘাতের পর বেশ কয়েকঘণ্টা নিশ্চয়ই পার হয়ে গেছে।

ক্ষতগুলো ব্যথায় টিস্‌টিস্‌ করছে। মেঝেতে কয়েক পা চলাফেরা করতে গেলে টনটনিয়ে উঠছে। তবু অনড় হয়ে এক জায়গায় বসে থাকলে হয়তো-বা পঙ্গু হয়ে যাবে। অবচেতন মনের গভীর স্তরে এমন অবস্থাতেও বাঁচার আশাটাই ওকে নড়াচড়ার শক্তি জোগায়।

চিন্তার স্রোতটা বাঁক নেয়। ওর চোখের সামনে ভেসে ওঠে বার্লিন থেকে ওর যাত্রার দৃশ্যগুলো। সে কী ভয়ংকর! শ'য়ে শ'য়ে কম্পার্টমেণ্ট যেন গরু ছাগল ভর্তি করে পশ্চিম থেকে পূবের দিকে ছুটে চলেছে। চারদিকে ছড়ানো ছিটানো কনসেনট্রেশন ক্যাম্প। দাসাউ, বুখেন্‌ভাল্ড, বেলসন্‌— দীর্ঘ মৃত্যু রেখার পাশে পাশে এগুলো এক একটা বিরাট জংশন। এখানেই গেষ্টোপাদের দল নিষ্ঠুরতায় নিজেদের পারদর্শী করার জন্য হাত পাকায়। আর হিটলারের পরিতৃপ্তি বোধহয় এখানেই, প্রতি দিনে, প্রতি ঘণ্টায়, প্রতি পলে কেউ না কেউ তার অনুচর দ্বারা নিগৃহীত হচ্ছে।

কিন্তু অনেক ভেবেও বুঝতে পারে না ফেডার, কী করে একটা মানুষ নিজেকে এই অবস্থায় সবচেয়ে নিরাপদ ভাবে। অত্যাচারের দ্বারা একটা মানুষকে বশে রাখার প্রয়োজন মানেই তো নিজের দুর্বলতা। নড়বড়ে এই শাসন ব্যবস্থা আর কতোদিন চলবে? ঘূণ ধরা কাঠের সিঁড়ির মতো একদিন তা' ভেঙে পড়তে বাধ্য।

এবং এটাই সময়। হ্যাঁ, বিদ্রোহের প্রস্তুতির। এমন কি আউস্‌ভিৎজে যদি সে বিদ্রোহ সফল নাও হয়, তবু বাইরের অন্যান্য ক্যাম্পগুলো তো এ বিদ্রোহের আগুন থেকে নিজেদের মশাল জ্বালিয়ে নিতে পারবে! আসলে ক্যাম্পের মানুষগুলো প্রাণে বেঁচে থাকলেও মনুষ্যত্বের দিক থেকে সত্যিকারের মরার আগেই মরে গেছে। সামান্য এক টুকরো সুযোগের জন্য জন্তুবিশেষ গার্ডগুলোর পা ধরতেও কার্পণ্য করে না।

নিজের দিকে তাকায় ফেডার। অত্যাচারের ভয় ও করে না। কিন্তু যেমন দ্রুতগতিতে ওর আত্মমর্যাদা নীচের দিকে নেমে চলেছে, নিজেরই ভয় করে। তবু সেই আত্মমর্যাদাহীন জীবনটাকে বাঁচিয়ে রাখার জন্য বন্দীদের সে কি সকরুণ প্রয়াস!

জীবনের মূল্য-ই বা কতোটুকু এখানে? যেখানে মানুষ ভুঁই-কীটের মতো প্রতিনিয়ত পদদলিত হচ্ছে। আর নিজের চারদিকে প্রতি মুহূর্তে হাজার হাজার মৃত্যু দেখে দেখে ফেডার মৃত্যুভয় অথবা জীবনভয় দুটোকেই হারিয়ে ফেলেছে। সুতরাং মৃত্যুটাকে অন্ততঃ এই পরিবেশে এবং পরিপ্রেক্ষিতে

কোনোমতেই বেঁচে থাকার চেয়ে খারাপ বলা যায় না। এমন কি গ্যাস চেম্বারের ভেতর দিয়ে যাদের মৃত্যুর পথ হাঁটতে হয়, তাদের তো কয়েক মুহূর্তের ভয়; পেছনে পেছনে কয়েক মিনিটের বিস্মৃতি। আর তারপরেই সুখ-দুঃখ, সমস্ত রকম অনুভূতি—নদীর ওপারে যাত্রা। সুতরাং তিলে তিলে যন্ত্রণার চেয়ে সেটা অনেক বেশী কাম্য। আর এই বিদ্রোহে যদি প্রাণ যায়, সেটা হবে অনেক বেশী গৌরবজনক। মহৎ একটা কারণের জন্য। নিজের প্রতি অটুট আত্মমর্যাদার সঙ্গে।

হঠাৎ মাথার ভেতরে বিদ্যুতের মতো একটা চিন্তা খেলে যায়। সমস্ত কিছু স্বীকার করে নিলে কেমন হয়? তা'তে এই সেল থেকে মুক্তি পেয়ে যদি সাধারণ বন্দীদের সঙ্গে মেলামেশার সুযোগ পায়। তবে ওর পক্ষে বিদ্রোহের সংগঠন করা অনেক সহজ হবে। অবশ্য সেটা হবে ক্রিসাউ সার্কেলের প্রতি নিঃসন্দেহে বিশ্বাসঘাতকতা। কিন্তু ক্রিসাউ সার্কেলের মুষ্টিমেয় কয়েকজনের জীবনের চেয়ে হাজার হাজার বন্দীর জীবনের মূল্য অনেক বেশী।

এমনিতেই ওর ব্যক্তিগতভাবে মনে হয় ক্রিসাউ সার্কেল তাদের লক্ষ্যে কিছুতেই পৌছতে পারবে না। ক্রিসাউ সার্কেলের লক্ষ্য হলো হিটলারের প্রাণনাশ। পর পর চারবার ব্যর্থ হয়েছে সে ষড়যন্ত্র। তাই আবার হিটলারকে হত্যা করার সুযোগ পাবে এমন মনে হয় না।

তার চেয়ে বড়ো হলো, হিটলারকে মেরে ফেলতে পারলেই কি এই নাৎসী রাজত্বের অবসান হবে? সেই শূন্য সিংহাসনে হিমলার অথবা অন্য আরেকটা পশু বসে নাৎসী স্রোত অব্যাহত রাখবে।

ফেডার মনটাকে স্থির করে হাঁটু গেড়ে প্রার্থনায় বসে। একমনে নিজের ভেতরে শক্তি কামনা করে। যা'তে বিদ্রোহটা সফল ভাবে সংগঠন করতে পারে।

মনটাকে আগের চেয়ে দৃঢ় বলে মনে হয়। অনেক বেশী আত্মবিশ্বাস ফিরে এসেছে। জায়গা থেকে উঠে মেঝেতে পায়চারী করে ফেডার। আলোটা একবার জ্বলছে, নিভছে। আর কিছু না হোক, গার্ডগুলো তো বিরক্ত হবে। ক্রমাগত একই খেলা খেলতে থাকে ফেডার। গার্ডটা বিরক্ত হওয়া তো দূরের কথা, কেউ সম্ভবতঃ নজরই দেয়নি।

প্রায় ঘণ্টা তিনেক পরে গার্ডদের নজরে আসে। ফেডার একপাশে সরে গিয়ে দাঁড়ায়। হঠাৎ ক্রাউসেনহাইনের কর্কশ স্বর ভেসে আসে—ফেডার সেলেনবার্গ, মেঝের কেন্দ্রে এসে দাঁড়াও।

তবু ফেডার চুপ করে আগের জায়গায় দাঁড়িয়ে থাকে। হঠাৎ তীব্র একটা আলোর ঝলকানিতে সেলটা উজ্জ্বল হয়ে ওঠে। ফেডারের মনে হয়, বিষ ভর্তি একটা বোতলের ভেতরে ওকে ফেলে দেওয়া হয়েছে। সবুজ কাঁচের দেওয়াল দেখে মনের ভেতরে সেইরকমই একটা অনুভূতি জাগে। বাইরে নিশ্চয়ই লাল অক্ষরে লেবেল আঁটা—বিষ, পানের জন্য নহে। মুহূর্তে নিজেকে আর রক্তমাংসের মানুষ বলে মনে হয় না। ক্রাউসেন্‌হাইনের কর্কশ গলার স্বরটা বোতল-ঘরের চারিদিকে প্রতিধ্বনিত হচ্ছে।

—ফেডার সেলেনবার্গ, জাতির শত্রু, এখনো কী অস্বীকার করো যে বার্লিনে তুমি কোনো সংবাদ নিয়ে যাও নি?

ফেডার চুপ করে থাকে।

স্বরটা আরো উঁচুতে ওঠে,—কোন ঠিকানায় তুমি সংবাদ নিয়ে গিয়েছিলে?

এইবার ফেডার মুখ খোলে। চিৎকার করে বলে,—যতোক্ষণ আমাকে এই বোতল-ঘরের ভেতরে রাখা হবে, ততোক্ষণ কিছুতেই আমি সেই ঠিকানা দেবো না।

ওর নিজের গলার স্বরটাই প্রতিধ্বনিত হয়। হঠাৎ আলোটা নিভে যায়। রুদ্ধশ্বাসে ফেডার অপেক্ষা করে পরবর্তী পদক্ষেপের। কিন্তু না। ক্রাউসেন্‌হাইন ততোক্ষণে চলে গেছে।

হতাশ লাগে ওর। ছোট্ট একটু আভাস দিলে হয়তো বা ওকে বোতল-ঘর থেকে বাইরে নিয়ে যেতো। নিজেব ওপরেই রাগ হয়। যে করেই হোক, এই বোতল-ঘর থেকে মুক্তি ওকে পেতেই হবে, নইলে বিদ্রোহ করা অসম্ভব।

যে মুহূর্তে ক্রাউসেন্‌হাইন বুঝবে, ওর কাছে কোনো সংবাদই নেই, অথবা যা ছিলো তা' সংগ্রহ করা হয়ে গেছে, সঙ্গে সঙ্গে হয় গ্যাস চেম্বার নয় তো গলার পেছনে গুলি করে ওকে হত্যা করা হবে। প্রতিদিনই এইভাবে খুন করা হচ্ছে। প্রথমে গর্ত খুঁড়িয়ে তারপর সেই নিজ হাতে খোঁড়া গর্তের সামনে দাঁড় করিয়ে পেছনদিক থেকে গলায় গুলি করে ওরা। যাতে দেহটা নিজে থেকে গড়িয়ে গর্তে পড়ে। অর্থাৎ, বহন করার পরিশ্রম থেকে বাঁচোয়া। এর জন্য বিশেষ ধরনের পিস্তল ব্যবহার করে ওরা। বিশেষ করে, যুদ্ধবন্দীদের এই ভাবে হত্যা করে ন্যাচারাল ডেথ্‌ বলে রেকর্ডে লিখে রাখে।

শরীরের কাটা ছেঁড়া ক্ষতগুলোর মুখ খুলে গিয়ে রক্ত গড়াচ্ছে।

আলোটা নিভে গিয়ে বোতল-ঘরটা সম্পূর্ণ অন্ধকার। ভয় হয়, এই বুঝি নিঃশ্বাসটা চেপে বন্ধ হয়ে এলো।

হঠাৎ ঢাকনাটা খোলার শব্দ হয়। সঙ্গে সঙ্গে আলোটা জ্বলে ওঠে। দীর্ঘ একটা ছায়া পড়ে মেঝেতে।

—সেলেনবার্গ, তোমাকে বাইরে আনা হবে। গম্ভীর একটা গার্ডের গলা।

ছোট্ট একটা লোহার সিঁড়ি গার্ডটা নামিয়ে দেয়। বোতল-ঘরের গলা পর্যন্ত নেমে আসা সিঁড়িটা বেয়ে ওঠা কষ্টকর। কয়েক মিনিটের প্রাণান্তকর চেষ্টায় ফেডার সিঁড়িটার ওপরে ওঠে। দমকা এক ঝলক ঠাণ্ডা বাতাস।

ওকে ক্রাউসেন্‌হাইনের ঘরে নিয়ে আসে।

—তা'হলে এখনো তোমার জ্ঞানগম্যি ফেরেনি? ঠিক আছে! এর জন্য আমাদের কাছে দাওয়াইও তৈরী। আর তুমি তো তা জানো, ঠিক না?

ফেডার হালকা করে বলে,—কিন্তু আমি যা জানতাম তা' তো বলেছি।

—এ পর্যন্ত তুমি যা বলেছো, সবই আগে আমরা জানতাম। কিন্তু কমাণ্ডারের দেওয়া মেসেজ কোন ঠিকানায় দিয়েছো তা' তো বলো নি।

—এ বিষয়ে আমার কিছু জানা নেই।

—মিথ্যেবাদী। সঙ্গে সঙ্গে গর্জন করে ওঠে ক্রাউসেন্‌হাইন। ক্রিসাউ সার্কেলের মেম্বার, কিন্তু এস্. এস্. তার কাছে দিয়েছো। নামটা বলে দিলে তোমায় ছেড়ে দেওয়া হবে।

—আমি তো বার বার বলছি এমন কোনো অফিসারকে আমি চিনি না।

—আবার মিথ্যে বলছো? দ্বিগুণ জোরে চিৎকার করে উঠে ক্রাউসেন্‌হাইন ওর দিকে তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে তাকায়। ফেডার মেঝের দিকে দৃষ্টি নামায়।

—স্পেশাল লিভ কিসের জন্য নিয়েছিলে?

তিক্ত স্বরে উত্তর দেয় ফেডার—বিয়ের জন্য।

—আচ্ছা, সেই বিয়ের ব্যবস্থাটা যদি এখানেই হয়, তবে? তবে নাম বলবে?

ফেডার ক্রাউসেন্‌হাইনের মুখের দিকে তাকায়। সেখানে স্পষ্ট ফুটে উঠেছে নিষ্ঠুরতার চিহ্ন।

—তবে সরল সাদামাঠা বিবাহ অনুষ্ঠান হবে এটা। ক্রাউসেন্‌হাইন আলতো করে বলে।

—কিন্তু যদি বর্তমানে আমি বিয়ে না করতে চাই? ফেডার জিজ্ঞাসা করে।

—সেটা নির্ভর করছে সম্পূর্ণ তোমার ওপরে। তা'হলে বিয়ে-সাদির ঝঞ্ঝাট বাদ দিয়ে ছোট্ট একটা হনিমুনের ব্যবস্থা করি? অবশ্যই ক্যাম্পের ভেতরে। ও ঠিক ক্রাউসেন্‌হাইনের চালটা ধরে উঠতে পারে না।

—তা' হলে তো খুব-ই ভালো হয়। কিন্তু বর্তমানে ফিঁয়াসের সঙ্গে মেলবার মতো মনের অবস্থা আমার নেই। আর আমাকে এই অবস্থায় দেখলে, খুশীর চেয়ে শক্ পাবে অনেক বেশী। সপ্তাহ তিনেক লাগবে ক্ষতগুলো শুকোতে, অবশ্য যদি ইতিমধ্যে মারধোর না চলে। আমি কথা দিচ্ছি, হনিমুনের পর আমি কনফেশান করবো।

অতিকষ্টে মেজাজটাকে সংযত করে রেখে ঠাণ্ডা সাপের মতো শিরশিরে দৃষ্টিতে তাকায় ক্রাউসেন্‌হাইন।

—আলেকজাণ্ডার প্লাট্‌জে তোমার সঙ্গে ফিঁয়াসের দেখা হয়েছিলো, তাই না?

—হ্যাঁ।

—বেশ কিছুক্ষণ তোমরা পরস্পর আলিঙ্গনাবদ্ধ অবস্থায় ছিলে।

—মিথ্যে কথা। আবার মেজাজ হারিয়ে ফেলে ফেডার। বুঝতে পারে, বিয়েটির নাম করে কেটোকেও এই ব্যাপারে জড়ানো।

—আমি কেটোর সঙ্গে কয়েক মুহূর্ত মাত্র ছিলাম। কোনো কথা বলার আগেই মিলিটারী পুলিশ আমায় এ্যারেষ্ট করে।

—আহা বেচারি কেটো; ছোট্ট সুন্দরী মেয়ে। সত্যি তোমার পছন্দের তারিফ করতে হয়। ধরো, যদি বিশেষ সুবিধে হিসেবে কেটোর সঙ্গে তোমাকে সাক্ষাতের সুযোগ দেওয়া হয়, খুশী হবে তো? আর কিছু না হোক, বিয়ে সম্পর্কে কয়েক টুকরো মিষ্টি আলোচনা করতে পারো। তাই না?

ফেডার নিজের কামনাটাকে অতিকষ্টে দমন করে। কেটো এখানে এলে নিশ্চয়ই মনের দিক থেকে দিশেহারা হয়ে যাবে। অল্প সময়ের জন্য হলেও ক্যাম্পের এ বীভৎসতা সহ্য করে নেওয়া কিছুতেই কেটোর পক্ষে সম্ভব নয়।

ওর কোনোরকম মতামতের অপেক্ষা না করে ক্রাউসেন্‌হাইন বলে,—যাইহোক, তুমি জেনে খুশী হবে যে আমরা তোমার জন্যও সবরকম ব্যবস্থা করে রেখেছি। শুধু একটা সর্তে।

—কি সেটা?

—সেই অফিসারের নাম!

—আমার সঙ্গে সেই রকম কোনো অফিসারের যোগাযোগ ছিলো না।

—ঠিক আছে। সাধারণতঃ কোনো বন্দীর ক্ষেত্রেই দর কষাকষি আমরা পছন্দ করি না। কিন্তু তোমার বেলায় তবু আমরা একটা এগ্রিমেণ্টে পৌঁছতে রাজী আছি।

—সত্যি নাকি?

ওর জিজ্ঞাসায় গলার স্বরটা যতটা পারা যায় মোলায়েম করে নিয়ে ক্রাউসেন্‌হাইন বলে,—হ্যাঁ, তোমার ফিঁয়াসে্‌ আপাততঃ ক্যাম্পের মধ্যেই আছে। তোমাকে তার কাছে একটা সর্তে নিয়ে যেতে পারি,—সেটা হলো তার সঙ্গে সাক্ষাতের পর সমস্ত খবর যা আমরা জানতে চেয়েছি, তা' জানাতে হবে।

ফেডারকে আর কোনো কথা বলার সুযোগ না দিয়ে ক্যাম্পের এক পাশের ল্যাবরেটরিতে নিয়ে আসে। 'ডিপ ফ্রিজ্‌' বিল্ডিংটা নজরে পড়তেই বুকটা কেঁপে ওঠে ওর। এখানে কেটো কি করছে?

ওকে ল্যাবরেটরির অন্তপাশে নিয়ে যায়। ছোট্ট একটা ঘর। একটা অপারেশন টেবিল ভেতরে।

ডানপাশে বসা ক্রাউসেন্‌হাইনের দিকে তাকিয়ে ফেডার বলে,—আমাকে এখানে কেন আনা হয়েছে?

—ব্যস্ত হওয়ার কিছু নেই; এক্ষুনি জানতে পারবে। ক্রাউসেন্‌হাইনের নির্বিকার উত্তর।

—আপনি যে বলেছিলেন কেটোকে দেখতে পাবো?

—এতো অধৈর্য হলে চলে কী করে? একটু পরেই সব দেখতে পাবে।

কথাটা কেমন হেঁয়ালির মতো শোনায় ফেডারের কাছে। চেয়ারের হাতল দুটো শক্ত করে ধরে যে-কোনোরকম বীভৎস অভিজ্ঞতার মুখোমুখি হবার জন্য নিজেকে প্রস্তুত করে নেয় ফেডার।

হঠাৎ মাঝের দরজাটা খুলে যায়। গার্ড কেটোকে সঙ্গে নিয়ে ঢোকে। ফেডার ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা করে, ভয়টা যেন সত্যি না হয়! আর যাই হোক, কেটোর ওপর যে কোনো অত্যাচার ওর পক্ষে সহ্য করা সম্ভব নয়।

কেটোকে অপারেশন টেবিলে শোয়ানো হয়। ও একদৃষ্টে তাকিয়ে থাকে। কুখ্যাত দু'জন ডাক্তার ক্র্যাম্‌নিৎস্‌ আর ট্রপ অপারেশন টেবিলের দু'পাশে দাঁড়িয়ে। ক্রাউসেন্‌হাইন মনোযোগ দিয়ে ওর মানসিক অবস্থা পর্যবেক্ষণ করে ফেডারকে বলে,—চিন্তা করো না। তুমি যদি আমাদের সঙ্গে সহযোগিতা করো তবে কেটোর কোনো অনিষ্ট করা হবে না।

সঙ্গে সঙ্গে গর্জে ওঠে ফেডার, —নোংরা শুয়োর কোথাকার, মনে করেছো কেটোর ওপরে অত্যাচার করে আমার মুখ খোলাবে ?

পুরু লেন্সের ফাঁক দিয়ে ফেডারকে দেখে নিয়ে ষ্ট্রপ বলে, —একটু পরে ওকে একটা ইন্‌জেক্‌সান দেওয়া হবে।

—কেন জানতে পারি কি ?

—ওর ফুসফুসের ওপর একটা এক্সপেরিমেণ্ট করা হবে। কয়েকটা পেশী, যেগুলোতে সাধারণতঃ ক্যানসার হয়ে থাকে, সেগুলো যদি সুস্থ অবস্থাতেই কেটে বাদ দেওয়া যায়—তবে ভবিষ্যতে ফুস্‌ফুসে ক্যানসার হবার আর কোনো সম্ভাবনাই থাকবে না। অবশ্য এটা এখনো এক্সপেরিমেণ্ট করে দেখা হয় নি। তা' তোমার প্রেমিকার ওপরেই প্রথম পরীক্ষা নিরীক্ষা শুরু করা হবে।

—শয়তান। সব শয়তানের দল। ফেডার চিৎকার করে উত্তেজনায় চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়ায়। ক্রাউসেন্‌হাইন জোর করে ওকে আবার চেয়ারে বসিয়ে দেয়।

—মাথা গরম করো না সেলেনবার্গ। তুমি যদি জ্ঞানগম্যি রেখে চলো, তবে কেটোর ওপর এক্সপেরিমেণ্ট করা হবে না।

—কোনো অতিথির ওপর এ ধরনের এক্সপেরিমেণ্ট চালানোর কোনো অধিকার আপনাদের নেই ! কেন, গিনিপিগ্‌ পাওয়া যায় না ?

—অতিথি ? ব্যঙ্গ হাসি হাসে ক্রাউসেন্‌হাইন।

—তবে কী ? বন্দী ? ভয়জড়িত স্বরে জিজ্ঞাসা করে ফেডার।

—নিশ্চয়ই। অবশ্য যতোক্ষণ পর্যন্ত তুমি চাও।

ভয়টাকে কিছুটা কাটিয়ে উঠে হাতের তালু দিয়ে মুখ ঢাকে ফেডার।

—কার আদেশে ওকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে ?

ফেডারের জিজ্ঞাসায় ক্রাউসেন্‌হাইন ছোট্ট করে হেসে বলে, —বন্ধু, এখানে তোমার প্রশ্নের উত্তর কেউ দেবে না। বরং তোমাকে সব প্রশ্নের উত্তর দেওয়ার জন্য এখানে আনা হয়েছে। যাই হোক, তোমাকে বলছি, যেদিন সংবাদটা পাচার করার জন্য কেটোর সঙ্গে স্টেশনে দেখা করেছো, ঠিক সেই মুহূর্ত থেকেই ওকে নজরে নজরে রাখা হয়েছে।

—মিথ্যে কথা। আমি ওকে কোনো খবরই দিইনি ! তাছাড়া আমি তো বারবার বলছি, কিছুই জানি না আমি।

—ঠিক আছে। তুমি যখন মুখ খুলবেই না, তখন বাধ্য হয়েই তোমার ফিঁয়াসেকে বিখ্যাত ডাক্তারদের হাতে ছেড়ে দিতে হচ্ছে। তারপর ডাক্তারের

দিকে ফিরে ক্রাউশেন্‌হাইন জিজ্ঞাসা করে,—ডাক্তার, কি এক্সপেরিমেণ্ট করা হবে ওর ওপর ?

ক্র্যম্‌নিৎস বলে,—ওর ফুসফুসটাকে খোলা হবে ; কয়েকটা শিরা কেটে নিয়ে আবার সেলাই করে জুড়ে দেবো। তবে ভুল করে যদি কিছু বেশী শিরা কাটা হয়ে যায়, তখন অবশ্য পুরো ফুসফুসটাই উপড়ে ফেলা ছাড়া গত্যন্তর থাকবে না। একটা ফুসফুস নিয়েও অনেকে অবশ্য বেঁচে থাকে।

—আপনি এসব করবেন ? ফেডার চিৎকার করে ওঠে। কিন্তু আপনি তো রিফ্রেজেটারিং ইঞ্জিনীয়ার ?

মৃদু হেসে ক্র্যম্‌নিৎস বলে,—হ্যাঁ ঠিক বলেছো। মানুষের অনেক প্রতিভাই থাকে।

এই সময় কণ্ট্রোল প্যানেলের পেছনের দরজাটা খুলে একজন মেয়েছেলে ডাক্তার ঢোকে। ডাক্তার হিলডা বর্গ। মেয়েদের জেনেটিকস্‌ নিয়ে পরীক্ষা-নিরীক্ষায় ইতিমধ্যেই কুখ্যাতি অর্জন করেছে যথেষ্ট।

ওকে দেখে ট্রপ বলে,—হিলডা, আমাদের নতুন এক্সপেরিমেণ্ট দেখতে এসেছো ? একটু দাঁড়াও। এক্ষুণি শুরু করবো।

ফেডার ভয়ে ভয়ে লক্ষ্য করে, কেটো সেই জামা-কাপড়েই শুয়ে রয়েছে অপারেশন টেবিলে। অবশ্য এই ছুতোর মিস্ত্রিগুলোর পক্ষে জামাকাপড়সুদ্ধ কাটা কিছু বিচিত্র নয়, ইতিমধ্যে তথাকথিত ডাক্তার তিনজন পরস্পরের মধ্যে আলোচনা শুরু করেছে।

ট্রপ ফেডারকে লক্ষ্য করে বলে,—অপারেশনের আগে তোমার ফ্রিঁয়াসেকে একটা এ্যানাস্‌থেটিক ইন্‌জেক্‌সান দেওয়া হবে। এটার জন্য ওকে রীতিমতো ভাগ্যবতী বলতে পারো। নইলে এসব ক্ষেত্রে সাধারণতঃ আমরা এ্যানাস্‌থেটিক দিইনা। নার্ভের পক্ষে অবশ্য ইন্‌জেক্‌সানটা ভালো নয়। যাকগে। ডাক্তার বর্গ মেডিকেল চেক্‌-আপ করে এই সিদ্ধান্তে এসেছে যে তোমার বান্ধবী ঠিক সেই ব্লাড্‌-গ্রুপেরই যার ওপর আর একটা নতুন ধরনের এক্সপেরিমেণ্ট করা চলে। তাই আমরা আমাদের এক্সপেরিমেণ্ট সাসপেণ্ড করে ডাক্তার বর্গকে তার এক্সপেরিমেণ্ট চালানোর সুযোগ করে দিয়েছি।

ডাক্তার বর্গ ব্যাপারটার বিস্তারে আসে,—আমি এই এক্সপেরিমেণ্ট বাঁদরের ওপরে করেছি। বলতে পারো হানড্রেড পার্সেণ্ট সাক্‌সেসফুল। শুধু এক্সপেরি-মেণ্টের পর বাঁদরটা একটু মোটা হয়ে গেছে, এই যা।

ডাক্তার ট্রপ কথাটা এখানে থামিয়ে দিয়ে বলে,—ডাক্তার বর্গ, ওকে সেই

এক্সপেরিমেণ্টের ফটো দেখালে হয় না ?

ডাক্তার বর্গ হাতের ব্যাগ খুলে একটা ছবি বার করে ওর সামনে ছুঁড়ে দেয়। ছবিটা দেখলে মনে হবে, বাঁদরের একটা শুকনো চামড়ায় খড়কুটো ভরে চারগুণ মোটা করা হয়েছে। কিন্তু মাথাটা স্বাভাবিক ; হাত-পা-গুলো হাতীর মতো মোটা হওয়ায় কিম্ভূতকিমাকার দেখাচ্ছে।

ফেডারের মানস-চক্ষে এক্সপেরিমেণ্টের পরে কেটোর চেহারাটা ভেসে ওঠে। এরচেয়ে বরং আগের এক্সপেরিমেণ্টটাই ভালো ছিলো।

বর্গ খুশীর স্বরেই বলে,—অবশ্য বাঁদরটা গত সপ্তাহে মারা গেছে। তাই ঠিক করেছি, আর বাঁদর-ভোঁদড় নয়। সোজা হিউম্যান গিনিপিগের ওপরেই এক্সপেরিমেণ্ট চালাবো। অবশ্য তোমার প্রেয়সীর একটু ওজনে বাড়া ছাড়া আর কিছু ক্ষতি হবে বলে তো মনে হয় না !

ক্রাউসেন্‌হাইন ডাক্তার বর্গকে থামিয়ে দিয়ে ফেডারকে বলে,—এখনো ভেবে দেখো, ইচ্ছে করলেই তুমি কিন্তু কেটোকে এ সবের হাত থেকে বাঁচাতে পারো।

ফেডার পাশের ঘরে তাকায়। সাদা এ্যাপ্রনে ঢাকা একজন এ্যানাস্‌থিসিষ্ট টেবিল ঘেঁষে দাঁড়িয়ে।

—বলতে হলে, তাড়াতাড়ি বলে ফেলো। আমরা এ্যানাস্‌থিসিস্ নষ্ট করি না। যদি ইন্‌জেক্‌সান একবার দিয়ে দেয়, তবে ডাক্তার বর্গকে অপারেশন করতেই হবে।

তবু ও দ্বিধা করে। এই শূয়োরগুলোকে কিছুতেই বিশ্বাস নেই। হয়তো ও সব বললেও, শুনে নিয়ে তবে কেটোর ওপর এক্সপেরিমেণ্ট চালাবে।

আবার না বললে, সারাটা জীবন বেঁচে থাকলেও অনুশোচনায় ভুগতে হবে। কেটোর ওপর অত্যাচারটা দ্বিগুণ হয়ে তুষের আগুনের মতো ওকে জ্বালাবে।

ডাক্তার বর্গ দরজার দিকে কিছুটা এগিয়ে গিয়ে বলে,—তা'হলে আমি কিন্তু শুরু করছি ?

—স্টপ ! চিৎকার করে ওঠে ফেডার। সব বলছি, যা আমি জানি।

—এই তো দেখছি পথে এসেছো ! ক্রাউসেন্‌হাইন হাসে।

—কিন্তু তার আগে কেটোকে মুক্তি দিতে হবে !

ক্রাউসেন্‌হাইন প্রথমে একটু দ্বিধা করে। তারপর ডাক্তার বর্গের দিকে তাকিয়ে বলে,—স্যরি ডক্টর, আপনাকে আর একটা হিউম্যান গিনিপিগ্ খুঁজে নিতে হবে।

ডাক্তার বর্গ ঘর ছেড়ে চলে যেতে দু'জন গার্ড কেটোকে অপারেশন টেবিলের বাঁধন খুলে নিয়ে যায়।

ফেডার ক্রাউসেন্‌হাইনের মুখের দিকে তাকায়।

—আমাকে পাঁচ মিনিটের জন্য কেটোর সঙ্গে কথা বলতে দেবেন ?

—নিশ্চয়ই। তার আগে আমরা যা জানতে চাই, সেই খবরগুলো দিয়ে দাও, তারপর।

ওকে ক্রাউসেন্‌হাইনের অফিসে এনে সামনের বেঞ্চে বসতে দেয়। একটু পরে ইনট্রোগেটার আসে।

—আচ্ছা এবার বলো, তোমার কমাণ্ডার একটা গোপন মেসেজ মুখে মুখে দিয়েছিলো ; স্বীকার করো ?

—হ্যাঁ।

—বার্লিনের কোন ঠিকানায় মেসেজটা দিয়েছিল ?

—নির্দিষ্ট কোনো ঠিকানায় আমাকে পাঠানো হয়নি। টিয়ারগার্টেনের একটা বিশেষ জায়গায় দেখা করতে বলেছিলো।

—তাই নাকি ? টিয়ারগার্টেনের ভেতব ঠিক কোন জায়গায় ?

—টিয়ারগার্টেনে ঢুকে বেগুলার ষ্ট্রাসে আর টিয়ারগার্টেন ষ্ট্রাসের ঠিক মোড়ে এসে সার্লোটিন বুর্গার স্যাসের দিকে এগোতে হবে। পার্কল্যাণ্ড পার হয়ে লেকের দিকে। লেকের দিকের তৃতীয় বেঞ্চে বসে আমাকে তাকিয়ে থাকতে হবে স্প্রী নদীর দিকে।

—কিন্তু তোমাকে চিনবে কী করে ?

—সেইজন্য এককপি 'মাইন ক্যাম্প' সঙ্গে নিতে বলা হয়েছিলো। বইটা আমার পাশে এমনভাবে থাকবে যাতে প্রচ্ছদপটটা স্পষ্ট দেখা যায়। যতোক্ষণ নির্দিষ্ট ব্যক্তি না আসে, সেইভাবেই আমাকে বসে থাকতে হবে।

—তোমাকে কি কোনো নিশানা স্থির করে দেওয়া হয়েছিলো ?

—হ্যাঁ। কেউ এসে পাশে বসলে বইটা তুলে নিয়ে পড়তে শুরু করতে হবে। বইটা নিয়ে আলোচনা শুরু হবে প্রথমে।

—কি বলে শুরু করবে ?

—ওঃ, তা'হলে আপনি 'মাইন ক্যাম্প' পড়েছেন ? বইটা কেমন ?
তার উত্তরে আমায় বলতে হবে, বার্লিনবাসীদের পক্ষে বইটা ভালোই।

ফেডার এবার চুপ করে। জিজ্ঞাসিত না হলে নিজের থেকে আর বেশী কিছু বলায় প্রবৃত্তি নেই।

কয়েকমুহূর্ত থেমে নিয়ে ক্রাউসেন্‌হাইন নরম গলায় জিজ্ঞাসা করে,—মেসেজটা কি ছিলো ?

ফেডারের চোখের সামনে অপারেশন টেবিলের ওপর বাঁধা কেটোর ছটফটানি দৃশ্যটা ভেসে ওঠে।

নিজেকে সংযত করে নিয়ে ফেডার উত্তর দেয়,—মেসেজটা হলো, রক্তপাত-শূন্য সমাধান, কোনো বড়ো রাজনৈতিক সমস্যার সমাধান হতে পারে না।

—তাই নাকি ? ক্রাউসেন্‌হাইন দাঁড়িয়ে টেপ্‌ রেকর্ডারটা বন্ধ করে দেয়।

দীর্ঘ সময়ের জন্য একটা নীরবতা। ক্রাউসেন্‌হাইনের বুঝতে অসুবিধে হয় না। মেসেজটার সোজাসুজি অর্থ হলো, হিটলারের আবার প্রাণনাশের চেষ্টা। গেষ্টাপোরাও প্রায় ওইরকম শ্লোগানে বিশ্বাসী। ইহুদী সমস্যার সমাধান একমাত্র ইহুদী জাতটাকে বিলুপ্ত করাই সম্ভব।

বর্তমান রাজনীতির সবচেয়ে বড়ো সমস্যা হলো হিটলার। আর ক্রাউসেন্‌হাইনের সামনে বসে থাকা লোকটা, এমন একটা অর্গানাইজেশনের মেম্বার, যাদের একমাত্র উদ্দেশ্য হলো, রাজনৈতিক আকাশ থেকে সেই হিটলারকে চিরতরে মুছে দেওয়া।

ক্রাউসেন্‌হাইন জিজ্ঞাসা করে,—যাকে মেসেজ দিয়েছিলে, সে কে ?

—আমি জানি না। আগে কখনো দেখি নি।

—কিন্তু স্বীকার করো যে কর্ণেল সোয়াজ্‌ৎ তোমাকে মেসেজটা দিয়েছিলো ?

—ঠিক কে দিয়েছিলো তা' আমি জানি না।

—তবে মেসেজটা তো তুমি তার কাছ থেকেই পেয়েছিলে ?

—হ্যাঁ। এবং সাদা মনেই কাজটার ভার নিয়েছিলাম। কিন্তু ক্রিসাউ সার্কেলের সম্পর্কে আমার কিছু জানা নেই। আমি শুধু মেসেজটার বাহক। আমার মনে হয় কর্ণেল সোয়াজ্‌ৎও তাই।

—সেও কিছু জানতো না ? ক্রাউসেন্‌হাইন সন্দেহের দৃষ্টিতে ওর দিকে তাকায়।

—আমার তো তাই মনে হয়।

—আবার চালাকি করার চেষ্টা করছো? চালাকি করে আগে কিছু লাভ হয় নি, এখনো হবে না।

—আমার লিভ পাসের সঙ্গে কাগজের চিরকুটটা পিন দিয়ে আঁটা ছিলো।

—চিরকুটটা কি করলে?

—পুড়িয়ে ফেলেছি।

ক্রাউসেন্‌হাইনের পরের জিজ্ঞাসায় মনের মধ্যে সজোরে ধাক্কা খায় ফেডার।

—ক'জন এস্. এস্. এই ষড়যন্ত্রের সঙ্গে জড়িত?

ফেডার বিভ্রান্ত বোধ করে। এটাও কি একটা নাৎসী ফাঁদ? ক্রাউসেন্‌হাইন ভালো করেই জানে, এসব ব্যাপার ওর জানার কথা নয়।

অনেক সময় গেষ্টোপারা সবকিছু স্বীকারোক্তির পরেও এমন সব প্রশ্ন ছোঁড়ে, যার উত্তর দেওয়া অসম্ভব। আর এই চালাকিতেই সব কিছু স্বীকার করার পরও এরা বন্দীদের আটকে রাখে। অবশ্য এটাও সত্যি, নাৎসীরা নিজেদের ভেতরের লোককেও সন্দেহ কম করে না। নইলে ওকে অথবা কর্ণেল সোয়াজ্‌ৎকেই বা আটকাবে কেন?

অনেকেই জানে, অতি উচ্চপদস্থ আর্মি অফিসার পর্যন্ত এ ষড়যন্ত্রে লিপ্ত। যদিও কাউকে এখনো পর্যন্ত গ্রেপ্তার করা হয়নি। এর পেছনের একমাত্র কারণ হতে পারে হিমলার। ওর মতো নীচু আর সংকীর্ণ মনের লোক দুটো হয় না। হিমলার অবচেতন মনে বিশ্বাস করে, হিটলার সরে গেলে মিত্রশক্তি ওকেই সেই সিংহাসনে বসাবে।

—এস্. এস্. বাহিনীর কে কে এই ষড়যন্ত্রে লিপ্ত তা' আমার জানা নেই।

—নিশ্চয়ই জানো তুমি! শান্ত অথচ দৃঢ় গলায় ক্রাউসেন্‌হাইন বলে। যার কাছে তুমি মেসেজ দিয়েছিলে, তার নাম কী?

—আমি তো আপনাকে আগেই বলেছি, তাকে আমি চিনি না।

—আচ্ছা, এখনকার মতো এ পর্ব বন্ধ থাক।

—কিন্তু আপনি যে কথা দিয়েছিলেন?

—কথা? কিসের কথা দিয়েছিলাম? ক্রাউসেন্‌হাইন অবাক হওয়ার ভান করে।

—আপনি বলেছিলেন, যা জানি বললে পরে কেটোর সঙ্গে কথা বলতে পারবো।

—কেটোকে অপারেশন থেকে রেহাই দেওয়া হয়েছে, এটাই যথেষ্ট নয় কি?

ওকে আবার ল্যাবরেটরিতে নিয়ে এলে ডাক্তার ট্রুপ ওর ক্ষত জায়গাগুলো পরীক্ষা করে দৈনন্দিন কাজের উপযুক্ত বলে ব্যারাকে ফেরত পাঠায়।

মনের ভেতরকার উদ্বিগ্নতাটা পুরো কাটে না। কেটোর কি হলো? তবু অন্যান্য বন্দীদের সংস্পর্শে এসে মনের গোপন ইচ্ছেটা আবার মাথা চাড়া দিয়ে ওঠে। যেমন করেই হোক, বিদ্রোহ করতেই হবে।

এবারে ফেডারের ঠাঁই হয় বিরাট একটা ব্যারাকঘরে। প্রায় জনা তিরিশেকের জন্য ব্যারাক-ঘরটা তৈরী হলেও শ'খানেক বন্দীকে ঢুকিয়েছে। থ্রি-টায়ার বেড। এতোটুকু নড়াচড়া করার উপায় নেই।

প্রত্যেকের জন্য একটা করে কম্বল। তা'ও নোংরা। রক্তের ছোপ ছোপ দাগ লাগা। তবু একেবারে ওপরের বাংকটা পাওয়ায় বাঁচোয়া। দেওয়াল এবং মেঝে কতোদিন যে পরিষ্কার করা হয় নি, কে জানে? পুরু ধুলোর স্তর জমে আছে। তবু এ ব্যারাক-ঘরটা বন্দীদের সর্দারদের জন্য। সাধারণতঃ বন্দীদের ভেতর থেকেই একজন সর্দার বাছা হয়। সর্দার হিসেবে সাধারণ বন্দীদের তুলনায় পরিমাণে কিছুটা বেশী রেশন মেলে। কিন্তু ক্যাম্পের সবচেয়ে নোংরা কাজ করতে হয় এই সর্দারদের। তবু ওর কাজটা মোটামুটি অপছন্দের হয় নি। সর্দার হিসেবে গ্যাস-চেম্বার আব চুল্লীগুলোকে সামনে থেকে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখা যাবে। বোঝা যাবে, প্রয়োজনে এগুলোকে ধ্বংস করা সম্ভব কিনা!

সর্দারদের প্রধান কাজ হলো গ্যাস চেম্বারে নিহত মৃতদেহগুলোকে দাহ করার জন্য চুল্লীতে বয়ে নিয়ে যাওয়া। স্বাভাবিকভাবে কাজের ধারাটাই এদের নিষ্ঠুর করে তোলে। এমন কি এসব সর্দাররা নিষ্ঠুরতায় গার্ডদের তুলনায় কিছু কম না। বরং বেশী।

পরের দিন কুড়িজনের একটা দল নিয়ে ওকে প্রথম কাজ করতে দেয় ক্রিমেটেরিয়ার কাছে নর্দমা কাটার। হাঁটু পর্যন্ত বরফের মতো ঠাণ্ডা জল; প্যাচপেচে কাদা আর দুর্গন্ধময় আবর্জনা। এগুলোকে নর্দমার সাহায্যে কিছুটা দূরের বড়ো বড়ো চৌবাচ্চায় জড়ো করা হয়। প্রাগৈতিহাসিক যুগের নর্দমা ব্যবস্থা। সেই চৌবাচ্চা থেকে এগুলোকে বহন করে নিয়ে যায় জমিতে সার হিসেবে ব্যবহারের জন্য। বিশ্রী ধরনের কাজ। একে তো নর্দমা কেটে ময়লা ঠেলায় গায়ে গতরের পরিশ্রম কম নয়; তার ওপর দুর্গন্ধ! শরীর যেন বইতে চায় না। সন্ধ্যের পর সেই অবস্থাতেই ব্যারাক-ঘরে ফিরে আসতে হয়। হাত-পা ধোয়ার সুযোগ পর্যন্ত দেয় না। স্নান করা তো দূর অস্ত্।

ব্যারাক-ঘরে ফিরে এসে কারোর সঙ্গে গল্পগুজব করতে পারলে তবু মনের দিক থেকে একটু হালকা হতে পারতো। কিন্তু ব্যারাকে ফেরার পর কারোর আর কথা বলার শক্তিটুকু পর্যন্ত থাকে না। কোনোরকমে দরজায় তালা পড়ার অপেক্ষা। ধুপধাপ যে যার বাংকের ওপরের বিছানায়। ঘুম যতোক্ষণ না আসে, কড়ি-কাঠের দিকে চুপচাপ তাকিয়ে থাকা। তারপরেই কয়েক ঘণ্টার জন্য নিরবিচ্ছিন্ন বিশ্রাম। নিজের ভেতরে একটা হতাশা অনুভব করে ফেডার। আউস্‌ভিৎজ্‌ ক্যাম্পে পৌঁছে ও ভেবেছিলো, মনুষ্যত্ব-সিঁড়ির একেবারে নীচের ধাপে ও এসে দাঁড়িয়েছে; কিন্তু এখন মনে হয় এই সিঁড়ির কোনো শেষ নেই। একমাত্র একটু আলোর শিখা, পরিকল্পনাকে কোনোরকমে যদি বাস্তবে রূপ দিতে পারে। তবে দীর্ঘদিন এ কাজ করতে হলে, বেঁচে থাকাটাই সম্ভব নয়। একে তো দুর্গন্ধ, তায় শারীরিক পরিশ্রম।

দিন যায়, আয়ুরেখাটা এখনও নামে নি। হাজার বন্দীদের ভেতরে কংকালসার হয়েও বেঁচে রয়েছে ফেডার।

এর মধ্যে আর ওকে ডেকে পাঠায় নি বা ইন্‌ট্রোগেসানের মুখোমুখি হতে হয় নি। কেটোর কোনো সংবাদ পায় নি; মরে গেছে কি বেঁচে আছে, কে জানে? নাকি, সত্যি সত্যি ওর ওপরে এক্সপেরিমেণ্ট চালানো হয়েছে? এই দিনগুলোতে বিদ্রোহের পরিকল্পনার সঙ্গে সঙ্গে আরেকটা ইচ্ছা প্রবল হয়ে ওঠে, – ক্রাউসেন্‌হাইনকে যেনতেন প্রকারে হত্যা করা।

শেষে ওকে ক্রিমেটেরিয়াতে কাজের জন্য পাঠানো হয়। গ্যাস-চেম্বারে যাদের হত্যা করে, তাদের ডেড্‌বডি ঠেলাগাড়ীতে চাপিয়ে চুল্লীতে নিয়ে আসাই হলো কাজ। সাধারণতঃ এস্‌. এস্‌. গার্ডরা এ কাজ করতে চায় না বলে বন্দীদের দিয়ে এ কাজ করানো হয়। তবে বেশীর ভাগ গার্ড-ই পকেটে একটা সাঁড়াশি নিয়ে ঘোরে। কোনো মৃতদেহের মুখের ভেতরে সোনা বাঁধানো দাঁত দেখতে পেলেই হলো। তুলে পকেটের পাউচে রেখে দেবে। ফেডারের এক এক সময় মনে হয়, সেদিন কবে আসবে যেদিন এই পশুগুলোকে চুল্লীর আগুনে ঠেলে দিতে পারবে?

চুল্লীগুলোকে ধ্বংস করাটাও খুব সহজ নয়; প্রায় অসম্ভবই বলা চলে। একে তো নিরেট ইস্পাতে তৈরী, তায় চব্বিশ ঘণ্টা কড়া পাহারায় জ্বলছে। এগুলোকে ধ্বংস করতে যে ধরনের মারাত্মক বিস্ফোরক দরকার, তা জোগাড় করা খুব একটা সহজ কাজ নয়। বেশ কয়েকটা মৃতদেহের ভেতরে যদি উচ্চ-ক্ষমতাসম্পন্ন বিস্ফোরক ঢুকিয়ে দিয়ে চুল্লীর মধ্যে ছুঁড়ে দেওয়া যায়, তবে হয়তো

বা এগুলোকে ধ্বংস করা যাবে। একমাত্র অস্ত্রাগার লুণ্ঠন করতে পারলেই ডিনামাইট জোগাড় করা যায়। কিন্তু অস্ত্রাগারের পাহারা এতো সতর্ক যে, কোনো বন্দীর পক্ষেই ধারে কাছে ঘেঁষা অসম্ভব। তার মানে যদি বিদ্রোহ করতে হয়, তবে প্রথমেই অস্ত্রাগার লুণ্ঠন করা দরকার।

শেষ পর্যন্ত, বেছেটেছে দু-একজনকে পায়। একজন হলো কুট, ওর বাংকের নীচে তার শোওয়ার জায়গা। বয়েসে প্রায় ফেডারের কাছাকাছি। আর একজন হলো লাব্‌বথ্‌। বয়েস বছর চল্লিশ হলেও টাক পড়া মাথা আর সারাটা মুখে বলিরেখার জন্য বছর ষাটেক বলে মনে হয়।

তিনজনের পরামর্শ সভায় প্রথম মুখ খোলে কুট,—কিন্তু অস্ত্রাগারে ঢুকবো কি করে?

—যদি একটা এস্. এস্. গার্ডকে খুন করে তার ইউনিফর্ম আমরা চুরি করি, তবে? ফেডার প্রস্তাব রাখে।

ওর কথায় লাব্‌বথ্‌ বলে,—তা' না হয় হলো। কিন্তু ও ইউনিফর্ম আমরা কেউ পরলেই তো ধরা পড়ে যাবো। আমাদের হাড়ের ওপর মাংস বলতে তো কিছু নেই। বস্তার মতো দেখাবে না?

লাব্‌বথের কথায় সবাই একমত হয়। কথাটা ভাববার মতো। এবং সত্যি বলতে কি, গায়ে যদি ইউনিফর্ম ঠিক মতো ফিট না করে, তবে যে-কোনো মুহূর্তে ধরা পড়ে যাওয়ার সম্ভাবনা। তবে? ইতিমধ্যে অনেকের সঙ্গেই বিদ্রোহের পরিকল্পনাটা নিয়ে আলোচনা করেছে ফেডার; খুব একটা বেশী সাড়া পায়নি। আসলে বেশীর ভাগ বন্দীই মেরুদণ্ডহীন। ফেডার বুঝতে পারে না, আজ না হয় কাল—মরতে সবাইকেই হবে; তবু যে ক'টা দিন বেশী বেঁচে থাকা যায়, সেটাকেই বেশীর ভাগ বন্দী আঁকড়ে ধরে আছে। হয়তো বা এর পেছনে বেঁচে যাওয়ার ক্ষীণ একটা আশাও কাজ করছে। অবশ্য সব শুনে-টুনে সবারই প্রায় নিস্পৃহ উত্তর,—কী হবে এসব করে? বিদ্রোহ তো ভেস্তে যাবেই; শেষ পর্যন্ত অত্যাচার হবে আমাদের ওপর।

তবু তারই মধ্যে বেছেটেছে কয়েকজনকে নির্বাচিত করে ফেডার। যাদের মনে মুক্তির স্বাদ পাওয়ার জন্য বুকের রক্ত অহরহ টগবগ করে ফুটছে।

বিশেষ করে একজন বৃদ্ধকে অত্যন্ত নিকটে পায় ফেডার। বৃদ্ধ ইহুদী, রবি রোজেনবার্গ। ভারসাউ ঘেটো থেকে আউস্‌ভিৎজে ওকে নিয়ে আসা হয়েছে। নেহাৎ-ই কপাল জোরে গ্যাস চেম্বারের পাশ কাটিয়ে শ্রমিক হিসেবে বেঁচে আছে বৃদ্ধটি।

একদিন কথা প্রসঙ্গে জিজ্ঞাসা করে ফেডার, —বলতে পারো রোজেনবার্গ, যেখানে জীবনের কোনো মূল্য নেই, তবু এতোদিনে সেই আউস্‌ভিৎজে কোনো বিদ্রোহের চেষ্টা হয় নি কেন?

লম্বা দাড়ি আর ভ্রূব চুলগুলোয় প্রায় ঢাকা-পড়া ছোট ছোট চোখ দিয়ে বৃদ্ধ রোজেনবার্গ কিছুক্ষণ একদৃষ্টে ওর দিকে তাকিয়ে থাকে, তারপরে বলে, —ব্যাপারটা বুঝতে হলে তোমাকে একটু পেছনের দিকে যেতে হবে বন্ধু। ক্যাম্পে বেশীর ভাগই ইহুদী; জার্মানি, পোল্যাণ্ডের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে ধরে নিয়ে আসা। বেশীর ভাগই নিরীহ নাগরিক; স্ত্রী, পুত্র আর চাকরী অথবা ব্যবসা ছাড়া বাইরের কিছু কোনোদিন চিন্তা ভাবনাতেও আনে নি। তাদের এই আশ্বাসে ট্রেনে গাদা করা হয়েছে, যে আউস্‌ভিৎজ্‌ ট্রানজিট ক্যাম্প। অবশ্যই ভবনদীর ওপারে যাত্রার জন্য নয়। এখানে কয়েকটা দিন কাটিয়ে ট্রেড হিসেবে পুনর্বসতি পাবে। কিন্তু ক্যাম্পে ঢোকার প্রথম দিনই যাদের গ্যাস-চেম্বারের দরজায় লাইন দিয়ে দাঁড়াতে হয়েছে, তারা তো ব্যাপারটা ঠিক শেষ মুহূর্তের আগে পর্যন্ত বুঝে উঠতে পারে নি। বাকী যারা, আপন আপন প্রাণ বাঁচাতেই ব্যস্ত। অন্যকিছু ভাবার সুযোগ তাদের কোথায় বলো? আর ক্যাম্পে ঢোকার প্রথম দিনেই ব্যক্তিত্ব বলতে সবকিছু কেড়ে নেয়। যার জন্য লক্ষ্য করেছো, খোলা জায়গায় সবার সামনে স্ত্রী-পুরুষ নির্বিশেষে সবাইকে দিনের পর দিন উলঙ্গ রাখে। যাতে কারোর ভেতর যদি বিন্দুমাত্র ব্যক্তিত্বও অবশিষ্ট থাকে, সেটুকুও নিঙড়ে নেয়। সুতরাং এই অবস্থায় বিদ্রোহ করার জন্য যে মানসিক শক্তি দরকার, তা' কারোরই থাকার কথা নয়। তাই বিদ্রোহের প্রস্তুতিটা করবে কে?

কথাটা সত্যি ভেবে দেখার মতো। পুরো জিনিষটাকে ঠিক এ দৃষ্টিকোণ থেকে এর আগে দেখে নি ফেডার। মানুষগুলোকে পশুত্বের স্তরে নামিয়ে দিতে

পারলেই অর্ধেক উদ্দেশ্য এদের সফল।

সেই কারণেই বোধহয়, কালকের মুক্তির চেয়ে আজকের বেঁচে থাকাটাই বন্দীরা সত্য বলে মেনে নিয়েছে। কে বলতে পারে, বিদ্রোহ সফল হবে কিনা? না হলে?

—তবু এদের পুরো ব্যাপারটা বুঝিয়ে-সুঝিয়ে যদি রাজী কবানো যায়। ফেডার বলে।

রোজেনবার্গ একটুখানি চিন্তা করে নিয়ে উত্তর দেয়,—দেখ বুঝিয়ে-সুঝিয়ে এই অবস্থায় কিছু হবে না। একমাত্র যদি বিদ্রোহের আদেশ দেওয়া যায়।

—আদেশ? বিদ্রোহ করার? অবাক লাগে ফেডারের।

—হ্যাঁ, হ্যাঁ আদেশ। সোজা অর্ডার। এবং সেটা একমাত্র সম্ভব প্রত্যেক ব্লকের যে দলপতি আছে তাদের মাধ্যমে। ধরো, তুমি যদি আমাদের ব্লক-দলপতি যোসেফ শ্লাইবেলকে বুঝিয়ে রাজী করাতে পারো, তবে শ্লাইবেলই বাকী ব্লক-দলপতিদের বুঝিয়ে-সুঝিয়ে দলে টানবে।

—কিন্তু ব্লক-দলপতিরা কি রাজী হবে? ওদের অবস্থা তো আমাদের তুলনায় অনেক ভালো। ফেডারের গলায় সংশয়।

—হবেই যে এমন কথা আমি বলি না। তবে ওদের ছাড়া বিদ্রোহ করা সম্ভব নয়। রোজেনবার্গ বলে।

ওদের ব্লক-দলপতি হলো শ্লাইবেল। জাতে পোলিশ। লোকটা স্বভাব-চরিত্রে পশুকে হার মানায়। এদের অফিসিয়াল নাম হলো কাপো। অর্থাৎ হেড অফ কমাণ্ডো ব্লক। এই কাপোদের প্রধান কাজ হলো বন্দীদের নির্যাতন করা। নিষ্ঠুরতায় এরা এস্. এস্. গার্ডদেরও হার মানায়। আর ক্যাম্পের সব খবর গার্ডদের জানাতে না পারলে এদের নিজেদেরই গ্যাস চেম্বারে গিয়ে ঢুকতে হয়। ফেডার ভেবে পায় না, বন্দী হয়েও এরা অন্যান্য বন্দীদের ওপর এতো নিষ্ঠুর নির্যাতন চালায় কি করে? কাপোদের ক্ষমতাও অসীম। ওদের কথা হলো ক্যাম্পের আইন। মানুষের শয়তানি দিকটাকে উসকে দেবার জন্যই বন্দীদের মধ্যে থেকে নাজীরা এই কাপোদের সৃষ্টি করেছে।

বিশেষ করে ফেডার শ্লাইবেলকে দলে টানতে চায় না। প্রথমতঃ নিষ্ঠুরতায় লোকটা যে কোনো হিংস্র পশুকেও লজ্জা দেবে। দ্বিতীয়তঃ ফেডারের সঙ্গে ওর সম্পর্কটাও খুব ভালো নয়। বরং তিক্তই বলা চলে। তাই শ্লাইবেলকে খুলে বললে সাহায্য তো দূরের কথা, পুরো ব্যাপারটাকে গোপন রাখবে কিনা, এ বিষয়েই যথেষ্ট সন্দেহ ওর আছে।

শ্লাইবেলের খুন করার নিজস্ব একটা পদ্ধতি আছে। যাকে খুন করবে তাকে দেওয়ালের কাছে দাঁড করিয়ে চোয়ালে জোরে ঘুষি মারে যাতে লোকটার মাথার খুলি দেওয়ালে ধাক্কা খেয়ে চৌচির হয়ে যায়। প্রতি সপ্তাহে এই পদ্ধতিতে একটা করে খুন করা শ্লাইবেলের রুটিন বাঁধা।

ঘটনাটা ঘটলো ফেডার এই ব্লকে আসার তৃতীয় দিনে। রোগা লোকটা কাজ করতে করতে প্রায় ক্ষয়ে এসেছে। ওই লোকটার ওপরেই আদেশ হলো দেওয়ালের কাছে গিয়ে দাঁড়াতে। দোষ? শ্লাইবেলের বুট পরিষ্কার করা সত্ত্বেও নাকি তা'তে কাদা লেগে। কিন্তু ফেডারের নজর এড়ায়নি, লোকটা প্রায় ঘণ্টাখানেক সময় ধরে কাঠের টুকরো দিয়ে কাদা খুঁচিয়ে বার করেছে। শেষে নিজের ছিন্ন ট্রাউজারের কোণা দিয়ে জুতো দুটোকে মুছেছে। তারপর ধীরে ধীরে মেজাজে শুয়ে-থাকা শ্লাইবেলের কাছে এগিয়ে গিয়ে ভয়ে ভয়ে বলেছে,—কাপো শ্লাইবেল, আপনার জুতো!

একটা জুতোকে তুলে নিয়ে ঘুরিয়ে ফিরিয়ে দেখে নিয়ে হঠাৎ শ্লাইবেল সজোরে লোকটার মাথায় জুতোটা দিয়ে মারে। এতো জোরে যে লোকটা তাল সামলাতে না পেরে মেঝেতে হুমড়ি খেয়ে পড়ে। তারপর উঠে জুতো দুটোকে তুলে নিয়ে আবার ঘরের কোণে গিয়ে পরিষ্কার করতে বসে। থুথু দিয়ে ভিজিয়ে, নিজের পরনের ট্রাউজার দিয়ে আরো প্রায় ঘণ্টাখানেক জুতো দুটোকে পালিশ করে নিয়ে আসে। জুতো জোড়াকে রাখতে দেখে শ্লাইবেল চিৎকার করে ওঠে,—ফরাসী শূয়োর, কাজে মন বসে না, তাই না? দাঁড়া গিয়ে দেওয়ালের দিকে মুখ করে। •

ছোটখাটো লোকটা ভাগ্যে কি আছে জেনেও বাধ্য ছেলের মতো গজখানেক দূরে দেওয়ালের দিকে মুখ করে দাঁড়ায়।

—আরো কাছে! গর্জে ওঠে শ্লাইবেল।

যখন লোকটার মাথা দেওয়ালের মাত্র কয়েক ইঞ্চি দূরে, সজোরে চোয়ালে ঘুষি মারে শ্লাইবেল। খুলি ফাটার একটা ভয়ংকর শব্দ; তারপরেই কাটা কলাগাছের মতো লোকটার দেহ মেঝেতে খসে পড়ে।

শ্লাইবেল এবার ঘুরে তাকায় যারা দেখছিলো, তাদের দিকে। তারপর ফেডারকে নজরে পড়তে আদেশ করে,—শূয়োরের মৃতদেহটা চুল্লীতে ছুঁড়ে দিয়ে এসো।

ফেডার এগিয়ে এসে মৃতদেহটা কাঁধে তুলে নিয়ে কিছুটা দূরে চুল্লীর কাছে

মৃতদেহের স্তূপের ওপর রেখে ব্যারাক-ঘরে ফিরে আসে। ও ফিরে আসতে শ্লাইবেল এগিয়ে এসে কর্কশ গলায় জিজ্ঞাসা করে,—ডেড বডিটা চুল্লীতে ছুঁড়ে দিয়ে এসেছো তো ?

—হ্যাঁ। সংক্ষিপ্ত উত্তর দেয় ফেডার।

—এটা তোমার পক্ষে একটা ভালো শিক্ষা। মনে থাকে যেন। শ্লাইবেলের ব্যঙ্গ স্বর।

—আমার ? আমার আবার এ শিক্ষার কী দরকার পড়লো ?

ফেডারের কথার ভঙ্গিতে শ্লাইবেল ওর দিকে তাকায়।

—হ্যাঁ, এটাকে ওয়ারনিং বলে ধরে নিতে পারো। আমার কথাবার্তা না শুনলে তোমার ভাগ্যও ফরাসী শূয়োরটার মতো হবে, বুঝলে ? এস্. এস্. গার্ডের নকলী এই শ্লাইবেলের কথাকে বিন্দুমাত্র পরোয়া না করে ফেডার তীক্ষ্ণ গলাতেই উত্তর দেয়,—আমাকে এসব শিক্ষা দেওয়াব চেষ্টা না করলেই ভালো করবে। বরং আর কাউকে দাও। আমার সঙ্গে লাগতে এলে তোমার মাথার খুলি চৌচির হয়ে মেঝেতে পড়ে থাকবে।

কথাটা শেষ করে ফেডার আর দাঁড়ায় না। দৃপ্ত ভঙ্গীতে বিছানায় গিয়ে শুয়ে পড়ে।

শ্লাইবেল একজায়গায় দাঁড়িয়ে কয়েকটা মুহূর্ত তাকিয়ে থাকে ওর দিকে। কোনো বন্দী ওব মুখের ওপর এ ধরনেব উত্তর দিতে পারে, ভাবতেই পারে না শ্লাইবেল। অবশ্য এরা সাধাবণতঃ মনের দিক থেকে দুর্বল হয় বলে, শক্ত লোকদের এড়িয়ে চলে। তাই মনে মনে ঠিক করে, সুযোগের প্রথমেই ফেডারকে সরিয়ে ফেলতে হবে। কয়েকটা দিনেব তো ব্যাপার। কিছু দিনের অনাহারেই ফেডারের গায়ের জোর যখন কমে যাবে, তখন মোকাবেলা করে কথাগুলোর শোধ নিতেই হবে।

পরের তিন সপ্তাহ ফেডারকে জ্বালাতন না করলেও ফেডার বোঝে, শ্লাইবেল সুযোগ পেলেই ওর ওপর হিংস্র শ্বাপদের মতো ঝাঁপিয়ে পড়বে। শুধু সুযোগের অপেক্ষা! ওকে বাগে না পেয়ে, ওব বন্ধু দু'জন কুট আর লাব্‌বখ্‌কে দেহের দিকে দুর্বল বলে বেছে নেয় শ্লাইবেল।

একদিন রাতে লাইট নেভার আগে শ্লাইবেল কুটকে ডাকে। কুট ওর বিছানার ধারে এগিয়ে যেতেই শ্লাইবেল বলে,—রোজ রোজ তুমি কাজ কমিয়ে দিচ্ছো। যাইহোক, তোমার কাজে আমি খুশী নই।

—দুঃখিত কাপো শ্লাইবেল; বিনয়ের সঙ্গেই উত্তর দেয় কুট।

একটু ঝুঁকে নিয়ে বিছানার নীচ থেকে কয়েকগজ লম্বা একটা দড়ি বার করে শ্লাইবেল। ওর সামনে দড়িটার একটা প্রান্ত ছুঁড়ে দিয়ে বলে,—আরেকবার যদি তোমাকে কাজের কথা বলে দিতে হয়, তবে এ দড়িটাও তোমাকে নিতে হবে। আর তারপর? তুমি তো নিজেই জানো। নিজের হাতে কড়িকাঠ থেকে গলায় বেঁধে ঝুলতে হবে। মনে থাকে যেন। যাও।

কুট বিছানায় ফিরে এলে ফেডারের নজর এড়ায় না। ভয়ে ওর সারা মুখ ঘেমে উঠেছে।

ব্যারাক-ঘরের সবাই জানে কুটের ভাগ্যে কী আছে। আজ না হয় কাল। কিন্তু নিজেব হাতে দড়িতে ওকে ঝুলতেই হবে। কাপো শ্লাইবেলের নজর যখন পড়েছে ওর দিকে, তখন রেহাই নেই।

ফেডার শুয়ে শুয়ে ভাবে। বন্দীরা কাপোকে গেষ্টোপাদের চেয়েও বেশী ভয় করে। মোটামুটি সমস্ত বন্দীদের তিনটে ভাগে ভাগ করা যায়। এক, যাদের ক্যাম্পে ঢোকার সঙ্গে সঙ্গে গ্যাস-চেম্বারে গিয়ে লাইন দিয়ে দাঁড়াতে হয়; দুই, আমৃত্যু শ্রমিক শিবিবে যাদের কাটাতে হয়; তিন, গেষ্টোপাদের দয়ায় যারা ক'টা বছর কাপোদের কাজ করে বেঁচে থাকে।

তৃতীয় দলটাই ভয়ংকর। আর একমাত্র চরম নিষ্ঠুরেরাই কাপোদের কাজ করতে পারে।

সুতরাং বিদ্রোহের প্রথমেই শ্লাইবেলকে সরাতে হবে। নইলে ষড়যন্ত্রের গোপনীয়তা রক্ষা করাই কঠিন। এবং বিদ্রোহের জন্য দ্বিতীয় দলটার থেকেই সহকর্মী বাছতে হবে; যাদের মনটা এখনো পর্যন্ত নিষ্ঠুর হয়ে ওঠেনি।

রবি রোজেনবার্গকে যে গ্যাস-চেম্বারে পাঠানো হয় নি তার একমাত্র কারণ লোকটা অসাধারণ পণ্ডিত। ইডিস্ এবং পোলিশ দলিলপত্রগুলো ওকে দিয়েই নাৎসীরা তর্জমা করিয়ে নেয়। তবু জাতে ইহুদী বলে কাপো হয় নি। ক্রীশ্চানদের জন্য তবু এক আধটু সুযোগ সুবিধে পাওয়া গেলেও যেতে পারে,—কিন্তু ইহুদী হলে পরে সব দরজাই বন্ধ। আর এখানে দক্ষতার মূল্যও কিছু নেই। মাইনিং ইঞ্জিনীয়ার হলে কাজ দেবে খনি শ্রমিকের। ফিটারকে হয়তো বা ঘর ঝাঁট দিতে হবে। আর ডাক্তারকে মৃতদেহ বহন।

হঠাৎ বিদ্যুতের মতো মাথায় বুদ্ধিটা খেলে যায়। শ্লাইবেলকেই আগুনের ফুলকি হিসেবে ব্যবহার করলে কেমন হয়! গণবিদ্রোহ আউস্‌ভিৎজে একেবারেই অসম্ভব। রোজেনবার্গও কথাটায় সায় দেয়।

প্রথমে শ্লাইবেলকে খতম করে ব্যারাক ভেঙে বেরিয়ে ব্যারাকটায় আগুন ধরিয়ে দিতে হবে। তারপরে শ'খানেক বে-পরোয়া লোক মিলে ক্রিমে-টেরিয়াটাকে ধ্বংস করতে হবে।

আজ হোক্, কাল হোক্ শ্লাইবেলের ওপর সবাই মিলে ঝাঁপিয়ে পড়ার সুযোগ আসবেই। প্রতি সপ্তাহে শ্লাইবেল তার বিচিত্র নিষ্ঠুর পদ্ধতিতে খুন করে বন্দীদের। ঠিক তখনই তাতাতে হবে সবাইকে। আর গার্ডরা অন্য জায়গা থেকে এসে জড়ো হবার আগেই কাজগুলো হাসিল করে ফেলা চাই। তাই ব্যাপারটা একেবারেই আকস্মিক হওয়া দরকার। আর এই বিদ্রোহের সময়টা ঠিক করতে হবে তিনটে সময়ের মাঝ থেকে বেছে নিয়ে। সকাল আটটা, বিকেল চারটে অথবা মাঝ রাত! কারণ এই তিন সময়েই গ্যাস-চেম্বারে লোক ভর্তি করা হয়। যারা গ্যাস-চেম্বারে লাইন দিয়ে দাঁড়াবে, তারাও নিশ্চয়ই প্রাণ বাঁচানোর তাগিদে বিদ্রোহে যোগ দেবে। সবাই মিলে যদি এস্. এস্. গার্ডদের হাত থেকে ক'টা বন্দুকও কেড়ে নেওয়া যায়। ফেডারের তো এ বিষয়ে মিলিটারী ট্রেনিং আছেই। যাদের বন্দুক তাদের দিকেই ঘুরিয়ে ধরতে হবে।

প্রচুর হতাহত হলেও বন্দীরা যদি মরণ-কামড় না ছাড়ে, তবে নিশ্চয়ই এ বিদ্রোহে ওরা জিতবে। অবশ্য ভয়ে যদি মাঝপথে সরে দাঁড়ায়, তবে দ্বিতীয় সুযোগ আর কখনো আসবে না।

মনের ভেয়ানে পরিকল্পনাটা অহরহ ফুটলেও কাজে পরিণত করার সুযোগ পায় না ফেডার।

একদিন একজন নতুন বন্দী আসে ওদের ব্যারাক-ঘরে। এমনিতে নতুনদের প্রতি খুব একটা আগ্রহ দেয় না ফেডার। কিন্তু এই লোকটার মধ্যে এমন একটা কিছু আছে, যেটা ওকে প্রথম থেকেই আকর্ষণ করে।

নবাগত লোকটা লম্বা, কিন্তু সর্বাঙ্গে অত্যাচারের ছাপ ফুটে উঠেছে। শরীরের একটা দিক একটু বিকলাঙ্গ। অত্যাচারের ফলেই। ধীরে ধীরে বাঁ পা'টা টেনে চলে। ফেডারের বাংকের একটু দূরেই লোকটার বাংক।

মাথার মধ্যে অবিরাম ঘুরতে থাকে ফেডারের, কোথায় যেন দেখেছে লোকটাকে! মুখটা চেনা-চেনা মনে হচ্ছে। হঠাৎ মনে পড়ে যায়, প্রায়

বিকলাঙ্গ বিধ্বস্ত লোকটাই ওর রেজিমেণ্টের কমাণ্ডার ছিলো, কর্ণেল সোয়াজ্‌ৎ।

বেশ কিছুক্ষণ বিছানায় শুয়ে শুয়ে লোকটাকে নিরীক্ষণ করে। ভুল করছে না তো? তারপরে স্থিরনিশ্চয় হয়। হ্যাঁ, এ-ই কর্ণেল সোয়াজ্‌ৎ। তবু মনের মধ্যে দ্বিধা আসে, এ অবস্থাতে কী নিজের পরিচয় দেওয়া উচিত হবে? হয়তো গেষ্টোপাদের এটাও একটা ফাঁদ! কে জানে? নইলে জেনে শুনে এক অপরাধী দু'জনকে একই ব্যারাকে রাখবে কেন? হয়তো বা, হাজার হাজার বন্দীদের মধ্যে গেষ্টোপারাও এতো হিসেব রাখতে পারে নি। ভুল করেই এই ব্যারাক-ঘরে পাঠিয়ে দিয়েছে কর্ণেল সোয়াজ্‌ৎকে।

মনটাকে স্থির করে নিয়ে ফেডার বাংক থেকে নেমে কর্ণেলের কাছে আসে।

কয়েক মুহূর্ত কর্ণেলের বাংকের পাশে দাঁড়িয়ে থাকে। যদি কর্ণেল তাকে চিনতে পারে! কিন্তু না। ওকে চেনবার কোনো লক্ষণই নেই ও তরফের।

কর্ণেলের বাংকের পাশে বসে ফেডার। তারপর খুব নীচু গলায় ডাকে,—কর্ণেল সোয়াজ্‌ৎ!

কর্ণেল সোয়াজ্‌ৎ ভীত দৃষ্টিতে ওর দিকে তাকায়।

—আপনি কে? কী চান আমার কাছে? আমি কি আপনাকে চিনি?

—আমি আপনার অধস্তন কর্মচারী। ফেডার তেমনি নীচু গলাতেই উত্তর দেয়।

কর্ণেল ঘন দৃষ্টি নিয়ে ওর দিকে তাকায়। কিন্তু না। রক্তাক্ত চোখে ওকে চিনতে পারার চিহ্ন নেই।

—আমার নাম ফেডার সেলেনবার্গ। আমি ইষ্টার্ণ ফ্রণ্টে আপনার রেজিমেণ্টে ছিলাম।

কর্ণেলের মধ্যে ওকে চিনতে পারার কোনো লক্ষণ নেই দেখে আবার বলে,—আপনি আমার বিয়ের জন্য ছুটির ব্যাপারে সাহায্য করেছিলেন।

সোয়াজ্‌ৎ ভয় পেয়ে বাংকে উঠে বসে,—তার মানে আপনি স্পাই, তাই না?

—না স্যার। আপনি আমাকে একটা মেসেজ দিয়েছিলেন, মনে পড়ছে কি?

—না, না। আমি কাউকে কোনো মেসেজ দিই নি। মিথ্যে কথা। আমি মেসেজ সম্পর্কে কিছু জানি না। কর্ণেল জোরের সঙ্গে বলে।

—আমাকে সে মেসেজ নিয়ে টিয়ারগার্টেনে একজনের সঙ্গে দেখা করার

নির্দেশ ছিলো। ফেডার এতোক্ষণে নিশ্চিত হয়। কর্ণেলের সাহায্যে এরা ফাঁদ পাতে নি।

—টিয়ারগার্টেন? না, না। আমি এ সবের কিছুই জানি না।

—স্যার, আমি স্পাই নই। আমাকে বার্লিনে ট্রেন থেকে নামার সঙ্গে সঙ্গে এরা এ্যারেষ্ট করেছে। তারপর থেকে দিনের পর দিন যে অত্যাচার আপনার ওপর করছে, আমাকেও তাই সহ্য করতে হচ্ছে। এবার বিশ্বাস করছেন?

এতোক্ষণ পরে কর্ণেলের মুখের ওপর বিশ্বাসের ছাপ পড়ে। হাত দিয়ে অবিশ্বাসের মেঘটাকে উড়িয়ে দিয়ে বলে,—তা'হলে ওরা তোমাকেও এ্যারেষ্ট করেছে? কিন্তু তোমার বিয়ের কী হলো?

—বিয়ে হয় নি। এরা আমার ফিঁয়াসেকেও এ্যারেষ্ট করেছে।

ওর কথায় একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে কর্ণেল বলে,—দুঃখিত, এদের অপরাধের শেষ নেই।

—কিন্তু ইচ্ছে করলে এ অপরাধের শেষ করা যায়। ফেডার হালকা করে বলে, যদি কর্ণেলকে এ দুর্বল মুহূর্তে দলে টানা যায়।

—কী করে? কর্ণেলের চোখে উৎসাহের মৃদু আলো।

ফেডার নীচু গলায় সমস্ত পরিকল্পনাটার কথা বলে কর্ণেলকে।

—কিন্তু আমি কী করতে পারি এতে?

—আপনি? আপনাকে এ বিদ্রোহের কমাণ্ড নিতে হবে। আরো তিনজন বিশ্বস্ত লোক আমি যোগাড় করেছি। কুট, লাব্‌বখ্‌ আর রবি রোজেনবার্গ। কিন্তু দেখবেন, ঘুণাক্ষরেও যেন শ্লাইবেলের কাছে একথা প্রকাশ না পায়। ওটাকে প্রথমেই খতম করতে হবে।

ব্যারাক-ঘরে লাইট নেভার সময় হয়। লাইট নিভানোর পর কথাবার্তা বলা বারণ। সুতরাং ফেডার নিজের বাংকে ফিরে যায়।

পরের দিন কিন্তু ঘটনাটা অন্য দিকে মোড় নেয়। ক্রাউসেন্‌হাইন ডেকে পাঠায় ওকে। প্রায় ছ'সপ্তাহ পরে। কে জানে, নতুন করে কী অত্যাচার আবার শুরু করা হবে?

ঘরে ঢুকতেই ক্রাউসেন্‌হাইন যতোটা সম্ভব গলাটাকে মোলায়েম করে বলে,—ইয়েস্ মাই ফ্রেণ্ড সেলেনবার্গ, কেমন লাগছে? ফেডার চুপ করে থাকে। কোনো উত্তর দেয় না।

—প্রতিজ্ঞা করেছিলাম যে তোমার ফিঁয়াসে কেটোর সঙ্গে তোমাকে দেখা করার অনুমতি দেবো। তাই না? কী ব্যাপার? কথা বলছো না যে? ঠিক

আছে, এখন তুমি তোমার ফিঁয়াসে কেটোর সঙ্গে দেখা করতে পারো।

কোনো উত্তর না দিলেও মনে মনে ভয় পায় ফেডার। হয়তো গ্যাস-চেম্বারে ঢোকানোর আগে বা চুল্লীতে ছুঁড়ে দেওয়ার দৃশ্যটা ওকে দেখানো হবে! এ পশুগুলোকে কোনো কিছুতে বিশ্বাস নেই।

ওকে আবার ল্যাবরেটরিতে নিয়ে আসে। সেই পুরনো চেয়ারটাতেই বসতে দেয়।

একটু পরে দু'জন গার্ড একটা চাকা লাগানো ট্রলি ঠেলতে ঠেলতে অপারেশন থিয়েটারে নিয়ে আসে। ওপরে চাদর দিয়ে ঢাকা দেহটা যে কেটোর, কেউ না বলে দিলেও বুঝতে পারে ফেডার। যাক্ তবু বাঁচোয়া যে কেটো অজ্ঞান। দৃঢ় হাতে চেয়ারের হাতল দুটো চেপে ধরে ফেডার। কেটোর ভাগ্যে যা ঘটে ঘটুক। তবু কোনোরকম দুর্বলতা দেখাবে না ফেডার। আর ওর পক্ষে তো কিছু করা সম্ভবও নয়।

কেটোকে অপারেশন থিয়েটারে আনা হলে ডাক্তার ষ্ট্রুপ এগিয়ে আসে। চাদরটা গলা পর্যন্ত উন্মুক্ত করে। ফেডার বুঝতে পারে না, কেটোর মুখের ওপরে ওরা কি করে চলেছে? সুন্দর কেটোর মুখটাকে হয়তো বা সারা জীবনের জন্য কদাকার করে দেবে।

কতোগুলো ঠাণ্ডা মুহূর্ত। সময়ের জ্ঞান হারিয়ে ফেলেছে ফেডার, স্পষ্ট শুনতে পাচ্ছে নিজের হার্ট-বীট। এক সময় অপারেশন শেষ হয়। ডাক্তার ষ্ট্রুপ বেসিনে হাত ধুচ্ছে। যেন কারোর জীবন রক্ষার জন্য বিরাট বড়ো কোনো অপারেশন করে এলো এই মাত্র।

কেটোর মাথার সামনের দিকের চুলগুলো কামানো। একটা লোক ব্যাণ্ডেজ করতে ব্যস্ত। নিশ্চল ঘুমন্ত কেটো। একটু পরে ট্রলিতে করে কেটোকে নিয়ে যায়।

ডাক্তার ষ্ট্রুপকে সঙ্গে নিয়ে ক্রাউসেন্‌হাইন ফিরে আসে,—তোমার ফিঁয়াসেকে দেখলে সেলেনবার্গ।

—হ্যাঁ, দেখলাম। তার জন্য অনেক ধন্যবাদ। ভেতরের উত্তেজনাটাকে চেপে রেখে উত্তর দেয় ফেডার।

ডাক্তার ষ্ট্রুপের দিকে ফিরে ক্রাউসেন্‌হাইন বলে,—ওকে একটু বুঝিয়ে দাও তো তোমার অপারেশনের ব্যাপারটা!

—ওর ব্রেনের থেকে কয়েকটা নার্ভ খালি সরিয়ে দিয়েছি।

ফেডার চেঁচিয়ে ওঠে,—তার মানে ওকে পাগল করে দিয়েছেন, তাই না?

ডাক্তার ষ্ট্রুপ ওকে থামিয়ে দিয়ে বলে,—না, না। পাগল হবে কেন? খালি যে-নার্ভগুলো মানুষকে মিছিমিছি চিন্তা করায়, সেগুলোকে সরিয়ে দিয়েছি। কোনো কিছুতেই আর ওকে উৎকণ্ঠিত হতে হবে না।

—তার মানে? আপনারা এবার ওকে দিয়ে যা ইচ্ছে তাই করাবেন! ফেডার ওদের দু'জনের দিক থেকে মুখটা ঘুরিয়ে নেয়।

হঠাৎ ঘটনাটা ঘটে গেলো। সপ্তাহ খানেকের মধ্যে কর্ণেল সোয়াজ্‌ৎ অনেকটা নিজেকে সামলে নিয়েছে। রোজেনবার্গ, কুট, লাব্‌বখ্‌ আর ফেডারের সঙ্গে মিলে পরিকল্পনাটাকে আগাপাশতলা খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখেছে।

সেদিন ব্যারাক-ঘরের লাইট নেভাব কিছুটা দেরী আছে। দরজার ওপরের বাল্‌বটাব লালচে আলোয় পুবো ব্যারাক-ঘরটা স্পষ্ট দেখা যায় না।

শ্লাইবেল ফেডারকে না ঘাঁটালেও অপ্রতিহত গতিতে দুর্বল বন্দীদের ওপর অত্যাচার সমানে চালিয়ে যাচ্ছে।

বিছানায় শুয়ে শুয়েই শ্লাইবেল বেছেটেছে বৃদ্ধ প্রায়-ক্ষয়িষ্ণু লোককে ডাকে, —গ্রুট, এদিকে আয়।

বৃদ্ধ লোকটা ভয়ে বিছানার ওপর জড়ো সড়ো হয়ে বসে। তারপর নেমে শ্লাইবেলের বিছানার কাছে এসে নরম গলায় বলে,—আমাকে ডাকছেন কাপো শ্লাইবেল?

—হ্যাঁ, হ্যাঁ বুড়ো হায়না, তোকেই ডাকছি। হাঁটু গেড়ে মেঝেতে বস।

দিনের পর দিন বরফ-ঠাণ্ডা জলে কাজ করার পর হাড়ের জোড়গুলো এমনিতেই টনটনিয়ে ওঠে। তবু অতিকষ্টে লোকটা শ্লাইবেলের বিছানার পাশে হাঁটু গেড়ে বসে।

—প্রার্থনা কর। শ্লাইবেল আদেশ করে।

কাঁপা কাঁপা স্বরে গ্রুট প্রার্থনা শুরু করে। গর্জে ওঠে শ্লাইবেল,—ঈশ্বরের কাছে নয়। শয়তানের কাছে প্রার্থনা কর। বল, তুই যেন নরকে গিয়ে শয়তানের সঙ্গে মিলতে পারিস।

প্রার্থনা শেষ হলে বিছানার নিচ থেকে গজ কয়েক লম্বা দড়ি বার করে গ্রুটের সামনে ছুঁড়ে দিয়ে বলে,—নিশ্চয়ই তোকে বলে দিতে হবে না এটা কী?

ছোটাছুটি করে ব্যারাকগুলোয় আগুন নেভাতে ব্যস্ত, ওরা তখন গ্যাস-চেম্বারের দিকে এগোয়।

বেশ কিছু বন্দী গ্যাস-চেম্বারের কাছে অপেক্ষা করছে। উলঙ্গ অবস্থায়। কিছু বাথ-হাউসে। দু'জন গার্ড দলটাকে পাহারা দিচ্ছে। ফেডার একজনকে গুলি করতে, আরেকজন ঊর্ধ্বশ্বাসে ছুট দেয়। তাকেও পেছন থেকে গুলি করে ফেডার। পরিত্যক্ত মেসিনগান দুটো কুট আর কর্ণেল তুলে নিয়ে পজিসন নেয়। সবাই তখনো ব্যাপারটা ঠিক বুঝে উঠতে পারে নি।

দূর থেকে এস্. এস্. গার্ডদের চিৎকার আর মেসিনগানের আওয়াজ ভেসে আসছে। তার মানে ওরা এতোক্ষণে বুঝতে পেরে গেছে যে বন্দীরা বিদ্রোহ করেছে।

কর্ণেল সোয়াজৎ চিৎকার করে আদেশ দেয়, – গ্যাস-চেম্বারকে ধ্বংস করো।

বাঁ পাটা হিঁচড়ে নিয়ে এগিয়ে চলে কর্ণেল। ফেডার ইতিমধ্যে মনস্থির করে ফেলেছে। যে করেই হোক বাথ-হাউসকে খুলে দিতে হবে।

ওর গায়ে এস্. এস্. ইউনিফর্ম থাকায় সুবিধে, দূর থেকে গার্ডরা এলোপাথাড়ি গুলি ছুঁড়লেও ওকে লক্ষ্যে আনে না। বিদ্রোহীরা প্রাণপণে ছোটে গ্যাস-চেম্বারের দিকে। ফেডার বাথ-হাউসের দরজাটা খুলে দিতেই উলঙ্গ বন্দীরা বাইরে বেরিয়ে আসে। নতুন যারা সবে মাত্র ক্যাম্পে এসেছে, তারা বিমূঢ়। ব্যাপারটা ঠিক বুঝে উঠতে না পেরে চিৎকার করে যে যেদিকে পারে দৌড়োয়। ইতিমধ্যে কর্ণেল সোয়াজৎ বাথ-হাউসে পৌঁছে বয়লারের মধ্যে গ্রেনেড ছুঁড়ে বয়লার-হাউসটাকে ধ্বংস করে।

বাথ-হাউস থেকে গ্যাস-চেম্বার পর্যন্ত রাস্তাটার দু'পাশে কাঁটা তারের বেড়া দেওয়া। যাতে স্নানের পর লাইন বেঁধে বন্দীরা সোজা গ্যাস-চেম্বারে গিয়ে ঢোকে। কাঁটা তারের পাশে চাবুক হাতে গার্ড দাঁড়িয়ে। লাইনের একটু এদিক-ওদিক হলেই উলঙ্গ দেহগুলোর ওপর চাবুক আছড়ে পড়ে।

চাবুক হাতে দাঁড়ানো গার্ডগুলোর দিকে ফেডার মেসিনগান থেকে গুলি করতেই, ওরা ছুট লাগায়। বিদ্রোহীরা গ্যাস-চেম্বারের দিকে এগোতে চেষ্টা করে। পাশেই বন্দীদের থেকে ছিনিয়ে নেওয়া সোনা, চশমা, জামাকাপড়

রাখার ঘর। কয়েকজন গার্ড সেগুলো বাছায় ব্যস্ত। জামাকাপড়গুলো বেশীর ভাগ যাবে জার্মানিতে। নাৎসী সেনাবিভাগে। উপচে পড়া জুয়েলারী যাবে বার্লিনের বড়ো বড়ো ডিপার্টমেন্টাল ষ্টোরে। টিংকেট আর লকেটগুলো এ্যান্টিকুয়ি হিসেবে বিক্রী হবে। ফেডারের গুলিতে জিনিষপত্র বাছায় ব্যস্ত গার্ডগুলো ওখানেই শুয়ে পড়ে।

দূর থেকে লাউড-স্পীকারে ভেসে আসছে,—মেয়েরা, কাঁটা তারের বেড়ার শেষে বাঁ দিকে মোড় নাও। বাথ-হাউসে ঢোকার আগে হেয়ার-কাট করা হবে। পাশেই সুন্দর সেলুন। তোমাদেরই জন্য।

একদল বিদ্রোহীকে নিয়ে কর্ণেল সোয়াজ্‌ৎ সেলুনের মধ্যে ঢুকে পড়ে। ভোঁতা কাঁচি দিয়ে কোনোরকমে গার্ডগুলো চুল কেটে পাশে স্তূপ দিচ্ছে।

কর্ণেল ভেতরে ঢুকে গার্ডগুলোকে ঘরেব মাঝখানে লাইন দিয়ে দাঁড়াতে আদেশ দেয়। আর তারপরেই গুলি বৃষ্টি। মেয়েগুলো ঠিক কী ঘটছে বুঝতে না পেরে ভয়ে ছোটাছুটি শুরু করে।

কেউ যেন হঠাৎ গ্যাস-চেম্বারে গিয়ে না ঢুকে পড়ে, তাই সেদিকের রাস্তাটা ইতিমধ্যে কয়েকজন বিদ্রোহী ঘিরে দাঁড়িয়েছে।

কয়েকজন বিদ্রোহী লেবার ক্যাম্প থেকে কুঠার এনে তখন আরেকটা গ্যাস-চেম্বারের দরজা ভাঙতে আরম্ভ করে দিয়েছে। ওপরের কুঠরী গলিয়ে মাত্র কয়েক মিনিট আগে এস্. এস্. গার্ড *Zyklone B* গ্যাসে ভর্তি ক্যানেস্তারাটা ছুঁড়েছে।

কর্ণেল চিৎকার করে ওঠে, বাইরে বেরিয়ে আসুন। মৃত্যুর পূর্বমুহূর্তে মানুষগুলো কিংকর্তব্যবিমূঢ়! কয়েকটা মুহূর্ত মাত্র। তারপর ছুটে বেবিয়ে এসে লোকগুলো বিদ্রোহীদের দলে মেশে।

ফেডার ছোটে পাশের গ্যাস-চেম্বারে। প্রায় আধ ঘণ্টার ওপরে এ দরজাটা ভেতর থেকে বন্ধ। আর এখন খুলে দিয়ে লাভও নেই। তার চেয়ে আগুন ধরিয়ে দেওয়া ভালো। মৃতদেহগুলোকে পোড়ানো হয়ে যাবে।

কিন্তু বিদ্রোহীরা শোনে না। দরজাটা ভেঙে ভেতরে ঢুকে পড়ে। সারি সারি সারি মৃতদেহ। বিষের ধোঁয়ায় নীল হয়ে গেছে।

মা আঁকড়ে ধরে আছে কয়েক মাসের শিশুকে। শিশুর মুখ তখনো স্তনে।

স্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে পড়ে সবাই। জীবনের এ বীভৎসতার মুখোমুখি কেউ কখনো হয় নি!

কয়েক মুহূর্তের জন্য ফেডার নিজেকে হারিয়ে ফেলে। নীল মৃতদেহগুলো এতোটুকু চেম্বারে এমন ভাবে ঠাসা যে মাটিতে পর্যন্ত পড়তে পারে নি। দাঁড়িয়ে রয়েছে। হঠাৎ দেখলে মনে হয়; এরা জীবন্ত। শুধু নীল রঙে কে যেন তাদের চুবিয়ে তুলেছে। সবাই যে মরে গেছে তা' নয়। শতকরা পাঁচ ভাগ, যাদের এর পরেও প্রাণস্পন্দন থাকে, তাদের জীবন্ত অবস্থাতেই গার্ডগুলো চুল্লীতে ছুঁড়ে দেয়।

সহকর্মীদের ওপর মৃতদেহগুলোর ভার দিয়ে বেরিয়ে আসে ফেডার। ইতিমধ্যে প্রায় পঞ্চাশজন সশস্ত্র বন্দী কর্ণেলকে ঘিরে আছে। এস্. এস্. গার্ডদের মেরে তাদের হাতেব মেসিনগান যে পেরেছে, ছিনিয়ে নিয়েছে। অনেকে আবার জীবনে কখনো বন্দুক পর্যন্ত ছোঁড়ে নি। এই প্রথম ট্রিগারে হাত রেখেছে।

তিনটে ক্যাম্পের এস্. এস. গার্ডরা এসে ইতিমধ্যে ওদের ঘিরে ফেলেছে। যে যার জায়গায় পজিসন নিয়েছে।

সেই দুর্ভেদ্য ব্যূহ ভেদ করে ষ্টোর রুম, আর্মারি অথবা চুল্লী ধ্বংস করা অসম্ভব।

ডিজেলের একটা ড্রাম আবিষ্কার করে বিদ্রোহীরা পাম্প করে গ্যাস-চেম্বারগুলোর গায়ে তেল ছিটিয়ে দিয়ে আগুন ধরিয়ে দেয়। কালো ধোঁয়ার রাশি পাক খেয়ে খেয়ে ওপরে ওঠে।

মৃতদেহগুলোকে ব্যারিকেড্ হিসেবে সামনে রেখে যে যা পাচ্ছে, তাই দিয়ে সমানে প্রতিরোধ চালিয়ে যাচ্ছে।

ফেডারের চকিতে মন পড়ে যায় ক্রাউসেন্হাইনের কথা। কিন্তু এ পরিস্থিতিতে ওকে খুঁজে পাওয়া অসম্ভব। নিশ্চয়ই এতোক্ষণে ক্যাম্প ছেড়ে পালিয়েছে।

গ্যাস-বিল্ডিং আর বাথ-হাউসের মাঝের জায়গাটা সংকীর্ণ। নবাগত বন্দী আর বিদ্রোহী মিলে প্রচণ্ড ভীড়। ফেডার সেই ভীড়ের মধ্যে কমরেডদের খোঁজে। রোজেনবার্গকে বিদ্রোহ আরম্ভ হওয়ার পর আর দেখে নি। কুর্ট তো গ্যাস-চেম্বারের মুখে এস্. এস্. গার্ডের গুলিতে মারা গেছে। লাব্‌থ্‌কে খুঁজে পায় না।

কম্পাউণ্ডের ওপাশ থেকে লাউড স্পীকার মুখর হয়,—এখনো সময় থাকতে আত্মসমর্পণ করো। পাঁচ মিনিট সময় ভেবে দেখার জন্য দেওয়া হচ্ছে। নইলে আর্টিলারী দিয়ে সবাইকে ধুলোয় মিশিয়ে দেওয়া হবে।

কয়েকজন বিদ্রোহী সঙ্গে সঙ্গে ট্রান্সমিটারে গুলি করে লাউড স্পীকারটা স্তব্ধ করে দেয়।

কর্ণেল ওদের থামাতে ব্যস্ত। বৃথা গুলি খরচ করার সময় এটা নয়।

ফেডার কর্ণেলের পাশে আসে। কর্ণেল আপ্রাণ চেষ্টা করছে বিদ্রোহীদের মধ্যে যতোখানি শৃঙ্খলা আনা যায়।

—কর্ণেল, বর্তমান অবস্থায় আপনি কি করতে বলেন?

—শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত যুঝে যাওয়া।

—কিন্তু বন্দীরা কি ততোক্ষণ পর্যন্ত আপনার পাশে দাঁড়াবে? ফেডারের গলায় দ্বিধার জিজ্ঞাসা।

—এতোক্ষণ তো দাঁড়িয়েছে। এটাই কি যথেষ্ট নয়? আব এছাড়া এদের করারও তো কিছু নেই।

—কিন্তু এস্. এস্. গার্ডরা যে বলছে আর্টিলারী আনবে?

—আনতে পারে। কিন্তু আমি যতদূর জানি, শেষ মেসিনগানটা পর্যন্ত নাৎসীরা ইষ্টার্ণ ফ্রণ্টে পাঠিয়ে দিয়েছে। আর তুমি বোধহয় জানো না, তোমার এ্যারেষ্টের পর রাশিয়ানরা অনেক ভেতবে ঢুকে পড়েছে। ফ্রণ্ট এখান থেকে খুব বেশী একটা দূরেও নয়।

—সেক্ষেত্রে আত্মসমর্পণ—!

ওকে মাঝপথে থামিয়ে দিয়ে গর্জে ওঠে কর্ণেল সোয়াজ্‌ৎ,—না, কক্ষনো না। তা'হলে ওরা একজনকেও জীবিত রাখবে না। তার চেয়ে শেষ পর্যন্ত যুদ্ধ করে যাওয়া শ্রেয়। অন্ততঃ নিজেদের সঙ্গে কয়েকটা জন্তুকেও তো নিয়ে যেতে পারবো!

এমন সময় ভীড় ঠেলে ছুটে আসে লাব্‌বখ্‌। ফেডারকে দেখতে পেয়ে বলে,—গ্যাস-চেম্বারের পেছনে ট্রেঞ্চ রয়েছে। যেটা ধরে গেলে চুল্লীর কাছাকাছি পৌঁছে ওগুলোকে উড়িয়ে দিতে পারা যাবে!

—কিন্তু কী দিয়ে? ফেডারের গলায় জিজ্ঞাসার চিহ্ন।

—কেন? গ্রেনেড। আমার কাছে অনেকগুলো আছে। লাব্‌বখের উত্তরে দৃঢ়প্রত্যয়।

কর্ণেলও প্রস্তাবটা সমর্থন করে। কোনোরকমে জায়গাটা থেকে বেরিয়ে

সমস্ত ক্যাম্পে ছড়িয়ে ছিটিয়ে পড়তে পারলে গার্ডদের ঘেরাওটাকে ভেঙে দেওয়া যাবে। এমনিতেই বাঁচার আশা কম। নেই বললেই চলে। তাই এই ফাঁদ কেটে বেরিয়ে যদি কেউ বাঁচতে পারে, সেই চেষ্টাই করা উচিত। অন্যান্য বন্দীদের সঙ্গে মিশে যেতে পারলেও খুঁজে খুঁজে বার করে গুলি করে মারতে সময় লাগবে।

কর্ণেলের আদেশের সঙ্গে সঙ্গে বেশ কয়েকজন ঝাঁপিয়ে পড়ে ট্রেঞ্চে। ওয়াচ টাওয়ারের ওপর তখন শ'য়ে শ'য়ে গার্ড জমায়েত হয়েছে। এক নাগাড়ে গুলিবৃষ্টি করে চলেছে। কর্ণেলের আদেশ সত্ত্বেও মাথা নীচু করা অসম্ভব, ময়লার গন্ধে। ফেডার লাব্‌বথের থেকে নেওয়া গোটা দশেক গ্রেনেড কোমরের বেল্টে বেঁধে নেয়। সামনের কয়েকজন গুলি খেয়ে পড়ে যেতে মৃতদেহগুলোর ওপর দিয়েই ছোটে ফেডার। একটা চুল্লীকে অন্ততঃ যেমন করেই হোক্ ধ্বংস করতে হবে। ট্রেঞ্চ কাটার কাজে নিজেও ছিলো বলে, অতোটা কষ্ট ওর হয় না।

সামনে একফালি খালি জমি। প্রথম চুল্লীটার কাছে পৌছতে হলে জমিটা পেরোতে হবে। ওয়াচ্ টাওয়ারের ওপর দাঁড়ানো গার্ডগুলো সমানে খালি জমিটুকুর ওপর গুলিবৃষ্টি করে চলেছে। তিন-চারজন সেই জমি পেরোতে গিয়ে গুলি খেয়ে মাটিতে পড়ে যায়। ট্রেঞ্চ থেকে লাফিয়ে উঠে নীচু হয়ে বিদ্যুৎবেগে ছোটে ফেডার। যেমন করেই হোক্, চুল্লীর কাছে ওকে পৌছতেই হবে।

কোমরের থেকে গ্রেনেডগুলো বার করে। কয়েকটা মুহূর্ত মাত্র। চুল্লীটার দরজাটা উঁচু করে ধরে গ্রেনেডগুলো ভেতরে ছুঁড়ে দেয়।

বিরাট বিস্ফোরণে চুল্লীটা হেলে পড়ে। ইস্পাতের কাঠামোটা দুমড়ে মুচড়ে গেছে। সরে যাওয়ার সময় না পাওয়ায় গলিত ধাতুর স্রোত ফেডারকে ভেতরে টেনে নেয়।

অন্ধকারের কালো সমুদ্রটা ফিকে হয়ে আসছে। পুবের আকাশে আলোর ইসারা। কিছুক্ষণ পরেই সারা পৃথিবী সেই আলোর ঝরনায় স্নান করবে।

রাশিয়ানরা এগিয়ে আসছে। এখান থেকে তাদের পদধ্বনি স্পষ্ট শোনা যাচ্ছে।

বন্দিনী পর্ব

১৯৩৯ সালের গ্রীষ্মটা নিত্য ঝলমলে। মাধ্যমিক স্কুলের প্রথম বার্ষিক শ্রেণীর পরীক্ষা সবেমাত্র শেষ হয়েছে। সামারের লম্বা ছুটির শুরু। ছোটবেলা থেকেই খেলাধূলায় ঝোঁক বেশী বলে, স্কেটিং, স্কী আর সাঁতার পেলে আর কিছু চাই নি। সামনেই সাঁতার প্রতিযোগিতা। জুনিয়ার এ্যাথলেটিক টিমে নির্বাচিত বলে, স্বাভাবিকভাবেই এক নাগাড়ে প্রাণপণে প্রাক্‌টিস করে চলেছি। ঠিক সেই সময়েই মা ডেকে বললেন যে বাড়ীর সবাই 'হলি-ডে'তে যাবে। সুতরাং আমাকেও সঙ্গে যেতে হবে। ক্রাইনিসা ছুটি কাটাবার চমৎকার জায়গা। পিনিনি পর্বতমালার একটা উপত্যকা। সাউথ পোল্যাণ্ডের সুউচ্চ পর্বতশ্রেণী টাট্রার কাছেই। সতেরো বছরের ভাই রবার্ট বন্ধু-বান্ধবদের সঙ্গে আমাদের আগেই চলে গেছে। বাবা কাজকর্ম শেষ করে কয়েকদিন পরে আসবেন। কিন্তু আমাকে যেতে হবে মা'র সঙ্গে।

কী চমৎকার সে দিনগুলো। সুন্দব দৃশ্য, টাট্রা রেঞ্জের আবলুস কালো গ্র্যানাইট গায়ে সুশুভ্র তুষার জমে ঝিক্‌মিক্ করছে। অনেক নীচ দিয়ে ঘুরপাক্ খেতে খেতে দুরন্তবেগে ছুটে চলেছে চঞ্চলা ভাইনজিগ্। একটা মোটা গাছের গুঁড়ির মাঝের অংশটা খুঁড়ে নিজের হাতে তৈরী ডোঙাটা নিয়ে মাঝে মাঝে সেই ভাইনজিগের ডাউন স্ট্রীমে ঝাঁপিয়ে পড়তাম। কয়েক ঘণ্টা পরে অনেকটা দূরে গিয়ে ডোঙাটাকে জল থেকে টেনে তুলে নিয়ে ট্রেনে চেপে ফিরে আসতাম।

হঠাৎ বাড়ী থেকে একটা টেলিগ্রাম পেলাম। বাবা করেছেন। আমি, মা এমন কি ভাই রবার্টকে পর্যন্ত তক্ষুনি ফিরে যাওয়ার কড়া আদেশ।

বাড়ীতে ফিরে এসে সবাই অবাক। ক'টা দিনের মধ্যে সবকিছু যেন অদলবদল হয়ে গেছে। সর্বত্র একটা আতংকের ছায়া। ঘরের জিনিষপত্রগুলো একজায়গায় করে বাঁধাছাঁদা শেষ। ঘরগুলো ফাঁকা। কার্পেটগুলো রোল করে ঘরের কোণে দাঁড় করানো ; বেশ কিছু ফার্নিচার নেই। শীতবস্ত্র রাখার ট্রাংকগুলো সুদ্ধ গোছানো। যেন এখনই কোথাও পাঠানো হবে জিনিষপত্র-গুলোকে।

ব্যাপার স্যাপার দেখে আমি তো বিমূঢ়। এতোদিনের মেড্ সার্ভেন্ট—

সেও নিশ্চল। যেন পাথরে গড়া। নির্বাক। মুখ বুজে আদেশ মতো কাজ করে চলেছে। বাবা এবং মা উভয়েই আতংকিত। অহরহ আত্মীয়-স্বজন, বন্ধু-বান্ধব টেলিফোনে তাদের প্ল্যান-প্রোগ্রাম সম্পর্কে খোঁজখবর করছে। মাঝে মাঝে পাড়া প্রতিবেশীরা এসে বাবার উপদেশ নিয়ে যাচ্ছে। সবার মুখে মুখে একটা শব্দ ঘুরছে। ইভাকুয়েশন। তার মানে কি যুদ্ধ শুরু হলো? কার সঙ্গে? এবং কখন? কিন্তু তখন কি ঘুণাক্ষরেও বুঝতে পেরেছি আগামী দিনগুলোর রং কত কালো? কী নিদারুণ ভয়াবহ।

ছোট্ট শহর বিল্স্কো। দক্ষিণ-পশ্চিম পোল্যাণ্ডের সিলিসিয়ার একপ্রান্তে। জার্মান, চেকোশ্লাভাকিয়া আর পোলিশ সীমান্ত থেকে প্রায় মাইল কুড়ি দূরে এই ছোট্ট সহর বিল্স্কো। চারিদিক ঘেরা বিস্কিডি পর্বতশ্রেণী। একেবারে টানা চলে গেছে পোল্যাণ্ড আর চেকোশ্লোভাকিয়ার দক্ষিণ সীমান্ত পর্যন্ত। স্থানীয় জল-হাওয়াও চমৎকার। নাতিশীতোষ্ণ গ্রীষ্ম আব ঠাণ্ডা কিন্তু শুকনো শীত। পর্বতমালা যেন বুক পেতে শীতের কনকনে বাতাসকে বাধা দিচ্ছে। কাছাকাছি চূড়া ক্লিমজোক্। তিন হাজার ফুট উঁচু। উপত্যকায় ছোট ছোট ট্যুরিষ্ট কটেজ ঘরের জানলা দিয়ে দেখা যায়, ক্লিমজোকেব গায়ে জমা বরফের ওপর রোদ পড়ে চিক্চিক্ করছে।

সবচেয়ে উঁচু চুড়োটা হলো বাবিয়া গোরে। উইক্এণ্ডে প্রায় সবাই ঘর ছেড়ে বেরিয়ে পড়ে। পাহাড়ে কাটাতে। গ্রীষ্মে পাহাড়ে চড়া, আর শীতের দিনে স্কি, সবাই উর্ধ্বশ্বাসে দিনগুলোকে পুরোপুবি উপভোগ করতে ব্যস্ত। বিল্স্কোর বাসিন্দাবা ছাড়াও দূর দূর থেকে ট্যুরিষ্টরা এসে জমা হয় কটেজে। তা'ছাড়া এদিকে ওদিকে স্যানিটোরিয়ামও তো কম ছড়িয়ে ছিটিয়ে নেই।

ছোট্ট শহর হলেও বস্ত্রশিল্পের দৌলতে শহরটা সমৃদ্ধশালী। এখানকার মিলে উৎপন্ন বস্ত্রের সারা ইউরোপের বাজারে বেশ চাহিদা। শিল্পনগরী বলে বাসিন্দারাও এক জাতের নয়; তার ওপর শহরটা বেশ কয়েকবার হাত বদল হয়েছে। পোলিশ, জার্মান আর চেক অধিবাসী বেশী বলে, তিনটে ভাষাই বেশী চলে।

১৯৩৯ সালে হাত ঘুরে শহরটা পোলিশদের দখলে আসে। এতে শহরের জার্মান অধিবাসীরা অসুখী হলেও করার তো কিছু নেই। শুধু সুযোগের অপেক্ষা।

এবং সুযোগটা সেই বছরের আগষ্ট মাসেই এসে হাজির হয়। ছাদের ওপরে ফিট্ করা মেসিনগান সবসময় তাগ্ করা শহরের অ-জার্মান বাসিন্দারের দিকে।

শুরু হলো বিশৃঙ্খলা। লুঠ-তরাজ। রাস্তায় রাস্তায় জার্মানরা তখন স্বস্তিকা চিহ্নিত পতাকা নিয়ে আনন্দে গান গাইতে গাইতে মারচ্ করছে।

বাবা অনেক ভেবে চিন্তে শেষ পর্যন্ত শহর পরিত্যাগের কথা স্থির করলেন। কিন্তু কোথায় যাওয়া যায়? দূর পুবের কোনো শহরে গেলে একেবারে গা ঘেঁষে রাশিয়া। মোটেই নিরাপদ নয়। একমাত্র সেন্ট্রাল পোল্যাণ্ড। জার্মানদের হাত সেখানে হয়তো বা পৌছতে পারবে না। রাশিয়াও বেশ দূরে। সুতরাং অনেক ভেবে চিন্তে বাবা তাই সেন্ট্রাল পোল্যাণ্ডের লাব্লিন শহরটাকেই বেছে নিলেন। যদিও শহর লাব্লিনকে ঠিক সেন্ট্রাল পোল্যাণ্ডে বলা যায় না। কিছুটা পুবে।

যাই হোক্, শেষ পর্যন্ত আমরা বাড়ী ছাড়লাম ২৬শে আগষ্ট। রাস্তায় ঠাসা রিফ্যুজি, কিলবিল করছে। বেশীর ভাগই মালপত্র পিঠে বেঁধে নিয়ে হেঁটে চলেছে! কারণ বহু ট্রেনই বাতিল। নেহাৎ ভাগ্যের জোরে একটা ট্রেনের কামরায় পা রাখার মতো একটু জায়গা জুটে গেল। সত্যি বলতে কি, ভবিষ্যতের কয়েক বছরের মধ্যে এই যাত্রাপথটুকু যা আমাদের সুখে কেটেছিল।

প্রাচীন কিন্তু বর্ধিষ্ণু শহর লাব্লিন। ঐতিহাসিকও বটে। পুরনো গথিক ষ্টাইলের বিরাট সুন্দর সুন্দর বাড়ী। কিন্তু আমার ভালো লাগে না। হতে পারে মনের পিছুটানের জন্যই। আমার মন তখন অহরহ কাঁদছে। ফেলে আসা বন্ধু-বান্ধব, পাহাড়; এমনকি ছোট ছোট অকিঞ্চিৎকর জিনিসগুলোর জন্য পর্যন্ত। স্পোর্টসের জিনিসগুলো এসে পৌছলেও মনটাকে অন্যদিকে ঘোরাতে পারতাম। আমরা সঙ্গে করে একটা মাত্র স্যুটকেস নিয়ে এসেছিলাম। বাকী ফার্নিচার জামাকাপড় এবং মালপত্র আগেই পাঠিয়ে দেওয়া হয়েছে। রোজ সকালে ঘুম থেকে উঠে বাবা দৌড়োতেন স্টেশনে স্টেশনে। যদি বা ইতিমধ্যে মালপত্রগুলো এসে পৌছে থাকে। কিন্তু হায়! কোনোদিনই ওগুলো এসে আর পৌছোয়নি। পরে জেনেছিলাম, যে ট্রেনে মালপত্রগুলো আসছিলো, সেই ট্রেনটাকেই ক্রাকাউ রেলস্টেশনে জার্মানরা বোমা মেরে ধ্বংস করে দিয়েছে। অর্থাৎ, আমাদের জিনিসপত্রগুলোও সেই সঙ্গে আগুনের লেলিহান জিভ চেটেপুটে ভেতরে টেনে নিয়েছে।

এর আগে কখনো যুদ্ধের মুখোমুখি হইনি। সাইরেনের শব্দে যুদ্ধ সম্পর্কে আমার প্রথম উপলব্ধি। তবু ভাবতাম, ব্যাপারটা সাময়িক। স্কুল খুললেই আবার আমাদের শহরে ফিরে যাবো। কিন্তু মনের দিক থেকে প্রথম ধাক্কা খেলাম, ছুটি ফুরোনোর পরও যখন আমরা ফিরলাম না। তখনই সন্দেহ হলো,

কোথাও নিশ্চয়ই বড়ো রকমের কোন একটা ছন্দপতন হয়েছে।

প্রতিদিনে, প্রতি ঘণ্টায়, প্রতিটি মুহূর্তে তখন পোলিশ সৈন্যেরা ইভাকুয়েট্ করছে। জার্মান সৈন্য এগিয়ে আসছে। দিনরাত শহর লাব্লিনের ওপরে বোমাবর্ষণ চলেছে। একটানা। কয়েকটা মুহূর্তেরও বিরাম নেই। পাশের বাড়ীটা বোমার আঘাতে বিধ্বস্ত; আমাদের বাড়ীর জানালা দরজাগুলোও ভেঙ্গে পড়েছে।

ইতিমধ্যে আমাদের বহু বন্ধু-বান্ধব শুধু পায়ে হেঁটে লাব্লিনে পৌঁছেছে। তা'ও রাতের অন্ধকারে। দিনে রিফ্যুজির দল দেখলেই জার্মান প্লেনগুলো ছোঁ মেরে নীচুতে নেমে মেসিনগানের গুলি বৃষ্টি করে। অনেকে আবার জার্মানদের অধিকৃত এলাকা থেকে কোনোক্রমে পালিয়ে এসেছে। তাদের মুখে ছুট্-ছাট জার্মানদের অত্যাচারের কথা শুনে গা শিউরে ওঠে।

সপ্তাহ খানেকের ভিতরেই জার্মান ট্রুপ শহরের ভিতরে ঢুকে পড়লো। শহর তখন পরিত্যক্ত। প্রায় সব বাড়ীর দরজা জানালাই দিনরাত বন্ধ। কয়েকদিন বাদে শহরের দেওয়ালগুলো পোষ্টারে পোষ্টারে ছেয়ে গেল। এইসব পোষ্টারে শহরের ইহুদী অধিবাসীদের জার্মান সৈন্যবাহিনীর কাছে আত্মসমর্পণ করতে বলা হয়েছে। কিন্তু তার আগেই শহরের বেশীর ভাগ ইহুদী যুবক শহর ছেড়ে পালিয়েছে। ইষ্ট অথবা সাউথের দিকে। কোনোরকমে সীমান্ত পেরিয়ে যদি রাশিয়া বা রুমেনিয়ার ভিতরে ঢুকে পড়া যায়, তবে ভবিষ্যতে মিত্রশক্তির সঙ্গে হাত মিলিয়ে জার্মানদের আক্রমণ করা যাবে। আমার ভাই রবার্টও সেইরকম একটা দলের সঙ্গে মিলে প্রথমেই লাব্লিন ছেড়ে চলে গেছে। কিন্তু বাবাকে কিছুতেই রাজী করাতে পারলাম না। অনুরোধ, উপরোধ কোনো কিছুই বাবা কানে তুলতে নারাজ। আমাদের ছেড়ে এক পা নড়বেন না। তার জন্যে কপালে যা-ই থাকুক না কেন।

ইহুদীদের জন্য তখন নিত্যনূতন আইন কানুন তৈরী হচ্ছে। শেষ পর্যন্ত প্রত্যেকটি ইহুদীকেই জার্মানদের তালিকাভুক্ত হতে হয়। আর ওদের আদেশ অনুসারে হাতে তারা-চিহ্নিত সাদা আর্ম-ব্যাণ্ড বাঁধতে হয়। যাতে দেখলেই বোঝা যায় কে ইহুদী। এরপরে রাস্তাঘাটে প্রকাশ্যে বেরোনো আরো বিপজ্জনক হয়ে পড়ে। ইহুদী পুরুষ দেখলেই জার্মান সৈন্যরা ধরে নিয়ে গিয়ে ঘর, রাস্তার জমা বরফ অথবা নিজেদের বুট পরিষ্কার করায়। আর ছেলেমেয়েদের ধরতে পারলে পরিষ্কার করে মাথা কামিয়ে তবে ছেড়ে দেয়। যাতে ভবিষ্যতে ইহুদী বলে চিনতে এতোটুকু অসুবিধে না হয়।

স্বভাবতঃই বাবা-মা আমাকে বাড়ী থেকে বেরোনো দূরে থাক, জানালা দরজা দিয়ে উঁকি মারতে দিতেন না। কিন্তু মনের ভিতরকার কৌতূহল আর কতোদিন চেপে রাখা যায়! মাঝে মাঝে দরজার আড়াল থেকে দেখতাম, জার্মান সৈন্যরা রাস্তা দিয়ে মারচ্ করতে করতে এগিয়ে চলেছে। সামনে এলেই অবশ্য আমি দে ছুট। রাস্তা দিয়ে ইউনিফর্ম পরা কোনো জার্মান গেলে ইহুদীদের ওপরে আদেশ ছিলো রাস্তা ছেড়ে ফুটপাতে উঠে দাঁড়িয়ে মাথা নীচু করে সেলাম জানাতে হবে। আমি আইনটা জানতাম না। হঠাৎ রাস্তায় একটা জার্মান সৈনিকের মুখোমুখি পড়ে যাওয়াতে শুধু মাথাটা ঝুঁকিয়েছিলাম। আর সে-বয়েসে সব আইন পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে মেনে চলাটাও সম্ভব নয়। তার জন্য রাস্তার ওপরেই সৈন্যটা আমাকে নির্দয়ভাবে পেটায়। জামাকাপড় ছিন্নভিন্ন, কোনোরকমে খোঁড়াতে খোঁড়াতে বাড়ীতে ফিরে আসি আমি।

আইন অনুসারে কোনো ইহুদী ছেলেমেয়ের স্কুলে যাওয়া নিষিদ্ধ। পুরুষেরা কোনোরকম চাকরী করতে পারবে না। অথবা কোনো প্রফেশানে নিযুক্ত ইহুদীরা অর্থাৎ ডাক্তার, ইঞ্জিনীয়ার বা উকিল ইত্যাদি তাদের প্রফেশান চালিয়ে যেতে পারবে না। কিন্তু আমরা নিজেদের ছোট ছোট দলে ভাগ করে নিয়েছিলাম। ইউনিভার্সিটি তাড়ানো প্রফেসররা কোনো গুপ্ত জায়গায় আমাদের ক্লাস নিতো। অবশ্য এভাবে বেশীদিন চালানো যেতো না। জার্মানদের ভাড়াটে গুপ্তচরের দল ঠিক খবরটা ওদের কানে পাচার করে দিতো। আর তারপরেই আমাদের অবস্থা তাড়া খাওয়া কুকুরের মতো।

১৯৪০ সালের প্রথম দিকে আমাদের পরিচিত এক ডেন্টিস্ট লুকিয়ে একটা ছোট্ট দাঁতের ডাক্তারখানা খুললো। চেম্বারটা ছিলো বেডরুমে। যন্ত্রপাতি যা কিছু বিছানার নীচে লুকানো থাকতো, বোতল টোতল ভাঁড়ার ঘরে লুকিয়ে রাখতো। যদি কোনো জার্মান সৈন্য হঠাৎ এসে পড়ে। আমি ঘরে বসে বসে তখন হাঁপিয়ে উঠেছি। বাবা ডেন্টিস্ট ভদ্রলোককে বলে কয়ে রিসেপশানিষ্ট হিসেবে আমাকে রাখার জন্য রাজী করালেন। আমিও যেন হাঁফ ছেড়ে বাঁচলাম। হাত পা গুটিয়ে চুপচাপ বসে থাকার চেয়ে যতোটুকু কাজ শেখা যায়। এবং কাজ পেয়ে মুহূর্তগুলো যেন দ্রুত পেরোতে লাগলো। জীবনটাকে আর ততোটা একঘেঁয়ে পানসে বলে মনে হলো না। কয়েক মাসের মধ্যে হাতে কলমে বেশ কিছুটা কাজকর্ম রপ্ত করে ফেললাম।

কয়েকদিনের মধ্যেই আমাদের বাড়ীঘর ছেড়ে দিতে হলো। বিশেষ করে যেসব ইহুদী পরিবার হিটলার প্ল্যাট্জের নির্দিষ্ট গণ্ডীর মধ্যে থাকে। সব ইহুদী

পরিবারকেই শহরের পূর্বাঞ্চলে জড়ো হবার নির্দেশ দেওয়া হলো। অর্থাৎ শহরের পুবদিকটা পরিণত হলো ইহুদী ঘেটোয়। যাতে প্রয়োজন মাফিক সহজেই ইহুদীদের হাতের কাছেই পাওয়া যায়। তারপর চললো বাড়ী বাড়ী তল্লাশী। জার্মান সৈন্যরা পাখীর পালকের লেপ, ফার্নিচার অথবা রেডিও পেলেই বাজেয়াপ্ত করে নিতো। সবচেয়ে বেশী লোভ ছিলো জুয়েলারীর ওপর। একেবারে শকুনের দৃষ্টি। আমরা ইহুদীরাও হাত-পা গুটিয়ে বসে ছিলাম না। বাড়ীর ভেতরকার দেওয়াল ভেঙ্গে ভাঁড়ার ঘরে লুকোবার জন্য গুপ্ত দরজা তৈরী করা হলো। যাতে দরজার সামনে জার্মান সৈন্যদের বুটের শব্দ পেলেই সেই গুপ্ত স্থানে সেঁধিয়ে যেতে পারি। বিশেষ করে পুরুষেরা।

রাত্রিবেলা জার্মান সৈন্যরা কার্ফু জারী করলো। সন্ধ্যে সাতটার পর বাড়ী থেকে বেরোনো নিষিদ্ধ। দেখলেই গুলি। সুতরাং মাটির নীচ দিয়ে সুরঙ্গ খুঁড়ে পাশাপাশি বাড়ীতে যাওয়ার ব্যবস্থা হলো। রাস্তার ওপরের কোনো জানালায় দাঁড়িয়ে কেউ একজন রাস্তার দিকে নজর রাখত যে জার্মান সৈন্যরা আসছে কিনা। দেখলেই সংকেত দিতো, সামনে বিপদ। দিনের বেলা বিপদের সংকেতের জন্য এক টুকরো সাদা কম্বল নাড়তো, আর রাত্রিবেলা ফস্ করে জ্বালাতো একটা দেশলাই কাঠি।

বেঁচে থাকার জন্য খাওয়ার প্রয়োজন। কিন্তু উপার্জনের পথ তো বন্ধ। তবু যতো বাধানিষেধের নিগড় আসতে লাগলো, ততো যেন বাঁচার জন্য চ্যালেঞ্জটি খর হয়ে উঠলো, বাধা পেয়ে হঠাৎ লাফিয়ে ওঠা নদীর স্রোতের মতো।

সংবাদপত্র অথবা রেডিও না থাকায় যুদ্ধের খবরাখবর বলতে গেলে কিছুই পেতাম না। একমাত্র বাজারে যা গুজব চলতো তা-ই যা কানে আসতো। আর সে গুজবের ভিত্তি ছিলো জার্মানদের পরাজয়। খারাপ সংবাদ কে-ই বা শুনতে চায়! তবে জার্মানরা যুদ্ধে হারলে ওদের ব্যবহারেই সেটা প্রকট হয়ে উঠতো। যেমন বাধানিষেধের কড়াকড়িটা আরো বাড়তো। ক্রমে ক্রমে ইহুদী বাড়ীতে দুধ, ডিম এবং মাংস ঢোকা আইন করে বন্ধ হলো। বাড়ী তল্লাসীর সময়ে যদি এই নিষিদ্ধ বস্তুর কোনো একটাও পাওয়া যেতো, সঙ্গে সঙ্গে জার্মান সৈন্যরা পুরো পরিবারটাকে সঙ্গে নিয়ে যেতো। আর কোনোদিনই সে পরিবারটা ফিরে আসতো না। এর মধ্যে আবার হঠাৎ আদেশ জারী করা হলো, ইহুদী পরিবারের পক্ষে রান্নাবান্না করাও বে-আইনী। রান্নাবান্না করা অবস্থায় জার্মান সৈন্যরা হঠাৎ এসে হাতেনাতে ধরে ফেললে, পেনালটি অনুযায়ী টাকার বা জুয়েলারী দাবী করতো। চেয়ার টেবিল, খাট ইত্যাদি ফার্নিচার তো আগেই জার্মান সৈন্যদের

হাতে প্রায় প্রতিটি ইহুদী পরিবার খুইয়েছে। তবু কোনোরকমে এটা-ওটা জোগাড় করে নিত্যনৈমিত্তিক দৈনন্দিন জীবন-প্রবাহটাকে বহমান রাখা। সত্যি বলতে কি, জার্মানরা এতো চেষ্টা করেও আমাদের মেরুদণ্ডটাকে ভাঙতে সক্ষম হয় নি।

যুদ্ধের শুরুতেই রাশিয়া এগিয়ে এসে ইষ্টার্ণ পোল্যাণ্ড দখল করে নিয়েছিলো। তাই সীমান্তটা এগিয়ে এসেছিলো বাগ্ নদী বরাবর। সীমান্ত তখনো খোলা ; সেই খোলা সীমান্ত দিয়ে হাজার হাজার লোক জার্মান অধিকৃত অঞ্চল ছেড়ে দিয়ে রাশিয়ার অভ্যন্তরে নিজেদের চোরাই চালান করছে।

জীবন তখন পুরোপুরি যন্ত্রণা ; শেষপর্যন্ত বাবা আমাদের নিয়ে রাশিয়ার ভেতরে সরে যাওয়াই মনস্থ করলেন। কিন্তু গাড়ী তো দূরের কথা, ট্যাক্সিও পাওয়া যায় না। আর ট্রেনে চড়া অসম্ভব। আরো বেশী বিপজ্জনক। তাই অনেক ভেবে চিন্তে ঘোড়ার গাড়ীকেই বেছে নেওয়া হলো। অল্প যা কিছু ছিলো ঘোড়ার গাড়ীতে চাপিয়ে দিয়ে সাধারণ গরীব চাষাভূষোর সাজে গাড়ীতে চড়ে বসলাম, যাতে রাস্তায় আমাদের কেউ সন্দেহ না করে। গা-কেটে-বসা শীত আর তার ওপর স্যাঁতসেঁতে আবহাওয়া। রাস্তার অবস্থা শোচনীয়, জায়গায় জায়গায় ভেঙ্গে গিয়ে 'হাঁ' করা গর্ত, হাঁটু সমান বরফের কাদা। মাঝে মাঝেই গাড়ীর চাকা বসে যাচ্ছে। তখন আবার সবাই মিলে ঠেলেঠুলে গাড়ী ওঠানো। কী কষ্টকর সে যাত্রাপথ!

আমাদের গন্তব্যস্থল ডোরোহাস্ক। ছোট্ট গণ্ডগ্রাম। বাগ্ নদীর তীরে। জার্মান ও রাশিয়ান সীমান্তে। আমরা পৌছবার আগেই ছোট্ট গণ্ডগ্রামটা রিফ্যুজিতে উপচে পড়েছে। তিল ধারণেরও জায়গা নেই। কিন্তু আমাদের ভাগ্যাকাশে তখন কালো মেঘ জমেছে। ডোরোহাস্কে পৌছে শুনি মাত্র চব্বিশ ঘণ্টা আগে সীমান্ত বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে। খারাপ রাস্তায় বারবার আমাদের গাড়ীর চাকা বরফের কাদায় আটকে গিয়ে অনেক সময় নষ্ট হয়েছে। তা' না-হলে অনেক আগেই আমরা পৌছে যেতাম। তা'হলে এতোক্ষণে সীমান্ত পেরিয়ে নির্বিঘ্নে রাশিয়ায় পা রাখতে পারতাম। কিন্তু—।

এখন সামনে একমাত্র পথ খোলা, যদি কোনোরকমে নজর এড়িয়ে সীমান্ত পেরোনো যায়। কিন্তু তা'তে প্রতি পদে বিপদের আশংকা। ডোরোহাস্ক সীমান্ত গ্রাম হওয়াতে এপাশে জার্মান সৈন্য আর ওপাশে রাশিয়ান সৈন্য মোতায়েন। পালাতে গিয়ে জার্মান সৈন্যদের হাতে ধরা পড়া মানে তৎক্ষণাৎ মৃত্যু। আর রাশিয়ানদের হাতে ধরা পড়লে হয় জার্মানদের হাতে তুলে দেবে, না-হয় সঙ্গে

সঙ্গে গুলি করবে। নিদেন সাইবেরিয়ায় নির্বাসন তো নিশ্চিত।

কোনোরকমে ওদের চোখ এড়িয়ে যদি বা পালানো সম্ভব হয়, তবু এতো চওড়া নদী বাগ্ পেরিয়ে আরো প্রায় মাইল তিরিশেক হেঁটে নিকটবর্তী শহরে যাওয়া প্রায় অসম্ভব। তার ওপর সঙ্গে আবার বৃদ্ধা ঠাকুরমা। সুতরাং অনেকের মতো বাবাও নদীটা বরফে জমাট বাঁধা পর্যন্ত ভোরোহাস্কে থাকাই সাব্যস্ত করলেন। জমাট বাঁধার পরে শ্লেজ্ করে যদি পেরোনো যায়। ঠাণ্ডা পড়ে গেছে, তবু নদী জমাট বাঁধতে আরো কিছুদিন সময় লাগবে।

বর্তমানে আমাদের সামনে সবচেয়ে বড়ো সমস্যা, কোনোরকমে একটা ঠাঁই জুটিয়ে বেঁচে থাকার মতো একটা পথ খুঁজে বার করা। যদিও সীমান্ত বলে প্রচুর সৈন্যের জমায়েৎ তবু কপাল ভালো বলতে হবে যে, এখন পর্যন্ত গেস্টোপা বা এস্. এস্. বাহিনী এসে পৌছোয় নি। সবচেয়ে বড়ো সমস্যা আমাদের সঙ্গে রয়েছে, ধরা পড়লে আমরা যে ইহুদী তা' প্রকাশ পেতে বিলম্ব হবে না। সুতরাং প্রথমেই সে-সব কাগজপত্র গোপন কোনো জায়গায় সরিয়ে ফেলতে হবে।

বেঁচে থাকার রসদ জোগাড় করতে বাবা ভোরোহাস্ক গ্রামের কাছাকাছি একটা করাত কলে চাকরীর খোঁজ করতে গেলেন। বাবার মুখের জার্মান ভাষা শুনে করাত কলের জার্মান ইনচার্জ তো বাবাকে চাকরী দিতে তক্ষুণি রাজী। দোভাষীর কাজ। এ অঞ্চলের কোনো পোলিশই জার্মান ভাষা জানে না।

আমরা সবাই তখন রাশিয়ান ভাষা শিখতে ব্যস্ত। তা'ছাড়াও আমি সদাসর্বদা সীমান্তের দিকে নজর রাখি। কখন কারা পেট্রোল দিয়ে ফেরে, কখন দল বদলী হয় ইত্যাদি ইত্যাদি। দেখি রোজই একটা নির্দিষ্ট সময়ে আড়াআড়ি ফেলা একটা নৌকোয় সেতুর মুখোমুখি দাঁড়িয়ে জার্মান আর রাশিয়ান সৈন্যরা পরস্পর হ্যাণ্ডসেক করে আবার যে যার জায়গায় ফিরে যায়.।

গত পনেরো মাসের অভিজ্ঞতা আমার বয়েস যেন পনেরো বছর বাড়িয়ে দিয়েছে। সেই ছেলেমানুষী ভাব কেটে গিয়ে বুঝতে পেরেছি আমাদের চারপাশে অগ্নিবলয়। চরম বিপদের মুখোমুখি এসে আমরা দাঁড়িয়েছি। ফেলে আসা স্কুলের দিনগুলো, খেলাধুলা যেন কতকাল আগেকার ব্যাপার। পুরো অতীতটাই বিস্মরণে। তার পরিবর্তে বর্তমানে আমার কাজ হলো চোখ-কান প্রতিটি মুহূর্তে খুলে রাখা। যাতে কোনো শব্দ বা ছায়া নজর না এড়ায়। রাত্রে আমার কাজ ছিলো ঝোপের আড়ালে হামাগুড়ি দিয়ে লুকিয়ে থেকে-

সৈন্যদের টহল পর্যবেক্ষণ করা। কখন ওদের বদলী হয়, কোথায় ওরা দাঁড়িয়ে বিশ্রাম নেয়, ইত্যাদি ইত্যাদি। যাতে পালানোর জন্য সঠিক জায়গাটা খুঁজে বার করা যায়। প্রত্যেক রাতেই রাতের অখণ্ড নিস্তব্ধতাকে চিরে একটানা গুলির শব্দ পেতাম। পলায়মান রিফ্যুজিদের লক্ষ্য করে জার্মান অথবা রাশিয়ান সৈন্যদের এই গুলিবৃষ্টি এড়িয়ে ক'জন যে পালাতে সক্ষম হতো বলা মুশকিল।

একদিন রাত্রে আমরা তখন ঘুমন্ত, টহল দিতে দিতে একটা জার্মান সৈন্য হঠাৎ আমাদের ঘরে এসে উপস্থিত। আমরা বিমূঢ় হলেও বাবা সবসময় এ ধরনের পরিস্থিতির মোকাবেলার জন্য প্রস্তুত থাকতেন। জার্মান সৈন্যটি আমাদের পরিচিত কাগজপত্র দেখতে চাইলে, বাবা সঙ্গে সঙ্গে একটা সার্টিফিকেট এনে ওর হাতে দেন। বলাবাহুল্য, অনেক কষ্টে এই জাল কাগজপত্র জোগাড় করা হয়েছিলো। যাতে লেখা, আমরা জার্মান; বাবা অষ্ট্রিয়ান আর্মিতে অফিসার হিসেবে বেশ কিছুদিন কাজ করেছেন। কাগজপত্র দেখে আর বাবার মুখের চোস্ত জার্মান শুনে সঙ্গে সঙ্গে সৈন্যটি 'হাইল্ হিটলার' বলে সেলাম ঠুকে এখানে এ অবস্থায় পড়ে থাকার কারণ জিজ্ঞাসা করে। আগে থাকতেই বাবা পটভূমিকা তৈরী করে রেখেছিলেন যে, 'ফাদারল্যাণ্ড' অর্থাৎ জার্মানিতে ফেরার পথে যানবাহনের অভাবে হঠাৎ এখানে আটকা পড়ে গেছি আমরা। যদি জার্মান সৈন্যটি কোনোরকম সাহায্য করতে পারে, তবে বড়ো কৃতজ্ঞ থাকবো। বিরক্ত করার জন্য বাবার কাছে ক্ষমা চেয়ে, যতোদূর পারা যায় আমাদের সাহায্য করার প্রতিশ্রুতি দিয়ে সৈন্যটা দ্রুত প্রস্থান করে। সমস্ত ব্যাপারটাতে আমাদের হাসি পায়। গেষ্টোপা অর্থাৎ নাৎসী কেউ হলে এতো সহজে বোকা বানিয়ে তার হাত থেকে নিস্তার পাওয়া যেতো না নিশ্চয়ই।

তবু এ ঘটনাটা যেন আমাদের নাড়া দিয়ে গেলো। নাৎসী গেষ্টোপারা আসার আগেই আমাদের যেমন করে হোক এখান থেকে পালাতে হবে। বাবা-মাও ভাই রবার্টের সঙ্গে মিলিত হবার জন্য অধীর। আমরা শেষ সংবাদ পেয়েছিলাম যে রবার্ট লোভভ্ শহরে আছে। আপ্রাণ চেষ্টা করছে ইংল্যাণ্ডে গিয়ে বার্মিংহামে আমাদের আত্মীয় স্বজনের সঙ্গে মিলিত হবার। বাবা-মা আশা করে বসে আছেন যে রবার্ট তখনো লোভভেই আছে। তাই ও শহরে যেতে পারলে আমরা সবাই আবার একজায়গায় মিলিত হতে পারবো। সেই কারণেই বাবা যতো তাড়াতাড়ি সম্ভব সীমান্ত পেরোতে উদ্‌গ্রীব।

স্থানীয় একজন লোককে টাকা পয়সা দিয়ে গাইড হতে রাজী করিয়ে পরের

দিন রাত দুটোর সময় বেরিয়ে পড়লাম। ঘুটঘুটে অন্ধকার। একহাত দূরের জিনিসও দেখা যায় না। আমাদের পরনেও মিশ্‌কালো পোষাক। যাতে অন্ধকারে সীমান্তরক্ষীরা চিনতে না পারে। বাগ্‌ নদীর ওপরে বরফ জমেছে। কিন্তু ঘোড়া টানা শ্লেজ্‌ পার হবার মতো বরফ কঠিন হয়েছে কিনা কে জানে! একটু দূরে যেতেই হঠাৎ গুলির শব্দ। ঝাঁকে ঝাঁকে আমাদের মাথার ওপর দিয়ে গুলি চলে গেল। অর্থাৎ, সীমান্তরক্ষীবাহিনী টের পেয়ে গেছে। শ্লেজ্‌ গাড়ীটার নীচে সবাই মিলে শুয়ে পড়লাম। ঘোড়াগুলো অল্পের জন্য বেঁচে গেল। নেহাৎ কপাল জোরে আমরা সেই গুলিবৃষ্টির হাত থেকে রেহাই পেয়ে আবার ফিরে আসা মনস্থ করলাম।

ডোরোহাস্কে থাকা আব নিরাপদ নয়। জার্মান সৈন্যরা তখন সীমান্ত অঞ্চল খালি করছে। সিভিলিয়ানদের পেছনে সরিয়ে দিচ্ছে। আমরা এ অবস্থায় থাকলে ধরা পড়ে যাওয়ার যথেষ্ট সম্ভাবনা। নদী পার হবার চেষ্টা করা আর উচিত হবে না ভেবে বাবা সবাইকে নিয়ে লাব্‌লিনে ফিরে যাওয়াই মনস্থ করলেন। যদিও লাব্‌লিনে ফিরে যেতে মন চাইছিলো না। লাব্‌লিনের প্রতি মন জুড়ে একটা প্রচণ্ড বিকর্ষণ। তবু বন্ধু-বান্ধব বলতে দু'চারজন তখনো লাব্‌লিনে আছে। আর বিদেশ বিভূঁয়ে অপরিচিতদের মধ্যে থাকার চেয়ে পরিচিতদের মধ্যে থাকা অনেক বেশী নিরাপদ।

লাব্‌লিনে ফিরে এসে এ-ক'দিনেই প্রচুর পরিবর্তন হয়ে গেছে। ইহুদীদের ওপরে বাধা নিষেধের কড়াকড়ি আরো বেড়েছে। নির্দিষ্ট অঞ্চল ছেড়ে বেরোনো নিষিদ্ধ। ইহুদী ঘেটোগুলো ফাঁকা। যে ক'জন আছে, তারাও বাড়ী থেকে এক পা বেরোয় না। খাওয়া দাওয়া বলতে কিছু মেলা ভার। ইহুদীদের বাড়ী থেকে ফার্নিচার, জুয়েলারী প্রভৃতি সবকিছু জার্মানরা চেটেপুটে নিয়ে গেছে।

এসব অসুবিধা সত্ত্বেও দেখলাম কেউ-ই মুষড়ে পড়ে নি। বরং পুরো জিনিষটাকেই চ্যালেঞ্জ হিসেবে নিয়েছে সবাই। মা ইংরেজী টিচার। উঠে পড়ে লেগে গেলেন ছাত্র জোগাড় করতে। ইংরেজী জার্মানদের শত্রুর ভাষা বলে সবার আগ্রহ ইংরেজী শিখতে। মা'র ছাত্র-ছাত্রীর মধ্যে সবাই যে ইহুদী তা' নয়। অনেক তথাকথিত 'আর্য' ছাত্র-ছাত্রীও আছে। সাধারণতঃ ইহুদীদের ঘেটো থেকে বেরিয়ে শহরের অন্য অঞ্চলে যাওয়ার সময়ে মা হাতের ব্যাজ খুলে যেতেন। যাতে রাস্তায় ঘাটে কেউ ইহুদী বলে চিনতে না পারে। আবার ফেরার সময়ে ঘেটোর গেটের মধ্যে ঢুকে ব্যাজটা হাতে পরে নিতেন।

কতো বিপদ মা ঘাড়ে নিয়ে চলাফেরা করতেন তা' ভাবতেও শিউরে উঠতাম। যে কোনো মুহূর্তে ধরা পড়ে যাওয়ার সম্ভাবনা। আর ধরা পড়লে — ।

মা'র ছাত্রদের মধ্যে একজন ছিলো রোমান ক্যাথলিক পাদ্রী। ফাদার ক্রামোস্কি। লাব্লিন শহরে এঁর যথেষ্ট প্রতিষ্ঠা। মাকে ফাদার প্রতিজ্ঞা করিয়ে নিয়েছিলেন, কোনোরকম বিপদে পড়লে মা যেন নিশ্চয়ই তাঁব স্মরণ করে। ফাদার সপ্তাহে তিন দিন ইংরেজীর পাঠ নিতেন। গীর্জাটা ছিলো নাৎসীদের হেড কোয়ার্টারের উল্টোদিকে। মা বেরিয়ে যাওয়ার পর আমার আর বাবার কাটতো চরম উৎকণ্ঠায়। মা ঘরে না ফেরা পর্যন্ত। কে জানে আদৌ ফিরবে কিনা আর!

অন্ধকার কালো মেঘটা যেন আমাদের জীবনটাকে চাবিদিক থেকে ঘিরে ফেলেছে। যে কোনো মুহূর্তে এগিয়ে আসতে পাবে। যদিও আইনত ঘেটোর বাইরে যাওয়ার নিয়ম নেই, তবু আমাদের সঙ্গে বাইরের সংযোগ অক্ষুণ্ণ আছে। যে পথ দিয়ে খাদ্যদ্রব্য ঘেটোর ভেতরে আসে, সেই পথ দিয়েই ইহুদীরা বাইরে বেরিয়ে উপার্জন করে। নইলে পেট চলবে কী করে? কিন্তু যে কোনো মুহূর্তে ঘেটোর দরজা বন্ধ হয়ে যেতে পারে। তার মানেই নিশ্চিত মৃত্যু। ভারসাউ ঘেটোর দরজা এমনি হঠাৎ একদিন বন্ধ করে দিয়েছে গেষ্টাপোরা। অতি অল্প সংখ্যক ইহুদী সেই ঘেটো থেকে প্রাণে বেঁচে পালাতে পেরেছে।

শেষ পর্যন্ত আমাদের আশংকাটাই সত্যি হলো। হঠাৎ লাব্লিন ঘেটোর চারপাশটা সশস্ত্র জার্মান সৈন্যরা ঘিবে ফেললো। হাতে তৈরী মেসিনগান। প্রত্যেক রাস্তার মোড়ে ট্যাংক প্রস্তুত। বিদ্যুতের মতো খবরটা ঘেটোতে ছড়িয়ে পড়লো। পুরো ঘেটোতে আতংক, কান্না, আর্তনাদে কান পাতা দায়। তার মধ্যেই জার্মান সৈন্যরা ঘরে ঘরে ঢুকে সবাইকে ঠেলে ঠুলে রাস্তায় জড়ো করছে। একই পরিবারের সবাই বিক্ষিপ্ত। কে কোথায় ছিটকে গেছে কে জানে! 'বিছানা জামাকাপড় ইতস্তত ছড়ানো। নির্দিষ্ট সংখ্যায় জড়ো হলেই সৈন্যরা চাবুক মারতে মারতে নিয়ে যাচ্ছে। কেউ জানে না কোথায়! সম্ভবত এ জীবনে কেউ আর কারোর দেখাও পাবে না।

বরাত জোরে পরপর তিনবার কোনোক্রমে আমরা রক্ষা পেলাম। প্রথমবারে, বাবার সেই অষ্ট্রিয়ান আর্মিতে কাজ করার সার্টিফিকেট একটা জার্মান সৈন্যকে দেখাতে একটা খালি বাড়ীতে দয়া করে সৈন্যটা আমাদের ঠেলে দেয়। দ্বিতীয়বারে, সেই বাড়ীতেই একটা গোপন আস্তানায় লুকিয়ে থেকে। আর তৃতীয়বারে অন্যান্য ইহুদীদের সঙ্গে লরীতে তোলার ঠিক আগের মুহূর্তে আমরা

দলছুট হয়ে পালিয়ে গিয়ে রাস্তার পাশে জড়ো করা বিছানাপত্তরের নীচে একাদিক্রমে বেশ কয়েক ঘণ্টা লুকিয়ে থেকে। তারপর যখন লরীগুলোকে নিয়ে সৈন্যরা ঘেটো ছেড়ে চলে গেল, আমরা বেরিয়ে এসেছিলাম। লরীগুলো ঘেটো ছেড়ে বেরিয়ে যেতেই আমরা ঘেটো ঘুরে দেখতাম কে নেই। বেশীর ভাগ বাড়ীই খালি। দু'চারজন ছুটছাট পালিয়ে লরীগুলোকে এড়াতে পেরেছে। অনেক পরিবারেরই স্ত্রী সহ ছেলেমেয়েদের নিয়ে গেছে; স্বামী একা। অথবা এর উল্টোটা। অবশ্য ঘেটো ফাঁকা থাকে না। কয়েকদিন পরেই লাব্লিনের পার্শ্ববর্তী শহর বা গ্রাম থেকে নতুন ইহুদীদের তাড়িয়ে এই ঘেটোতে এনে জড়ো করা হয়। আমাদের পরিচিত সবাইকেই প্রায় নিয়ে গেছে। পরের কয়েক সপ্তাহ আমরা কখনো এক জায়গায় একটা রাতের বেশী থাকি নি। বলা যায় না, কখন ধরা পড়ে যাই। এক সময় স্থির হলো, বাঁচতে যদি হয় তবে এই মুহূর্তেই শহর লাব্লিন ছেড়ে পালানো উচিত। হাতের ব্যাজ্ খুলে সাহসে ভর করে ঘেটোর গেট দিয়ে সোজা বেরিয়ে গেলাম। ভাগ্যিস্ কেউ আমাদের সঙ্গের কাগজপত্র চেক্ করে নি! নইলে সেদিনই সোজা যমালয়ে। যাইহোক, ঘেটো থেকে বেরিয়ে আমরা সোজা দক্ষিণ দিকে হাঁটা দিলাম। যদি ভাগ্যক্রমে কোনো অঞ্চলে থাকার মতো একটা আশ্রয় জোটাতে পারি।

আমাদের সঙ্গে একজিট্ পারমিট ছিলো না। এই একজিট্ পারমিট ছাড়া কোথাও দু' রাতের বেশী থাকা আইনত দণ্ডনীয়। আর এটা দেখাতে না পারলে যে কোনো মুহূর্তে গেষ্টাপোরা এ্যারেষ্ট করতে পারে। অবশ্য কোনো অবস্থাতেই ইহুদীদের এই পারমিট দেওয়া হয় না।

হাঁটতে হাঁটতে লাব্লিনের মাইল তিরিশেক দূরে এসে একটা গ্রাম পেলাম। ঝাভিয়া ভোলা। পুরো গ্রামটাতে মুষ্টিমেয় ইহুদী পরিবারের বাস। সর্বসাকুল্যে, উনিশ ঘর। কাছাকাছি শহর থেকে ইহুদীরা আসায় গ্রামটা রিফ্যুজিতে উপচে পড়ার জোগাড়। আমরা এখানেই স্থিতু হবো স্থির করলাম। সারাদিন একটা ঠাঁই জোটাবার জন্য ঘোরাঘুরি করে বাবা একটা দোকানের সামনের দিকের একফালি একটা ঘর জোটাতে সক্ষম হলেন। সেই জায়গাতেই কয়েক ঘণ্টার মধ্যে আমরা আমাদের সংসারটা গুছিয়ে নিলাম। মা আশে পাশের অঞ্চলে খোঁজে বেরোলেন যদি বা ইংরেজী শেখানোর বদলে জীবন ধারণের মতো খাবার জোটানো যায়। পাশের অঞ্চলের একজন ছোট্ট জমিদার কাউন্ট ব্রেজা মাকে সাদরে আহ্বান জানালো। তার বাড়ীঘরও তখন রিফ্যুজিতে ভরে গেছে। অবশ্য ইহুদী নয়। বাগ্ নদীর পূর্বপ্রান্ত রাশিয়ার ভাগে পড়ায়

পোলিশ বড়ো বড়ো জমিদার, কাউন্ট, রাজা এবং ব্যারণ ইত্যাদি সবাই এদিকে পালিয়ে এসেছে। আমরা আপ্রাণ চেষ্টা করছি কোনোরকমে প্রাণ নিয়ে রাশিয়ায় পালাতে। আর এরা কোনোক্রমে প্রাণ নিয়ে রাশিয়া ছেড়ে পালিয়ে এসেছে। ভাগ্যের কী নিদারুণ পরিহাস! যাই হোক্, বর্তমানে এদের করণীয় কিছু নেই দেখে সবাই ইংরেজী শিখতে ঝুঁকলো। মা তখন ক্লান্ত, পার্শ্ববর্তী আরো তিনটে অঞ্চলে টিউশনি শুরু করেছেন। এর ফলে মাকে হাঁটাহাঁটিও কম করতে হচ্ছে না। জায়গাগুলো বেশ দূরে দূরে ছড়ানো। তা'ছাড়া বিপদ্জনকও বটে। এদিকটাতে জার্মান সৈন্যরা সব সময় টহল দিয়ে ফিরছে। ধরা পড়া মানেই মৃত্যু। নেহাৎ-ই ভাগ্যেব জোর যে মা তাদের নজরে পড়ে নি। ইতিমধ্যে কাউন্ট ব্রেজা বাবাকে তার নিজস্ব লাইব্রেরীর লাইব্রেরীয়ান করে নিয়েছে। আর আমি ছোট ছোট ছেলেমেয়েদের জড়ো করে পড়াশোনা শেখাচ্ছি। মাঝে মাঝে খামারে কাজ করি। চাষের জন্য জমি তৈরী, বীজ বোনা ইত্যাদি ইত্যাদি।

আমাদের রোজকার প্রয়োজন মতো রুটি জোগাড় করতে সক্ষম হয়েছি দেখে ভেবেছি যুদ্ধ শেষ না হওয়া পর্যন্ত এখানেই স্থিতু হবো। কিন্তু বিধাতা পুরুষ বোধহয় আমাদের মনের ভাবনার থই পেয়ে অলক্ষ্যে হেসেছেন। ক'দিন পরেই একদল জার্মান সৈন্য এসে হাজির। এ ঘটনাব পুনরাবৃত্তি কয়েকদিন পরপরই। আজ তাদের দশ ডজন ডিম চাই, অথবা দশ জোড়া চামড়ার বুট। ক'দিন পরে আবার জুয়েলারী বা টাকা। তা'ও জোগাড করে দিতে হয় ওদের বেঁধে দেওয়া সময় অর্থাৎ বারো বা চব্বিশ ঘণ্টার মধ্যে। নইলে অনির্দিষ্ট গন্তব্যস্থলের দিকে মারচিং অর্ডার। জার্মান সৈন্যরা গেলেই আমাদের মধ্যে একজন বাড়ী বাড়ী বেরিয়ে পড়ে চেয়ে যাওয়া জিনিষ জোগাড করতে। যাতে জিনিষগুলো সময় মতো জুগিয়ে ওদের সন্তুষ্ট করা যায়।

সেদিন আতংকটা ছড়িয়ে পড়লো। জার্মানরা বিরাট একটা টাকার অংকের দাবী নিয়ে এসেছিলো। যদিও ওরা জানতো এ অবস্থাতে আমাদের পক্ষে এতো বিরাট টাকার অংক জোগাড় করা অসম্ভব! সুতরাং ওরা টাকা নিতে এলে জোগাড় হয় নি দেখে নিশ্চয়ই আমাদের ওপর মারচিং অর্ডার দেবে। খাঁই আর কতো মেটানো যায়! আমরা জানতাম খাঁই আমরা কোনোদিনই মেটাতে পারবো না, আর আমাদেরও নিয়ে যাবে। তবু কপাল জোর যে ওরা সেই মুহূর্তেই আমাদের নিয়ে যায় নি।

আমরা মনস্থির করে ফেললাম। সামনে জীবন মরণের প্রশ্ন। বাঁচতে

হলে এখনই গ্রাম ছেড়ে পালানো দরকার। সেই ভয়াবহ রাত্রে কেউ জামা-কাপড় ছেড়ে শুতে যায় নি। প্রতিটি মুহূর্তের মোকাবেলার জন্য প্রস্তুত। বেশীর ভাগ যুবকই রাতের অন্ধকারে কাছাকাছি গভীর জঙ্গলে পালিয়ে যায়। বাবাও মনস্থির করে ফেলেন। যেমন করে হোক্, দিনের আলো ফোটার আগেই আমাদের পালানো উচিত। যাতে অন্ধকার থাকতে থাকতে বেশ কয়েক মাইল দূরের জঙ্গলটায় নির্বিঘ্নে পৌঁছানো যায়।

শেষ পর্যন্ত স্থির হলো ঠাকুরমাকে এখানে রেখে যাবো। ১৯৪১ সালের আগষ্ট; এতোদিন পর্যন্ত আমবা সবাই একসঙ্গে ছিলাম। কিন্তু এব পরে আমাদের সপ্তাহের পর সপ্তাহ, মাসের পর মাস জঙ্গলে মাইলেব পর মাইল ঘুরতে হবে। ঠাকুমার পক্ষে যেটা আদৌ সম্ভব নয়। যদিও জানতাম পেছনে কাউকে রেখে যাওয়া মানেই চিবদিনের জন্য তাকে হারানো। তবু কী করা?

তখন ঘন অন্ধকার। আমবা নিঃশব্দে গ্রাম ছেড়ে বেরিয়ে পড়লাম। জার্মান সৈন্যবা মেসিনগান হাতে সারা গ্রামটাকে ঘিরে ফেলেছে দেখে গ্রামের পাশের ভুট্টা ক্ষেতে নামলাম। ভুট্টা গাছগুলো উঁচু আর ঘন বলে সহজেই গা ঢাকা দিয়ে জঙ্গলের দিকে এগিয়ে চলি। জঙ্গলে পৌঁছেও নিস্তার নেই। মাঝে মাঝে জার্মান সৈন্যবা জঙ্গলে তল্লাসী চালাচ্ছে, তার ওপর ওয়াচ্ ডগ্ তো আছেই। সুতরাং যতোটা পাবা যায় গভীর জঙ্গলেব দিকে এগোই। কিছুক্ষণ পরে উঁচু একটা ডাঙ্গা দেখে সবাই শুয়ে পড়ি। একে তো সারাটা রাত দু' চোখের পাতা এক করিনি, উপরন্তু মানসিক উত্তেজনা। তখন ক্লান্তির শেষ সীমানায় এসে পৌঁছেছি। ওখান থেকে বহুদূরে অস্পষ্ট ফেলে আসা গ্রাম ঝাভিয়া ভোলা দেখা যাচ্ছে। একটু পরে শুনতে পেলাম মেসিনগানের একটানা কট কট শব্দ। সেই সঙ্গে মানুষের মরণ আর্তনাদ, বাঁচার জন্য প্রাণপণে চিৎকার। এক সময় সব নিথর, নিস্তব্ধ হয়ে এলো। বুঝতে পারলাম সব শেষ হয়ে গেছে। তখন মাত্র পুবেব আকাশে আলোর ইসারা দিচ্ছে।

বাবা স্থির করলেন কোনো কিছু ঠিক না হওয়া পর্যন্ত এখানেই থাকবো আমরা। পোলিশ আণ্ডার গ্রাউণ্ড মুভ্‌মেন্টের লোক আমাদের খুঁজে পেতে বের করে উদ্ধার করবে, এ আশা দুরাশা। খাদ্য বা পানীয় বলতে একমাত্র ভরসা ষ্ট্র-বেরী। যা বনে জঙ্গলে অনাদৃত ভাবে নিজে থেকে প্রচুর জন্মায়।

আমাদের সেখানে রেখে মা একাই এদিক ওদিক ঘুরতে বেরোলেন। যদি বা কোনো একটা পথ খুঁজে বার করা যায়! বনের সীমানা পেরিয়ে একটু দূরে বেশ বড়োসড়ো গোছের একটা জমিদারী। তার মালিক আবার মা'র আগের

পরিচিত। লর্ড মানো। মাকে দেখে লর্ড খুব খুশী হলেন। গ্রাম ছেড়ে আমাদের জঙ্গলে পালানোর খবরে ভদ্রলোক বেশ মুষড়ে পড়েছিলেন। আমাদের সাহায্য করার খবর যদি কোনোরকমে জার্মানরা জানতে পারে, তবে নির্ঘাত মৃত্যুদণ্ড, এটা জেনেও লর্ড মানো আমাদের দিকে সাহায্যের হাত বাড়াতে এতোটুকু দ্বিধা করলেন না। প্রায় মাইল বারো জঙ্গলের ভেতরে ওঁর একটা 'হান্টিং লজ্' ছিলো। সেখানেই আমাদের পাঠাতে মনস্থ করলেন। কিন্তু জঙ্গলের ভেতর দিয়ে বারো মাইল পথ যাওয়াটাও তো আমাদের পক্ষে কম বিপদজনক নয়। আর এতোটা পথ হাঁটার পক্ষে শরীর এবং মন, দুটোর কোনোটাই উপযুক্ত নয়। তার ওপর ছেঁড়া কাপড়চোপড, দাড়ি না কামানো বাবার মুখ, নোংবা বেশবাসে আমাদেব দেখলেই যে কেউ সন্দেহ করবে, সারারাত কখনো বুকে হেঁটে, কখনো বা নীচু হয়ে জঙ্গলের ভেতর দিয়ে চলাব জন্য দিনের বেলায় ঝিমুনি আসতো। পথচারীদেব সঙ্গেও কথা বলার উপায় নেই। সুতবাং নিজেরা পথ খুঁজে নিয়েই এগোতে লাগলাম। কী কষ্টকর! যন্ত্রণাদায়ক! মাঝে মাঝে সশস্ত্র জার্মান সৈন্যরা টহল দিয়ে বেডাচ্ছে। তাদেব নজরে পডলে আর রক্ষে নেই। নিশ্চিত মৃত্যু।

সেদিনের কথাটা আমাব স্পষ্ট মনে আছে। হঠাৎ আমি খুব অসুস্থ হয়ে পড়লাম! জ্বরটা জেঁকে এলো। বাবা আমাকে ঘাড়ে তুলে নিয়ে কোনোরকমে এগিয়ে চললেন। কিছুটা পথ এগোতে ফরেষ্টাবের সঙ্গে দেখা। লর্ড মানোরের আদেশ অনুযায়ী ফরেষ্টার আমাদের হান্টিং লজে নিয়ে যাবে। ফরেষ্টারের সঙ্গে দেখা হওয়ায় এতোক্ষণে একটু ভরসা পেলাম। মনের ভেতরে খুশীর ময়ুব নেচে উঠলো। যেন অন্ধকার সমুদ্রে দিক হারানো নাবিক আলো ঝলমলে লাইট্ হাউসের দেখা পেয়েছে।

ফরেষ্টার আমাদের হান্টিং লজে নিয়ে এসে চিলে কোঠাব একগাদা খড়েব মধ্যে লুকিয়ে রাখলো। যাতে কেউ টের না পায়। এর পরের ক'দিন কী ঘটে গেছে কিছুই জানি না। খালি পড়ে পড়ে ঘুমিয়েছি। কিন্তু ওদিকে আমাদের পথের ওয়াচ্ ডগ্‌গুলো ঠিক হান্টিং লজ্ খুঁজে বার করেছে। পেছনে পেছনে জার্মান সৈন্য। কিন্তু আমাদের খুঁজে না পেয়ে জার্মান সৈন্যরা ফরেষ্টারকে বারবার সাবধান করে দিয়েছে, যদি হান্টিং লজে সত্যি কোনো ইহুদী লুকিয়ে থাকে, তবে আগে ভাগেই ফরেষ্টারকে গুলি করা হবে। পরের দিনই লর্ডের কাছ থেকে খবর নিয়ে লোক এসে হাজির। আমাদের আর এখানে থাকা নিরাপদ নয়; সুতরাং হান্টিং লজ্ ছেড়ে আবার পথে বেরিয়ে পড়ি।

আমাদের তখন হালভাঙা নৌকোর মতো অবস্থা। বনবাদাড় ভেঙে এদিক ওদিক উদ্দেশ্যবিহীন ভাবে ঘুরে বেড়াচ্ছি। শেষে একসময় শ্রান্তির চরম সীমায় পৌঁছে রাস্তার ধারে বসে পড়লাম। বাবাও এতোদিনে তাঁর মানসিক দৃঢ়তা হারিয়ে ফেলেছেন। ভাবনার খেই হারিয়ে যখন আমাদের শেষ অবস্থা, — ঠিক তখনই বাবা আরেকটা পথ খুঁজে পেয়ে আনন্দে লাফিয়ে উঠলেন। হ্যাঁ, বাবার মাথায় আবার একটা প্ল্যান এসেছে। বাবা তক্ষুণি ঠিক করলেন যে লাব্‌লিনে ফিরে যাবেন। সেই ক্যাথলিক ফাদার ক্রামোস্কিকে ধরে যদি আমাদের নতুন করে বার্থ সার্টিফিকেট নিতে পারেন, তবে সেই নতুন বার্থ সার্টিফিকেট দেখিয়ে আমরা আমাদের জন্য পরিচিত-পত্রও সংগ্রহ করতে পারবো। এছাড়া আর কোনো পথ খোলা নেই।

কিন্তু তিনজনে একসঙ্গে শহর লাব্‌লিনে গেলে নিশ্চয়ই ধরা পড়ে যাবো। আমাদের কাছে কয়েক মাইল দূরের জমিদার ব্যারন টারনুসের জন্য একটা পরিচয়-পত্র ছিলো। তাই স্থির করলাম কয়েকদিনের জন্য আমরা ব্যারন টারনুসের জমিদারীতে গিয়ে আশ্রয় নেবো ; আর বাবা ইতিমধ্যে লাব্‌লিনে ফিরে গিয়ে ফাদার ক্রামোস্কির কাছ থেকে নতুন সার্টিফেকেট জোগাড় করে নিয়ে এসে আমাদের সঙ্গে ব্যারনের জমিদারীতে মিলিত হবেন, যদিও জানতাম ব্যারন আমাদের ততোটা আন্তরিকতার সঙ্গে গ্রহণ করবেন না। এই অবস্থায় ব্যারন কেন, কেউ-ই দায়িত্ব নিতে চান না। তবু কী করা? সঙ্গের সমস্ত কাগজপত্র ছিঁড়ে ফেললাম আমরা।

যা ভেবেছিলাম ঠিক তাই। ব্যারন আমাদের খুব ভালোভাবে নিলেন না। তাঁর বাড়ীও রিফ্যুজিতে ভর্তি। তবু কয়েকদিনেব জন্য ব্যারন আমাদের আশ্রয় দিতে রাজী হলেন। আর ঠিক সেই সময়েই আমি জন্‌ডিস রোগে শয্যাশায়ী হলাম। এটাও ভাগ্যই বলতে হবে। নইলে ব্যারন ক'দিনের মধ্যেই আমাদের তাড়াতে উদ্‌গ্রীব থাকলেও আমার অসুস্থতার জন্যই পারেনি। তবু যতো তাড়াতাড়ি সম্ভব আমাদের বিদায় হওয়ার জন্য একজন ডাক্তারের তদারকি, ভালো খাওয়া দাওয়া আর বিশ্রামে আমি সুস্থ হয়ে উঠলাম।

কয়েকদিন পরে গোপন পথে বাবার কাছ থেকে খবর পেলাম আমরা যেন লাব্‌লিনে এসে ফাদার ক্রামোস্কির গীর্জায় মিলিত হই। দিন কয়েকের বিশ্রামে তখন আমাদের অনেক উজ্জ্বল আর সপ্রতিভ দেখাচ্ছে। কাগজপত্র ছাড়াই আমরা লাব্‌লিনে যাওয়ার ট্রেনে চড়ে বসলাম। ব্যাপারটা যদিও খুব বিপজ্জনক। একে তো আইডেনটিটি কার্ড ছাড়া পথ চলা নিষিদ্ধ। তার ওপর সাধারণ

একজন জার্মান সৈন্যও যে কোনো মুহূর্তে আইডেনটিটি কার্ড দাবী করতে পারে। আর দেখাতে না পারলেই —।

যাইহোক, লাব্‌লিনে পৌঁছে দেখি ঘেটো বন্ধ। রাস্তায় ঘাটে হাতে ব্যাজ বাঁধা ইহুদী দেখা যায় না। গেস্টাপো হেড কোয়ার্টার্স পেরিয়ে আমরা অন্য অঞ্চলে এলাম। এতোদিন পরে বাবার দেখা পেয়ে মনটা খুশীতে ভরে উঠলো। বাবা নতুন বার্থ সার্টিফিকেট আর আইডেনটিটি কার্ড নিয়ে বাড়ীর পেছনদিকের কয়লা রাখার ঘরে একদিন লুকিয়ে ছিলেন। যদি হঠাৎ কোনো জার্মান সৈন্য তল্লাসী চালায়, এই ভয়ে।

জন্মপত্রিকায় আমার নামকরণ করা হলো লিকাডিয়া ডোভ্‌রাজিস্কা। বয়েসও আলাদা। নিজের নতুন নাম পড়ে আমার তো হাসতে হাসতে পেট ফাটার জোগাড। মা'র নাম দেওয়া হলো মিসেস স্যালেস্কা। এখন থেকে মিসেস স্যালেস্কা আর আমার মা নন; কাকীমা। নতুন বার্থ সার্টিফিকেট অনুসারে বাবার সঙ্গে আমাদের কোনো সম্পর্ক নেই। প্রথমে ভেবেছিলাম, কোনো অবস্থাতেই আমরা পরস্পবের থেকে আলাদা হবো না। মরতে যদি হয়, একসঙ্গেই মরবো। কিন্তু শেষপর্যন্ত ফাদারের অনুরোধ মেনে নিতে হলো। আর সত্যি বলতে কি, আমাদেব চিন্তাধারা যদি জোর করে বজায় রাখি, তবে মরা ছাড়া পথ নেই। বরং ফাদারের উপদেশ মানলে বাঁচলেও বাঁচতে পারি।

পরের ক'দিন সেই কয়লা রাখার ঘরেই আমার নতুন বার্থ সার্টিফিকেট অনুযায়ী আমাদের স্ব স্ব জীবনবৃত্তান্ত মুখস্থ করতে ব্যস্ত থাকলাম। জন্ম তারিখ, জন্মস্থান, পিতামাতার পরিচয়, স্কুলের নামধাম ইত্যাদি ইত্যাদি। একেবারে পাকা হওয়া চাই! যাতে কেউ জিজ্ঞাসা করলে এতোটুকু মুখে না আটকায়। সড়গড় না হওয়া পর্যন্ত বাবার স্বস্তি নেই।

ইতিমধ্যে ফাদার ক্রামোস্কিব কাছে খবব এলো যে একটা গীর্জায় উপাসনা চলাকালে জার্মান সৈন্যরা ঘেরাও করে সব পোলিশকে জার্মানির বিভিন্ন কারখানায় দাস শ্রমিক হিসেবে কাজ করার জন্য পাঠিয়ে দিয়েছে। অবশ্য এটাই প্রথম নয়। মাঝে মাঝেই জার্মান সৈন্যরা হঠাৎ হঠাৎ সিনেমা বা থিয়েটার ঘেরাও করে জার্মান ছাড়া সবাইকে জার্মানিতে পাঠিয়ে দেয়। সময় সময় পোলিশ যাত্রীবাহী পুরো ট্রেনগুলো মুখ ঘুরিয়ে জার্মানির দিকে যাত্রা করে।

বাবার মাথা থেকেই নতুন পরিকল্পনাটা বেরোলো। পরিকল্পনাটা চমৎকার হলেও কাজ হবে কিনা সন্দেহ। বাবার পরিকল্পনা মতো আমি আর মা জাল কাগজপত্রসহ পোলিশদের সঙ্গে জার্মানদের হাতে ধরা দেবো। যাতে ওরা

আমাদের জার্মানিতে নিয়ে গিয়ে দাস শ্রমিক হিসেবে কাজ করায়। এ ছাড়া বাঁচার আর কোনো পথ নেই। এমনিতেই ইহুদীদের সংখ্যা কমে এসেছে। সুতরাং ওদের শ্যেন চক্ষু এড়িয়ে বেশীদিন লুকিয়ে থাকাও আর সম্ভব নয়। আজ হোক কাল হোক ধরা পড়ে যাবোই। তার চেয়ে মা আর আমি তখন ধরা দিলে দাস শ্রমিক হিসেবে ঘৃণ্য কাজ করতে হলেও প্রাণে বাঁচার সম্ভাবনা। তবে হয়তো-বা বাবার সঙ্গে ভবিষ্যতে কোথাও না কোথাও মিলিত হতে পারবো। অবশ্য ততোদিন যদি বাবা বেঁচে থাকেন। তবু মনটা খুঁত খুঁত করতে লাগলো। ওরা আমাদের চরম শত্রু। দাস শ্রমিক হিসেবে কাজ করা মানে ওদের উপকার করা। কিন্তু উপায়ও তো নেই।

পরের দিন চার্চ সার্ভিসের পর ফাদার আমাদের তাঁর নিজস্ব উপাসনাগৃহে নিয়ে গেলেন। আমাদের জন্য প্রার্থনা শেষ করে, একে একে সবাইকে আশীর্বাদ করলেন। আমরা উপাসনাগৃহের পেছনদিকের একটা ছোট্ট ঘরে এলাম। মন বিষণ্ণ। তবু বাবার কাছ থেকে বিদায় নিতে হবে। এ জীবনে পরস্পরের সঙ্গে আর দেখা হবে কিনা কে জানে! একমাত্র ভবিতব্যই তা' বলতে পারে।

মা আর আমি সবার অলক্ষ্যে জনতার সঙ্গে মিশে গেলাম। কারোর নজরে পড়ি নি। অথবা, পড়ার কথাও নয়। জার্মান সৈন্যরা জনতাটাকে ঘিরে ফেলতেই কান্না, চিৎকার আর মুক্তি পাওয়ার জন্য কাতর আর্তনাদ শুরু হয়ে গেল। আমরা খুব সময় মতো এসেছিলাম। সামনেই একটা ট্রেন দাঁড়িয়ে। বন্দীদের জার্মানীতে নিয়ে যাওয়ার জন্য। কিছুক্ষণ পরে এতোগুলো লোককে গর্ভে পুরে নিয়ে ট্রেনটা চলতে আরম্ভ করলো। সবাই যখন চিৎকার, মুক্তি পাওয়ার জন্য ঠেলাঠেলি করছে, তখন আমরাই একমাত্র স্থির। কয়েক মিনিট আগে আমাদের কাগজপত্র চেক্-আপ করে আমাদের হাতে ফিরিয়ে দিতে স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলেছি। যাক, ধরতে পারে নি তা'হলে। দীর্ঘ কয়েকটা মাস পরে এই একটু স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলার সুযোগ পেলাম।

চুপচাপ বসে ছিলাম। পাশের প্যাসেঞ্জারের সঙ্গেও কথা বলার উপায় নেই। যদি মুখ ফসকে আমাদের সত্যিকারের পরিচয়টা বেরিয়ে পড়ে! তবে? এখন থেকে নকল দলিল অনুযায়ী আমরা পোলিশ। ইহুদী নই। কেউ জানতে পারলে এই চরম অবস্থাতেও একবিন্দু সুখের জন্য গেস্টাপোদের কানে তুলে দেবে কথাটা। এমন কি, আমি এবং মা যে একটু মন খুলে কথা বলবো সে পথও বন্ধ। দীর্ঘ নিঃশ্বাস বেরিয়ে আসে। বুকের কাছটাতে ফাঁকা লাগে,

যখন ভাবি আমি আর মা এখন থেকে এই দুর্গম পথের নিঃসঙ্গ যাত্রী। আমাদের গাইড্ করার জন্য, প্রয়োজনে উপদেশের নিমিত্ত বাবাও সঙ্গে নেই। বাবার কথা মতো প্রতিটি শব্দ আগে থেকে খুব ভালো করে বিচার বিবেচনা করে তবে উচ্চারণ করতে হবে। পাশে বসা মাকে আর 'মা' বলে ডাকতে পারবো না। নতুন বার্থ সার্টিফিকেট অনুসারে 'কাকীমা' বলে ডাকতে হবে। বাবার বারবার শেখানো কথাগুলো মনে মনে মুখস্থ করি: আমার নাম…। আমার জন্মস্থান শহর লাব্লিন। জন্ম ১৯২৮ সালের…। মায়ের নাম…। বাপ্রে, একরাশ ইতিহাস মনে রাখতে হবে এবার থেকে।

দু'তিন দিন ধরে ট্রেনটা একনাগাড়ে ছুটে চলেছে। আতংকিত হওয়ার কিছু নেই। আমাদের ভাগ্য আমাদের জানা। বরং একমাসের অস্থির উৎকণ্ঠিত প্রতিটি মুহূর্ত কাটানোর ক্লান্তিতে প্রচুর ঘুমিয়ে নিয়েছি ট্রেনে। কোথায় নিয়ে চলেছে জানি না। তবে বুঝতে পারছি, ট্রেনটা পশ্চিমে চলেছে। একসময় ট্রেনটা এসে দাসাউ স্টেশনে থামে। ট্রানজিট্ ক্যাম্প। বেশীর ভাগ বন্দীদেরই এখানে প্রথমে আনা হয়। তারপর বাছাই টাছাই করে বিভিন্ন জায়গায় রকমারী কাজে পাঠায়। ট্রেনটা দাসাউ স্টেশনে থামতেই লাউড্ স্পীকারে আদেশ হয়, ট্রেন থেকে নেমে সবাইকে স্টেশনের প্ল্যাটফরমের ওপর সারি দিয়ে দাঁড়াতে। পুরুষ এবং মহিলাদের আলাদা লাইন। বিভিন্ন কারখানার প্রতিনিধি দাঁড়িয়ে আছে। পুরুষদের বেছে দাস শ্রমিক হিসেবে খাটাবার জন্য এখান থেকেই নিয়ে যাবে নিজেদের কারখানায়। আমাদের প্রথমে গুণে নিয়ে একশো জনের এক একটা দলে ভাগ করা হলো।

একজন সিভিলিয়ান জার্মান এগিয়ে আমাদের পঞ্চাশ জনের একটা দলের ভার নিলো। জার্মানীর বিখ্যাত কারখানা আই. জি. ফারবেন এ্যালুমিনিয়াম ওয়ার্কসের তরফ থেকে। কারখানাটা বিটারফেল্ড শহরের শহরতলীতে। বিস্তীর্ণ কয়েক মাইল নিয়ে অসংখ্য কারখানা এ অঞ্চলটাতে। বন্দীদের বসবাসের জন্য কারখানার কম্পাউণ্ডের ভেতরে কয়েকটা বস্তী করা হয়েছে।

পরের দিন আমাদের সবাইকে লাইফ্ হিষ্ট্রি লিখতে বলা হলো। যাতে বিভিন্ন কাজের জন্য ভাগ করা যায়। দলের মধ্যে একমাত্র আমি আর মা-ই অনর্গল জার্মান বলতে বা লিখতে পারি। আমরা ছাড়া একজন মাত্র উক্রাইনের মেয়ে ভাঙা ভাঙা জার্মান বলতে পারে। কিন্তু লিখতে পারে না। যে ডিপার্টমেণ্টে বেশীর ভাগ মেয়ে শ্রমিক, সেই ডিপার্টমেণ্টে মেয়েটা ইন্টারপ্রিটারের কাজ করে; মেয়ে শ্রমিকদের দিয়ে এরা সাদা পাউডার ভর্তি বস্তা খালি করায়।

এ্যালুমিনিয়াম তৈরীর কাঁচামাল এটা। কাজটা ভাল না। একে তো হাওয়ার সঙ্গে পাউডার মিলে দম বন্ধ হওয়ার জোগাড়, চোখ জ্বালা করে। তার ওপর বুকের পক্ষেও ক্ষতিকারক। মা-ই মেয়েদের মধ্যে বয়স্কা বলে দলের ইনচার্জ নির্বাচিত হয়। কারখানার ভেতরে মা'র কোনো কাজ নেই। বস্তীটা পরিষ্কার রাখা, মেয়ে শ্রমিকদের খাবার দেওয়া ইত্যাদি টুকিটাকি কাজের দায়িত্ব। সত্যি বলতে কি, অন্যান্য মেয়েদের থেকে মা'র স্বাধীনতা অনেক বেশী। মা'র সঙ্গে বস্তীতে একঘরে ইয়াংকা বলে আরো একটা মেয়ে থাকে। বছর বারো বয়েস। মা দলের ইনচার্জ হওয়ায় দলের প্রায় সবাইকে মা'র সঙ্গে পরামর্শ করে কাজ করতে হয়।

এর মধ্যেই ঘটনাটা ঘটে গেল। আমাদের তদারকিতে যে জার্মান অফিসার নিযুক্ত, হঠাৎ একদিন আমাকে ডেকে ভদ্রলোক বললে যে এবার থেকে আমাকে অফিসের কাজ করতে হবে। দলের মধ্যে থেকে অফিসের কাজের জন্য একমাত্র আমাকেই বাছা হয়েছে। কথাটা শুনে আমি হতভম্ব, নির্বাক। বিমূঢ়ও বটে। ভয়ে আমার কণ্ঠতালু পর্যন্ত শুকিয়ে গেছে ততোক্ষণে। অফিসে কাজ করা মানে জার্মানদের সঙ্গেই ওঠাবসা। অ-জার্মানদের সঙ্গে মেলামেশা করা কঠোরভাবে নিষিদ্ধ। বিশেষ করে, পোলিশ দাস শ্রমিকদের তো জার্মানদের সঙ্গে কথা বলাও আইনত দণ্ডনীয়। একমাত্র কাজের ব্যাপারে যেটুকু প্রয়োজন, সেটুকু ছাড়া।

আমাকে অফিসেব যে ডিপার্টমেণ্টে কাজ করতে দেওয়া হলো সে ডিপার্টমেণ্টের কাজ সবরকম জিনিষের হিসেব রাখা, রেজিষ্ট্রেশন, সিক্‌লিভ আর লাঞ্চের স্লিপ্ দেওয়া। ডিপার্টমেণ্টে আমি ছাড়া আর চারজন জার্মান। আগামী কয়েকদিনের মধ্যে দু'জন জার্মান কর্মী সৈন্যবাহিনীতে যোগ দেবে। সুতরাং যতো তাড়াতাড়ি সম্ভব আমাকে কাজগুলো রপ্ত করে নিতে হবে। ইতিপূর্বে এ ধরনের কাজ কখনো করি নি। সুতরাং ভয়ে আমার অবস্থা তখন হিম হওয়ার জোগাড়। আর কাজকর্মের পদ্ধতিটাও বেশ জটিল। একা একা এতো টাকা পয়সার হিসেব রাখা, হাজাব হাজার ওয়ার্কারকে লাঞ্চ টিকিট দেওয়া, রীতিমতো ঝামেলার ব্যাপার।

প্রায় সব শ্রমিকই বিদেশী। ইউরোপের বিভিন্ন দেশ থেকে ধরে আনা। আর প্রত্যেক জাতের শ্রমিকের জন্য আলাদা আলাদা টিকিট। ইটালি, স্পেন আর হাঙ্গারির শ্রমিকদের দুটো পথের একটা বেছে নিতে হয়। হয় আর্মিতে যোগ দেওয়া, নয় যুদ্ধের রসদ জোগানোর জন্য বিভিন্ন কারখানায় শ্রমিক হিসেবে কাজ করা। তা'ছাড়া ফ্রেঞ্চ, বেলজিয়াম, ডাচ্ ইত্যাদি দেশের শ্রমিক তো

রয়েছেই। তবে ইটালি স্পেন আর হাঙ্গারির শ্রমিকদের জন্য ভালো ব্যবস্থা। ভিন্ন ক্যান্টিন। আর জার্মান শ্রমিক হলে তো কথাই নেই। রীতিমতো রাজসিক ব্যবস্থা। বহাল তবিয়ৎ। খাওয়া দাওয়া ছাড়াও সুযোগ সুবিধে প্রচুর।

এই অফিসেই আমার সঙ্গে বন্ধুত্ব হয়েছিলো হেরমেয়ারের সঙ্গে। মোটাসোটা মধ্যবয়স্ক ভদ্রলোক; নম্র এবং বিনয়ী। সব সময়ই দুঃখ প্রকাশ করতো আমাকে ওর বাড়ীতে নিয়ে গিয়ে ওর স্ত্রী এবং ছেলেমেয়েদের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিতে পারছে না বলে। আমার জন্যে হের মেয়ার বাড়ীর তৈরী খাবার লুকিয়ে লুকিয়ে নিয়ে আসতো। এ জীবনে যেটা কল্পনাতীত।

কিন্তু বর্তমানে আমার জীবনে কোনো কিছুরই খাঁকৃতি নেই। অঢেল খাওয়া দাওয়া। যে ক'টা ইচ্ছে মিল ভাউচার নিতে আমার ওপর কোনো বাধা নিষেধ নেই। আর বিদেশীদের মধ্যে আমি-ই একমাত্র ব্যক্তি, যার জার্মান ক্যান্টিন ব্যবহারে পরিপূর্ণ অধিকার রয়েছে। হের মেয়ার অল্প কয়েকদিনের মধ্যেই আমাকে জার্মান সর্টহ্যাণ্ড আর টাইপিং শিখিয়ে দিয়েছে। বিনিময়ে তাকে আমি ইংরেজী শিখিয়েছি। অবশ্য সমস্ত ব্যাপারটাই খুব গোপনীয় রেখে। কারণ ধরা পড়লে সোজা বন্দুকের নলের মুখে নিয়ে গিয়ে দাঁড় করাবে।

বর্তমানের আয়নায় নিজের প্রতিবিম্বে নিজেরই যেন বিশ্বাস হয় না। জার্মানরা চার পাশে ঘিরে রয়েছে। যার সঙ্গে দেখা হয়, তাকেই 'হাইল্ হিটলার' বলে অভিবাদন করতে হয়। মাঝে মাঝে বুকের এক গহিন কোণে একটা ভয়ের রেখা তিরতির করে কেঁপে ওঠে। যদি এরা জেনে ফেলে যে আমি ইহুদী? তবে? ইতিমধ্যে নকল বার্থ সার্টিফিকেটের দৌলতে আমার জন্মদিন এসে গেল। সাড়ম্বরে পালনও করলাম জন্মদিন। তবু সব সময় সতর্ক থাকতে হয়। যদি আমার আসল পরিচয়টা ধরা পড়ে যায়?

কিছুদিন পরে মন থেকে অহেতুক ভয়গুলোকে ঝেড়ে ফেলে দিলাম। ভালো সময় যেটুকু পেয়েছি, সেটার পরিপূর্ণ সদ্ব্যবহার করাই বুদ্ধিমানের কাজ।

কয়েক সপ্তাহ পরে চিঠি লেখার অনুমতি পেলাম। আঃ কী আনন্দ! আমি আর মা প্রথমেই লিখলাম ফাদার ক্রমোস্কিকে। যাতে তাঁর মাধ্যমে বাবার সঙ্গে যোগাযোগ করতে পারি। কয়েকদিন পরে বাবার উত্তর পেলাম। মনের ওপর থেকে জগদ্দল পাথরটা যেন এতোদিন পরে একটুখানি সরলো। বাবা লিখেছেন, নকল কাঁগজপত্রের সাহায্যে শহর লাব্লিনের দক্ষিণ শহরতলীতে মোটামুটি গোছের একটা চাকরী জোগাড় করতে পেরেছেন। এরপর প্রায়ই

পাশ দিয়ে যাবার সময় দেখি দু'চোখ বেয়ে গড়িয়ে পড়ছে অশ্রু। সেই মুহূর্তেই পিছন থেকে একটা গার্ড বেয়নেটের খোঁচা মেরে খিস্তি দিয়ে ওঠে, — জল্‌দি, তাড়াতাড়ি এগিয়ে চল্ শূকরী।

যাত্রাপথ অল্প। ঘণ্টা কয়েক পরে ট্রেনটা এসে সালে জেলার হালে শহরে থামে। শহরের মধ্যে দিয়ে মার্চ করে যাওয়ার সময় রাস্তার দু'পাশের জনতার কৌতূহলী দৃষ্টি আমাদের বিদ্ধ করে। শেষে, বিরাট একটা বাড়ীর পর পর তিনটে উঁচু গেট পেরিয়ে তবে ভেতরে ঢুকি।

হ্যাঁ, আমি যা ভেবেছিলাম, ঠিক তাই। জেল। তার মানে আমাদের জেলে পোরা হবে। অর্থাৎ, আমরা হলাম অপরাধী। ইয়াংকা না থাকলে আমি বোধহয় এ জেলের সর্ব কনিষ্ঠ অপরাধী। অবশ্য ইয়াংকা আমার চেয়ে কিছু ছোট। বারো বছর বয়স ওর।

আবার ভেতরে ঢুকে আমাদের লাইন দিয়ে দাঁড়াতে হয়। অর্থাৎ, আমাদের জীবাণু-মুক্ত করা হবে। আমাদের পোষাক খুলে নিয়ে কয়েদীদের জামা কাপড় দেয়। তারপর ফিঙ্গার প্রিণ্ট। বিভিন্ন এ্যাঙ্গেল থেকে ছবি নেওয়ার পালা। যেন আমরা ভয়ংকর কোনো অপরাধী। কিন্তু কী আমাদের অপরাধ? ইহুদী, এই তো! যখন চেইন্ দিয়ে নাম্বার প্লেট্ আমার গলায় ঝুলিয়ে দিলো, তখন আর হাসি চাপতে পারি নি। ছবি-টবি তোলা শেষ করে আমাদের তেরো জনের দলটাকে সেলে ঢোকানো হলো।

বিরাট একটা হল্‌ঘর। কেমন যেন বিষণ্ণ ঘরটা। ঘরের মাঝ বরাবর একটা সিঁড়ি ঘুরে ঘুরে কিছুটা ওপরে উঠে গেছে একটা গ্যালারীতে। লোহার দরজা খুলে তবে গ্যালারীতে ঢুকতে হয়। সেই গ্যালারীটাকে ভাগ করা হয়েছে সেলে। দুটো তারের জাল দিয়ে সেলগুলো আলাদা করা। যে মেয়েছেলে ওয়ার্ডার আমাদের নিয়ে যাচ্ছিলো, তার কোমর থেকে এক গোছা চাবি ঝুলছে। চাবিগুলোর ঝন্ ঝন্ শব্দ দূর থেকেও স্পষ্ট শোনা যায়। হঠাৎ একটা সেলের সামনে দাঁড়িয়ে পড়ে ওয়ার্ডারটা। চাবির গোছা থেকে খুঁজে খুঁজে একটা চাবি বার করে সেলের দরজাটা খুলে, আমাদের উদ্দেশ্যে অশ্রাব্য কয়েকটা খিস্তি ছুঁড়ে দিয়ে সেলের ভেতরে ঢুকতে বলে। সেলটা বেশ বড়ো। আমাদের আগেই কয়েকজন বন্দী সেলের ভেতরে রয়েছে। একটা রাশিয়ান মেয়ে, আরেকজন চেক্ আর তৃতীয় মেয়েটা জার্মান জিপ্‌সী। একদম ফাঁকা ঘর। বিছানাপত্র বলতে একটা মাদুর আর কম্বল গুটিয়ে দেওয়ালের গায়ে ঠেস্ দিয়ে দাঁড় করানো। মেঝেতে বসা নিষেধ বলে একটা মেয়ে দেওয়ালের গায়ে

ঠেস্ দিয়ে দাঁড়ানো ; ঘরের ভেতরেই কমোড্। তার ওপরে আরেকটা মেয়ে বসা। দরজার পাল্লায় ছোট্ট একটা ফুটো, যাতে চোখ লাগিয়ে ওয়ার্ডাররা দেখতে পারে কেউ মেঝেতে বসেছে কিনা।

দুপুরবেলা এক বাটি স্যুপ দিয়ে গেল। সকালে বিকেলে কয়েক টুকরো রুটি আর দুধ-ছাড়া বিস্বাদ চা। দিনের মধ্যে একবার ব্যায়াম। ব্যায়াম মানে উঠোনে সবাই মিলে একজন ওয়ার্ডারকে মাঝখানে রেখে দৌড়োদৌড়ি।

আর সেই একঘেয়ে ব্যাপাবের পুনরাবৃত্তি। মাঝে মাঝে আমাদের নাম ধরে ডেকে জিজ্ঞাসা, নকল কাগজপত্র কোথা থেকে পেলাম ? যাই হোক্ আমার স্থির বিশ্বাস যতোদিন ওই গোপন খবরটা এরা বার না কবতে পারবে, ততোদিন আমাদের জীবিত রাখবে।

সময়ের পরিক্রমায় আমরা দিন, সপ্তাহ এবং মাসের হিসেব রাখতে ভুলে গেছি। অবশ্য তার দরকাবও ছিল না। মোটামুটি এই বন্দী জীবনটা মন্দ নয়। মারধোব নেই ; বেঁচে থাকার মতো খাওয়া দাওয়া আর মাথার ওপরে ছাদ। যুদ্ধ শেষ হওয়া পর্যন্ত যদি আমাদের এই ভাবে কাটাতে হয়, মন্দ কী! সবচেয়ে বড়ো কথা, বেঁচে আছি।

হঠাৎ একদিন আমাদেব সেলেব সবার ডাক পড়লো। লাইন দিয়ে গিয়ে দাঁড়ালাম জামাকাপড় নেওয়ার জন্য। জামাকাপড় নিয়ে গিয়ে উঠতে হলো অপেক্ষমাণ কালো বিরাট একটা ভ্যানে। বাইরে থেকে দেখতে অনেকটা এ্যাম্বুলেন্সের মতো। ভেতরে জাল দিয়ে ঘেরা ছোট ছোট সেল। বাইরের কিছু দেখার উপায় নেই। গার্ডের কাছে জানলাম, আমাদের লাইপ্‌জিগ্ জেলে নিয়ে যাওয়া হবে।

লাইপ্‌জিগ্ জেলে পৌছনোর পর আবার সেই একই ব্যাপাবের পুনরাবৃত্তি। ফিঙ্গারপ্রিন্ট, ছবি নেওয়া ইত্যাদি ইত্যাদি। শুধু বন্দীর সংখ্যা এখানে আগের জেলের থেকে অনেক বেশী। কিন্তু জীবন সেই একই খাতে বহমান।

দলের থেকে বেছেটেছে কয়েকটা মেয়েকে রান্নাঘরে কাজ দেওয়া হলো। বাকী সবাইকে সেলাই ফোঁড়াই। ক'সপ্তাহ বা মাস সে জেলে কাটিয়েছি বলতে পারবো না। কোন বছর সেটা তা'ও জানি না। কারণ তখন ওসব হিসেব নিকেশ আমরা সবাই ঘুলিয়ে ফেলেছি।

আবার আমাদের যাত্রার পালা। দলে এখন আমরা সবসুদ্ধ পনেরো জন। এবারে ট্রেনে গার্ডকে অনেক অনুরোধ করা সত্ত্বেও গার্ড আমাদের গন্তব্যস্থলের

নাম বললো না। তবে ট্রেন থেকে নামার সময় এক ফাঁকে দেখলাম স্টেশনের নামটা। ড্রেসডেন। আমরা একটু একটু করে তা'হলে পুবের দিকে এগিয়ে যাচ্ছি তার মানে লাব্লিনের কাছাকাছি। কিন্তু কোথায় এরা আমাদের নিয়ে যাবে একমাত্র ভবিতব্যই তা' বলতে পারে।

ড্রেসডেন জেলটা আগের দুটোর তুলনায় অনেক ভালো। বাড়ীটা আনকোরা নতুন। ভেতরটাও সুন্দর করে সাজানো। দেখেশুনে মনটা খুশী-ই হলো। জানালাগুলো কাঁচের। চারতলার ছাদে দাঁড়ালে ছবির মতো সাজানো সুন্দর শহরটাকে দেখা যায়। মনে হয় যেন কোনো বিখ্যাত শিল্পীর তুলির টানে আঁকা।

আমাদের তেরো নম্বর সেলে রাখে। তেরো নম্বর সেলে জার্মানির বিভিন্ন প্রান্ত থেকে ধরে-আনা বেশ কয়েকজন বন্দী আগে থেকেই ছিলো। তাদের মুখেই জানলাম, এটা হলো ট্রান্জিট সেল। এখানে সবাইকে জমা করে সোজা নিয়ে যাওয়া হবে আউস্ভিৎজে। আউস্ভিৎজ নামটা আমার কাছে খুব পরিচিত বলে মনে হয়। মা বলে, আউস্ভিৎজ্ আমাদের শহর লাব্লিনের প্রায় তিবিশ মাইল উত্তরের একটা গ্রাম। গ্রাম না বলে এটাকে জলাভূমি বলাই উচিত। বেশীর ভাগ বাসিন্দাই জেলে।

অন্যান্য বন্দীদের মুখে শুনেছিলাম আউস্ভিৎজে কনসেনট্রেশন ক্যাম্প আছে। একস্টাবমিনেসন্ সেণ্টার নাম্বাব ওয়ান। কেউ-ই সঠিক জানে না, ওখানে কি হচ্ছে। কিন্তু আজ পর্যন্ত ওখান থেকে কেউ ফেরে নি।

সারা দেওয়ালময় লেখা। নাম, বাড়ীর ঠিকানা, কবিতা ইত্যাদিতে কতো ধরনের বক্তব্য। আউস্ভিৎজে যাওয়ার আগে প্রাক্তন বন্দীদের লেখা। কী বিচিত্র সেইসব লেখা, আবার আউস্ভিৎজে দেখা হবে, আমরা নরকের যাত্রী, যদি বেঁচে থাকো নীচের ঠিকানায় যোগাযোগ করো, ইত্যাদি ইত্যাদি।

আমিও একটা পাথরের টুকরো জোগাড় করে আমার নামধাম আর ঠিকানা লিখলাম।

দিনের পর দিন আমাদের সেলে নতুন বন্দীর সংখ্যা বেড়েই চলেছে। অবশ্য সব ধরনের বন্দীই রয়েছে তার মধ্যে। খুনের দায়ে যাবজ্জীবন সশ্রম কারাদণ্ডে দণ্ডিত জার্মান মেয়ে, ছিঁচ্কে চোর, পকেটমার, রাজনৈতিক নেতা, মেয়ে ধর্ষণে ঘাঘু লম্পট, ফাদারল্যাণ্ডের জন্য কাজ করতে অস্বীকৃত অপরাধী, আর আমরা,—যারা সম্পূর্ণ নির্দোষ।

একদিন সকালে আমাদের তেরোজনকে অফিসে ডেকে অফিসার একটা

কাগজে সই করতে বললো। পড়তে না দিলেও সই করার ফাঁকে যতোটুকু পড়া যায়।…থার্ড রাইখের শত্রু এরা। নকল কাগজপত্রের সাহায্যে ফাদারল্যাণ্ড জার্মানীতে অনধিকার প্রবেশ করেছে …তাই যাবজ্জীবন কারাদণ্ডে দণ্ডিত করা হলো।

আমি তো অবাক। আমরা থার্ড রাইখের শত্রু? দেশের পক্ষে বিপদ্‌জনক? অফিসারের দিকে বিস্ময়ের দৃষ্টিতে তাকাতে অফিসার মৃদু হেসে বলে,—তাকিয়ে দেখছো কী? কালকে আউস্‌ভিৎজে যাত্রার জন্য প্রস্তুত হওগে যাও।

সেই রাত্রেই প্রথম মিত্রশক্তি ড্রেসডেনে বোমা-বর্ষণ করে। আমাদের সে কী উল্লাস! জানালার কাঁচগুলো থরথর কাঁপছে, জেলের ছাদ ফেটে গেছে। ছোটাছুটি করে দেখি হঠাৎ আগুনের ঝল্‌কানি। একটা বোমা যদি আমাদের জেল তাগ্‌ করে ছোঁড়ে তবে আমরা মুক্ত। কিন্তু হায়! কিছুক্ষণ পরেই বোম্বারগুলো মুখ ঘুরিয়ে নিজেদের আস্তানায় ফিরে গেল। আমাদের দপ করে জ্বলে ওঠা আলোটাও সঙ্গে সঙ্গে নিভে যায়।

পরের দিন সকালে আমাদের জামাকাপড় দিয়ে দিলো। গন্তব্যস্থল আমাদের জানা। আউস্‌ভিৎজ্‌। বন্দীদের পরিবহনের জন্য বিশেষভাবে তৈরী কোচগুলো থেকে তখনো রঙের গন্ধ আসছে। অনেকগুলো কোচ জুড়ে ট্রেনটাকে দীর্ঘ করা হয়েছে। যাতে একসঙ্গে অনেক বন্দী বহন করা যায়।

অদ্ভুত রকমের কোচগুলো। দু'পাশে ছোট ছোট খুপরীর মতো সেল। গোটা চারেক বন্দী রাখার উপযুক্ত। মাঝখানে করিডর গেষ্টাপো গার্ডদের টহল দেবার জন্য। আলোবাতাসহীন অন্ধকূপের মতো সেলগুলো। একেবারে উঁচুতে, ছাদের একটু নীচুতে একফালি জায়গা কাটা ভেন্‌টিলেশনের জন্য। সেই ফাঁকটুকু দিয়েই যা একটুকরো নীল আকাশ চোখে পড়ে।

এ যেন অগস্ত্য যাত্রা। এ যাত্রাপথের যেন আর শেষ নেই। পাশের সেলগুলো থেকে মাঝে মাঝে টুকরো টুকরো কথাবার্তা বা গানের কলি ভেসে আসছে। কয়েকটা সেলে আবার পুরুষ বন্দীও রয়েছে।

মা'র, আর আমার মনে হয়, দীর্ঘ এতোদিন পরে আমরা আমাদের ঘরে চলেছি। হায়! এতো কাছে কিন্তু কত দূরে। ১৯৩৯ সালের আগষ্টের পর লাব্‌লিনের এতো কাছে আর আমরা আসি নি। মাত্র কয়েক মাইলের ব্যবধান, তবু সত্যিকারের ব্যবধান সুদূর গ্রহ-উপগ্রহের থেকেও বেশী। আমার মেরুদণ্ড বেয়ে ভয়ের একটা বরফ-শীতল স্রোত বয়ে যায়। সমস্ত ব্যাপারটাই একটা

রহস্যে জড়ানো। তবু যতোক্ষণ শ্বাস, ততোক্ষণই আশ। যেমন করে হোক্ যুদ্ধ করে যেতে হবে। বাঁচার তাগিদে। কোনো কিছুই আমাকে ভেঙে দিতে পারবে না। এই মুহূর্তে মনে হয়, আমার দেহের প্রতিটি অণু-পরমাণু যেন লোহা দিয়ে গড়া। বাইরের কোনো শক্তিই আমার এই প্রাণশক্তিকে ছিনিয়ে নিতে পারবে না। অনেকবার মৃত্যুর মুখোমুখি হলেও ঈশ্বর বাঁচিয়ে রেখেছে। আগামী দিনেও তাঁর করুণা আমার ওপর বর্ষিত হবে। আমাকে বাঁচিয়ে রাখবে। যদিও অবচেতন মনে জানি, আউস্ভিৎজে বাঁচতে হলে যথেষ্ট মানসিক শক্তির দরকার। ঈশ্বর করুণাঘন, আউস্ভিৎজের দিনগুলোতেও নিশ্চয়ই আমাকে ভুলবেন না। আর এই বিশ্বাসই আমাকে বাঁচিয়ে রাখবে। এগিয়ে নিয়ে যাবে।

সবেমাত্র ঝিমুনি এসেছিলো, হঠাৎ ট্রেনটা থেমে গেল। সেলের দরজাটা খুলেই টহলদার গার্ডের চিৎকাব, —জল্দি, তডিঘড়ি নামো ট্রেন থেকে।

ঘুরঘুট্টি অন্ধকার। মাঝরাত্তির। আকাশে একটাও তারা নেই। আমাদের ওপরে আদেশ হলো পাঁচজনের দলে ভাগ হয়ে দাঁড়াতে। গুণতি নেওয়া হবে। বুঝতে পারলাম বেশ কয়েক শো বন্দীকে ট্রেনটা বয়ে নিয়ে এসেছে। বাতাসের বুকে চাবুকের শব্দ আছড়ে পড়ছে, আর্তনাদ আর কুকুরের চিৎকারে জায়গাটা নরক বিশেষ। একটু পরেই আমাদের ওপরে মার্চের আদেশ হলো। জলাভূমি বলে প্রায় হাঁটু সমান কাদা। প্যাচ্ প্যাচ্ করছে। এক পা এগিয়ে পেছনের পা-টাকে টেনে তুলে নিয়ে আবার এগোতে হয়। কিছুটা দূরে লাইট পোষ্ট। কয়েক গজ ছেড়ে ছেড়ে ছড়ি হাতে গার্ড দাঁড়ানো। শ'দুয়েক গজ জমি ছেড়ে দিয়ে লোহার গেটটা। গেটের ওপরে বড়ো বড়ো অক্ষরে লেখা:. একমাত্র কাজই স্বাধীনতা দিতে পারে।

এটা হলো আউস্ভিৎজ্ নাম্বার ওয়ান। আমাদের গেটটা পেরিয়ে যেতে হলো। রেললাইনের সমান্তরাল পথটা। দু'পাশে কাঁটা তারের বেড়া। শেষে আমরা শুধু মেয়েরা একটা গেট পেরোলাম। আর এটাই হলো আউস্ভিৎজ্ নাম্বার টু। অবশ্য খাতাপত্রে এটার নাম হলো বীরখেন্হাউ।

অন্ধকারের রেশটা থাকলেও দূরের জিনিষ অস্পষ্ট দেখা যাচ্ছে। মনে হয়.

দূরে একরাশ বস্তী। নীচু নীচু। গার্ডদের হুইসেল, তার সঙ্গে বিশ্রী গলায় তারস্বরে চিৎকার,—গেট্ আপ, গেট্ আপ। গুণতি শুরু হবে।

আমি তো রীতিমতো হতভম্ব। ঠিক শুনতে পাচ্ছি তো? এখন কি সত্যি বিছানা ছেড়ে ওঠার সময়? এখনো ঘড়িতে নিশ্চয়ই রাত চারটেও বাজে নি।

আমাদের সবাইকে তাড়িয়ে একটা বাড়ীতে নিয়ে গিয়ে জমা করা হলো। বাড়ীটা নাকি সাউনা। শব্দটা ফিনিশ; যার মানে হলো স্নানঘর! ভেতরে ধারাস্নানের ব্যবস্থা; পাশে রাখা কতোগুলো বিরাট বিরাট ড্রাম। যার মধ্যে জামাকাপড় জমা দিতে হবে উকুনের বংশ নির্বংশ করার জন্য। চারপাশে কতোগুলো জন্তু যেন ঘুরে বেড়াচ্ছে। মানুষের অবয়ব বলে চেনার উপায় নেই। জার্মান ইয়ুনিফর্মও পরা নয়। ঢোলা ঢোলা পাজামা ধরনের অদ্ভুত পোশাক। পেছনে লাল রঙের বিরাট রেড-ক্রশের চিহ্ন আঁকা। মাথার চুল ছোট করে ছাঁটা। একনাগাড়ে চিৎকার করে চলেছে, অত্যধিক চিৎকারে গলা বসে গিয়ে কর্কশ স্বরটা বিকট শোনাচ্ছে। সবার হাতেই চাবুক। একটু সামনে গিয়ে দেখি বাঁ দিকের বুকে ঠিক স্তনের ওপরে একটা সবুজ ত্রিকোণের মধ্যে নম্বর লেখা। পরে জেনেছিলাম, জঘন্য অপরাধে অপরাধী জার্মান ক্রিমিনালদের বুকে এই চিহ্ন দিয়ে দেওয়া হয়। তার মানে কী ধরনের চরিত্র এই ক্যাম্প শাসন করে!

আমাদের দলের একজন সাহসে ভর দিয়ে জিজ্ঞাসা করে,—কখন খেতে দেবে? ড্রেসডেন ছেড়ে তক্ এখন পর্যন্ত পেটে এক আঁজলা জলও পড়ে নি।

সেই কর্কশ স্বরটা কথা শুনে অট্টহাসিতে ফেটে পড়ে,—আহা, শূকরীগুলোর তা'হলে ক্ষিদে পেয়েছে, তাই না? তা' জানালায় উঁকি দিয়ে সব কি দেখছো? মুসলমানদের? খুব কৌতূহল দেখছি? ব্যস্ত হয়ো না। এক্ষুনি তোমাদেরও মুসলমান করা হবে।

মুসলমান? এটা আবার কি রকম শব্দ? কোন ভাষায় আছে? খুঁজে পেতেও এর অর্থ উদ্ধার করতে পারলাম না। অবশ্য এ জায়গার নিজস্ব একটা ভাষা আছে। যার মানে একমাত্র ক্যাম্পের বাসিন্দাদেরই বোধগম্য। অবশ্য থাকতে থাকতে আমরাও নিশ্চয়ই শিখে যাবো।

জানালার ওপাশে কতোগুলো কংকাল নড়ে চড়ে বেড়াচ্ছে। চলাফেরার ক্ষমতা একেবারে লোপ না পেলেও কমে এসেছে। টেনে হিঁচ্ড়ে চলেছে। এমন কি কয়েকজনের দাঁড়াবার ক্ষমতা পর্যন্ত নেই। রীতিমতো হামাগুড়ি দিচ্ছে।

মোটাসোটা ; বেশ ভালো জামাকাপড় পরা। মেয়েছেলেটার কর্কশ গলার স্বর শুনেই বোঝা যায়, ব্লকগুলোর ইনচার্জ। এদের ভাষায় ব্লকোভা। আবার প্রত্যেকটি ব্লকের জন্য আলাদা আলাদা এ্যাসিসটেন্ট, তারা হলো ষ্টুবোভা। এবার কাজে নিযুক্ত বেশীর ভাগ মেয়েই হলো শ্লাভাকিয়ান। আসলে এ ক্যাম্পের গোড়াপত্তনের সময় এরাই গায়ে গতরে খেটে গড়ে তুলেছে। তার মধ্যে অবশ্য বেঁচে আছে মাত্র কয়েকজন। তারাই কেউ বা ব্লকোভা, ষ্টুবোভা। এরা সোজাসুজি জার্মান কর্তৃপক্ষের কাছে জবাবদিহির জন্য দায়ী। মোদ্দা কথা, পুরো ক্যাম্পটাই শাসন করে একদল জঘন্য চরিত্রের বর্ণ ক্রিমিন্যাল বা জন্ম-অপরাধী।

পুরো ক্যাম্পের চার্জে হলো একজন রাজনৈতিক অপরাধের অপরাধী জার্মান স্ত্রীলোক। ভদ্রমহিলা আট বছর বিভিন্ন জেলে কাটিয়েছে। যদিও ক্যাম্পে ওর ব্যবহারের সুনাম আছে, তবু ওকে দেখামাত্র সবাই লুকিয়ে পড়ে। ওর এ্যাসিসটেন্টের পরিচিতি হলো লাগার কুপো। যাই হোক, এদের সবার হাতেই একটা করে চাবুক। কারণে অকারণে যেটা প্রায় সারাক্ষণই দাবড়ে বেড়াচ্ছে।

আমরা কাছে যেতেই কোমরে হাত দিয়ে দাঁড়িয়ে থাকা ব্লকোভা চিৎকার করে ওঠে,—শূকরীর দল, লনে গিয়ে দাঁড়া।

লন ? আমি তো অবাক। ব্লকের পেছনে কর্দমাক্ত একফালি একটা মাঠ। তার মানে এখানেই আমাদের পুরোদিন কাটাতে হবে। ব্লকে একমাত্র রাত্রিবেলা ঢুকতে পারবো। ঘুমোবার সময়টুকু।

এখনো সকাল গড়ায় নি। গত চব্বিশ ঘণ্টার ওপর পেটে এক কণা খাওয়া বা একটু জলও পড়েনি। মনে হয় আজকে কপালে ব্রেকফাষ্টও জুটবে না। সকাল থেকে আকাশ ভেঙে বৃষ্টি নেমেছে। আমাদের কাকভেজা অবস্থা। তার মধ্যেই গিয়ে কাদায় দাঁড়াতে হলো।

চারদিকে তাকিয়ে দেখি কয়েকজন অপরাধী এদিক ওদিক ঘোরাফেরা করছে। আমাদের দেখে এগিয়ে এসে একজন জিজ্ঞাসা করে,—তুমি নতুন এসেছো এখানে ? স্কার্ফ কিনবে ?

সামনে দাঁড়ানো মেয়েটা ফরাসী। হাতে ধরা পুরনো এক টুকরো কাপড়। কাপড়টা পেলে মাথাটা ঢাকা দেওয়া যেতে পারে।

—দাম কতো ?

আমার প্রশ্নে মেয়েটা বলে,—এর বদলে দু' টুকরো রুটি অথবা একটা সসেজ দিতে হবে।

—আমরা এখনো রেশন পাই নি। কিন্তু তুমি স্কার্ফ পেলে কী করে?

—ম্যানেজ করতে হয়। মেয়েটার ছোট্ট উত্তর।

পরে বুঝতে পেরেছিলাম 'ম্যানেজ' করা এখানে একটা আর্ট। আর শব্দটার ভীষণ ক্ষমতা এই আউস্‌ভিৎজে। ম্যানেজ করা মানে চুরি, বদলা বা কেনা প্রভৃতি সবকিছুকে বোঝায়। আর কারেন্সী হিসেবে সব জিনিষকেই ব্যবহার করা চলে। এমন কি জল পর্যন্ত। আশ্চর্যের বিষয় গলা যাওয়ার ঝুঁকি নিলে এই আউস্‌ভিৎজে যা চাওয়া যায়, তা-ই পাওয়া যায়! যাই হোক্, সঙ্গে সঙ্গে মনস্থির করে ফেললাম। যেমন করে হোক্ রোজকার রেশনের থেকে কিছু কিছু বাঁচিয়ে আমার আর মা'র জন্য দু'জোড়া জুতো জোগাড় করতে হবে। এই খড়ম পায়ে দিয়ে হাঁটা অসম্ভব। তা-ও জলকাদায়। তা'ছাড়া ঠাণ্ডার হাত থেকে বাঁচতে হলে সোয়েটার আর মাথা ঢাকার জন্য দু' টুক্‌রো কাপড়ের নিতান্ত দরকার।

ইতিমধ্যে সকাল গড়িয়ে দুপুর হয়ে এসেছে। দূর থেকে দেখি, রান্নাঘর থেকে বড়ো বড়ো ড্রাম বয়ে নিয়ে আসছে। জেলের অভিজ্ঞতার থেকে জানি, এগুলোতে স্যুপ নিয়ে আসে। ড্রামগুলোকে আনতে দেখে পাশের ব্লকগুলোর থেকে কতোগুলো মেয়ে ছুটে বেরিয়ে আসে। ড্রামের থেকে চল্‌কে যে স্যুপ মাটিতে কাদার ওপরে পড়ছে, মেয়েগুলো উপুড় হয়ে শুয়ে পড়ে সেই কাদার থেকে চেটেপুটে সেগুলো খাচ্ছে। কয়েকটা মেয়ে ডাষ্টবিনের থেকে আলুর খোসা কুড়োতে ব্যস্ত।

যাক্, তবু শেষ পর্যন্ত স্যুপ এলো। আমাদের সবাইকে লালরঙের এনামেলের একটা ডিশের ওপর এক হাতা সেই স্যুপ নামে জলীয় বিস্বাদ পদার্থটা ঢেলে দিলো। তার ওপরে কয়েক টুকরো আলুর খোসা ভাসছে। চুমুক দিতেই গাটা গুলিয়ে উঠলো। কিন্তু ক্ষিদেতে তখন পেটের ভেতরে আগুন জলছে। সুতরাং ফেলে দেওয়ারও উপায় নেই। চামচ নেই বলে সব স্যুপটা চুমুক দিয়ে খেতে হলো। পরে চামচ 'ম্যানেজ' করতে হবে।

কয়েকদিনের মধ্যেই অবশ্য বুঝতে পেরেছিলাম ডিশগুলোর মূল্য কতোখানি। ডিশ না থাকলে খাওয়াও বন্ধ। তাই দড়ি দিয়ে কোমরে বেঁধে সব সময় সবাই ঝুলিয়ে রাখে। কোথাও একদণ্ড রেখে শান্তি নেই। চুরি যাওয়ার ভয়। উপরন্তু খাওয়া ছাড়াও ডিশগুলো জল খেতে ও রাত্রে প্রাকৃতিক প্রয়োজনে কাজে লাগে। একে তো টয়লেট্ নেই; একটা কুঁড়ে ঘরে গোটা পঞ্চাশেক গর্ত খোঁড়া। সেইখানে সুযোগ পাওয়া দুষ্কর। পুরনো বন্দীদের জোর বেশী।

আর সুযোগ পেলেও জল পাবো কোথায়। সাউনাতে গেলে পাওয়া যেতে পারে। সেখানে ঢুকে জল নেওয়া দূরের কথা, ঢুকতে গেলে মুখে পাছায় চাবুক পড়বে। সবচেয়ে জরুরী প্রয়োজন, একটু ভালো জামাকাপড়ের। জামা-কাপড় ভালো থাকলে যে অল্প হলেও সুযোগ সুবিধে পাওয়া যায়, এটা আমার নজর এড়ায় না।

বিকেলবেলায় অন্যান্য মেয়েরা আসে আমাদের সঙ্গে আলাপ করতে। সব জাতেরই মিশেল। তবে আমাদের ভাষায় খুব একটা অসুবিধে নেই। তার ওপর ক্যাম্পের প্রচলিত উপ-ভাষা তো আছেই। হঠাৎ একটা গুঞ্জন উঠতে আমি দৌড়ে গিয়ে হামাগুড়ি দিয়ে ব্লকের পেছনের দেওয়ালের আড়ালে লুকিয়ে উঁকি মেরে দেখি, স্তনের ওপরে কালো ত্রিকোণের মধ্যে নম্বর লেখা একটা মেয়ে। দেখেই বুঝলাম, জার্মান বন্দী। হাতে চাবুক। গোণা শেষ হলে মেন গেটের দিকে এগোয়। অস্থায়ী একটা ডেস্কের ওপরে ক্যাম্প ইনচার্জ টাউবে দাঁড়িয়ে। টাউবে নম্বরগুলো মিলিয়ে দেখে গুণতি না মিললে আবার গোণা শুরু হবে। সবসময় গুণতিতে মেলে না। এখান থেকে পালিয়ে যাওয়ার উপায় নেই। কিন্তু উল্টো লাইনে দাঁড়াবার দরুন প্রায়ই গুণতিতে ভুল হয়। আজকে দু'ঘণ্টার মধ্যে গুণতি শেষ হয়ে গেলে আমরা স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলি। পুরনো একজন বন্দীর মুখে শুনলাম, তিন চার ঘণ্টার কমে বেশীর ভাগ দিন গুণতির পালা শেষ হয় না। আমাদের মতো ব্লকোভাও হাঁফ ছেড়ে বাঁচে।

গুণতি শেষ হলে সবাই ব্লকের ভেতরে যাওয়ার জন্য উদ্‌গ্রীব হয়ে ওঠে। ঢোকার জন্য হুড়োহুড়ি পড়ে যায়। ঢোকার মুখে দোরগোড়ায় চার আউন্স পরিমাণ রুটি আর ছোট্ট একটা মার্গারিনের টুকরো হাতে দেয়। শুনি, এটাই রাতের ডিনার আর সকালের ব্রেকফাষ্ট। এই খাবারে বেঁচে থাকাটাই যে কষ্টকর। কি করে এর থেকে বাঁচিয়ে কাপড়চোপড জুতো কিনবো ভেবে কূলকিনারা পাই না।

ভেতরে দুটো গ্যাঙ্‌ওয়ে। তার দু'পাশে থ্রি টায়ার বাংক। এক একটা বাংকে পনেরো জনের শোওয়ার ব্যবস্থা। এক একটা ব্লকে হাজার জন করে ধরে। সামনে ছোট্ট একফালি একটা ঘর। ব্লকোভা আর তার এ্যাসিসটেন্টদের থাকার জন্য।

তাড়াহুড়ো করে শোওয়ার জন্য জায়গা দখল করা দরকার। ওপরের বাংকগুলোই সবচেয়ে ভালো। কিন্তু অনেক আগে থেকেই দখল করে নিয়েছে সেগুলো। নীচের বাংকে একে তো গরম, তায় দুর্গন্ধ। যাইহোক্ আমাদের

অবস্থা ঠিক টিনে ভর্তি সার্ডিন মাছের মতো। মাথা পা মুড়ে রাতটা কোনোরকমে কাটানো। ঠেলাঠেলিতে আমি বাংকের বাইরের দিকে জায়গা পেয়েছি বলে কম্বল বা খড়ের মাদুর কিছুই আমার কপালে জোটে নি। বালিশ টালিশের বালাই তো দূরে থাক্। আমি পায়ের খড়ম জোড়া আর রেশনটা পরনের কাপড়ের ভেতর রাখি। জামা কাপড় ভিজে সপ্ সপ্ করছে। তবু খোলার উপায় নেই। তা' হলেই বেপাত্তা। আমার গা ঘেঁষে একটা জিপ্সী মেয়ে শুয়ে। দু' সপ্তাহ হলো ক্যাম্পে আছে। জিপ্সী মেয়েটার গলার স্বর জীবনে আমি কখনো ভুলবো না। আমার দিকে ঘন চোখে মেয়েটা তাকিয়ে দেখে নিয়ে বলে,—ছাখো মেয়ে, তোমার দৃষ্টি দেখে মনে হচ্ছে তোমার মনের জোর আছে। দেখি তোমার হাতটা। হাতটা এগিয়ে দিতে কিছুক্ষণ হাতের রেখাগুলোর দিকে তাকিয়ে থেকে বলে,—এই ক্যাম্পের অতি অল্প কয়েকজনই স্বাধীনতার স্বাদ পাবে। আর মুষ্টিমেয় সেই ক'জনের মধ্যে তুমি হবে একজন। কখনো কোনো পরিবেশে মনের জোর হারাবে না। বাঁচার জন্য প্রতিটি মুহূর্তে সংগ্রাম করো। দেখো তুমি ঠিক বাঁচবে।

আউস্‌ভিৎজে আমার প্রথম দিন কাটলো।

হুইসেলের শব্দে পরের দিন সকালে আমার ঘুম ভাঙে। তখন বড়ো জোর রাত চারটে। ঘুট্‌ঘুটে অন্ধকার। প্রথমে তো আমার হুঁশই ছিলো না যে আমি ঠিক কোথায়। শীতে সারা শরীর কাঁপছে। জামাকাপড়গুলো তখনো ভিজে। শরীরের সঙ্গে লেপ্টে গেছে। ব্লকোভার চিৎকার কানে এলো,—গেট আপ্, কুইক্‌লি, গো আউট সাইড্।

আমি পাশের জিপ্সী মেয়েটা তখনো ঘুমোচ্ছে দেখে ধাক্কা দিলাম। তবু নড়ে না। ধরে দেখি শরীরটা ঠাণ্ডা আর পাথরের মতো শক্ত। কয়েক ঘণ্টা আগেই মরে গেছে। আর আমি এতোক্ষণ সেই মৃতদেহটাকে জড়িয়ে ধরে শুয়েছিলাম!

মৃত্যুর হার নবাগতদের মধ্যেই বেশী। বেশীর ভাগ কিন্তু ভয় পেয়েই মরতো। আর মরতো গ্রীসিয়ান মেয়েরা। গ্রীসের সেই নাতিশীতোষ্ণ দেশের থেকে হঠাৎ পোল্যাণ্ডের হাড়কাঁপানো শীতের মধ্যে ফেলে দেওয়ায় মশা মাছির মতো পটাপট্ মরতো। তার ওপর প্রবল রক্ত আমাশা আর টাইফাস্ তো আছেই। এই সব রোগের এক এক ঝাপ্‌টায় ক'দিনের মধ্যেই বেশ কয়েক শো করে খালাস হয়ে যায়। যাই হোক্ আমার এ পরিবেশে খাপ খাইয়ে নিতে খুব একটা কষ্ট হয় নি। ইতিমধ্যে আমিও যথেষ্ট শক্ত হয়েছি।

আবার সকালবেলায় গুণতির পালা। পাঁচজনের দলে ভাগ হয়ে সেই সকাল চারটে থেকে দাঁড়িয়ে থাকা। যদিও গুণতি আরম্ভ হতে হতে সেই ছ'টা বেজে যাবে।

ব্লক থেকে বেরোতে আমাদের থালায় কিছুটা জলের মতো পদার্থ ঢেলে দেওয়া হলো। এমনিতেই খুব তেষ্টা পেয়েছিলো। গতকাল সাউনাতে যেটুকু জল খেয়েছিলাম, তারপবে আর জল পাই নি। ও হরি, এটা নাকি চা! কাদা-রঙের পদার্থটা চুমুক দেওয়াব জন্য মুখের কাছে তুলতেই বমি আসার জোগাড়। বেশীর ভাগ মেয়েই পুরোটা খাচ্ছে না। কিছুটা খেয়ে বাকীটা দিয়ে মুখ ধুচ্ছে। পুরোটা খেলে নাকি অবধারিত ডাইরিয়া।

রাত্রে সাপারের জন্য যে রুটির টুক্‌রোটা পেয়েছিলাম, পুরোটা খাই নি। জামার ভেতরে অর্ধেকটা রেখে দিয়েছিলাম। হাত দিয়ে দেখি টুকরোটা নেই। হয় পড়ে গেছে ঘুমের ঘোরে, নয় কেউ চুরি করে নিয়েছে। দৌড়ে বাংকের কাছে এসে আঁতিপাতি করে খুঁজেও না পেয়ে মরা জিপ্‌সী মেয়েটাকে সার্চ করতেই ওর ব্লাউজের ভেতরে লুকিয়ে রাখা রুটিব কয়েকটা টুকরো বেরিয়ে পড়লো। ওর তো আর এ জীবনে রুটির টুকরোগুলোর প্রয়োজন পড়বে না, তাই আমি নিয়ে জামার ভেতরে রেখে দিই।

বিটারফেল্ডের অন্যান্য মেয়েদের থেকে আমি আর মা একরকম বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েছিলাম। আমাদের ব্লকের এক হাজার বন্দীর ভীড়ে সবাই মিলে মিশে গেছে। আমাদের মধ্যে সবচেয়ে কনিষ্ঠতম ইয়াংকা সুযোগ সুবিধে বেশী পেয়েছে। এর আগে এতো ছোট কাউকে ক্যাম্পে রাখে নি। সোজা অন্যদিকে পাঠিয়ে দিয়েছে। যদিও ওর বয়েস বারো, তবু ছোটখাটো বলে বছর আটেকের বেশী মনে হয় না। প্রথম দিনেই ওকে দল থেকে সরিয়ে নিয়ে গিয়ে ম্যাসাঞ্জারের কাজে বহাল করেছে। আরো পাঁচ-ছ'টা মেয়ে এ কাজে নিযুক্ত। নাৎসী কর্তৃপক্ষের সঙ্গে ক্যাম্পের বন্দীদের যোগাযোগ রাখার জন্য সদা-সর্বদা যে সংবাদ আদান-প্রদানের প্রয়োজন পড়ে সেই কাজেই মেয়েগুলোকে রাতদিন দৌড়াদৌড়ি করতে হয়। কাজ না থাকলে মেইন গেটের কাছে কাজের জন্য চুপচাপ দাঁড়িয়ে থেকে অপেক্ষা করা। ওদের থাকা খাওয়ার ব্যবস্থা আমাদের চেয়ে অনেক ভালো। যে ব্লকে থাকে তাতে আমাদের ব্লকের মতো গাদাগাদি ভীড় নেই। প্রত্যেকের জন্য আলাদা কম্বল। খাওয়া দাওয়াও অপর্যাপ্ত। তাই সুযোগ খুঁজলাম ইয়াংকার যদি দেখা পাওয়া যায়। মা বিটারফেল্ডে থাকতে যতটা পেরেছে ওকে ভালোভাবে রেখেছে। তার পরিবর্তে যদি কিছু ওর কাছ থেকে

পাওয়া যায়। ইয়াংকার দৌলতে ওর দিদিকেও ব্লকোভা করে দিয়েছে। ওর দিদির সঙ্গে কালেভদ্রে চোখাচোখি হলে আমার দিকে কয়েক টুকরো রুটি ছুঁড়ে দেয়। এ জীবনে এটা একটা কম প্রাপ্তি নয়।

প্রায় ছ' সপ্তাহ কেটে গেছে। গুণতির ঝামেলা ছাড়া বাকী দিনগুলোতে কাজকর্ম বলতে তেমন কিছু নেই। কিন্তু হঠাৎ একদিন খবর এলো যে পরের দিন থেকে পুরো ব্লকটাকে বাইরে কাজ করতে যেতে হবে। ঠিক সেদিনই রাইটার মেয়েটা এসে মাকে নিয়ে গেল হাসপাতালে কাজ করার জন্য। ভালই হলো। বাইরের কাজে হাড়ভাঙা পরিশ্রম সম্পর্কে অনেক কথা শুনেছিলাম। নিজের ওপরে আত্মবিশ্বাস ছিল যে যেমন করে হোক্ বেঁচে থাকবো। তা'ই মাকে ক্যাম্পের ভেতরের হাসপাতালে কাজ দেওয়ায় হাঁফ ছেড়ে বাঁচলাম। ঈশ্বরের করুণায় বুকে ক্রুশ আঁকলাম।

আমরা সবাই মিলে প্রায় আটশো জন। দু'শো জনের এক একটা দল ভাগ করা হলো। প্রত্যেক দলের জন্য নিযুক্ত একজন কাপো বা দলপতি। তার আবার কয়েকজন করে সহকারী। এক একজন সহকারীর চার্জে বারোজন করে আমরা। নবাগতদের মধ্যে থেকে এই কাপো বা দলপতি নির্বাচিত করা হয় না। ওগুলো পুরনো বন্দীদের সম্পত্তি। যাই হোক্, দল বেঁধে গেটের বাইরে যাওয়ার সময় কাপো বারে বারে সাবধান করে দিলো, মারচের সময় পা যেন সামনে থাকে, আর কেউ যেন ঘাড় ফিরিয়ে পেছনের দিকে না তাকায়। কারণ গেটে শুধু ক্যাম্প ইনচার্জ ড্রেচ্‌লারই নেই, হাস্, গ্রীজ্ বোরম্যান এবং তাবড় তাবড় নাৎসীরা দাঁড়িয়ে পর্যবেক্ষণ করবে এই মারচ। যতদূর পারা যায় ওদের নির্দেশ মেনে শেষ পর্যন্ত দল বেঁধে আমরা মেইন্ গেট দিয়ে বেরিয়ে পড়লাম।

মারচ করতে করতে এগিয়ে চললাম। ক্যাম্পের শেষে বেড়ার পর বেড়া। শেষে ধূ ধূ করা মাঠ। ডানে বাঁয়ে পরিত্যক্ত খামারবাড়ী। গ্রামবাসীরা অনেক আগেই গ্রাম ছেড়ে অন্য কোথাও চলে গেছে। আমরা রেল লাইনের পাশ দিয়ে হাঁটছি। মাঝে মাঝে বন্দী ভর্তি ট্রেন যাচ্ছে ক্যাম্পের দিকে। কম্পার্টমেন্টের ভেতর থেকে ভীত অসহায় দৃষ্টিতে আমাদের দিকে তাকাচ্ছে।

ঘণ্টা দুই একটানা কয়েক মাইল পথ হাঁটার পর থামার আদেশ হলো। আমাদের পেছন পেছন গার্ড ওয়াচ্ ডগ্ সঙ্গে নিয়ে হাঁটছে। একনাগাড়ে কাদায় বসে যাওয়া খড়ম টানতে টানতে হাঁটার যে কী কষ্ট! কিন্তু তখনো বুঝি নি, দিন আমাদের এখনো শুরু-ই হয় নি। এক পাশে বিরাট বিরাট পাথরের

চাঁই পড়ে আছে। আমাদের ওপরে আদেশ হলো বেশ কিছুটা পথ পাথরের চাঁইগুলো বয়ে নিয়ে গিয়ে যে জায়গায় একদল বসে পাথরগুলো ভাঙছে, সেইখানে নিয়ে যেতে। তারা আবার ওগুলো টুক্‌রো টুক্‌রো করে স্টোন চীপ্‌ দিয়ে রাস্তা তৈরী করবে।

পাথরের চাঁইগুলোর আকার দেখেই তো আমার বুক হিম। এতো বড়ো পাথরের চাঁই তুলবো কী করে? এক একটার ওজন আমার চেয়েও অনেক বেশী। আমাকে হতভম্ব হয়ে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে, কাপো এগিয়ে এসে আমার পাছায় সজোরে একটা লাথি কষিয়ে চিৎকার করে ওঠে, —এই শূকরী, জল্‌দি গিয়ে পাথর তোল্‌।

এগিয়ে গিয়ে গায়ের সমস্ত শক্তি জড়ো করে একটা পাথর তুলতে চেষ্টা করলাম। তোলা তো দূরের কথা, পাথরটাকে নাড়াবার ক্ষমতাও আমার নেই। খুঁজে পেতে ছোট আকারের কয়েকটা পাথর বার করলাম। দরদর করে ঘামছি তখন। শরীরটা যেন অবশ হয়ে আসছে। মেরুদণ্ডটা দু' টুক্‌রো হয়ে যাবে বলে মনে হচ্ছে। পেটে যন্ত্রণা অনুভব করছি। তারপর আমাশার পেট কামড়ানি তো আছেই। কয়েকবার পাথরটা তোলবার চেষ্টা করে কাদায় আছড়ে পড়লাম। এখন মনে হচ্ছে যে কোনো মুহূর্তে ধুকপুক করা হৃদ্‌পিণ্ডের স্পন্দনটা যেন বন্ধ হয়ে যাবে।

কুকুর সঙ্গে নিয়ে একটা নাৎসী মেয়ে ছুটে এসে তীক্ষ্ণ গলায় চিৎকার করে, — কাম্‌ অন ইয়ু ষ্টিংকিং ওল্ড লেমন্‌! মুখের ওপরে সজোরে একটা চাবুক আছড়ে পড়লো। পাছায় লাথি। এইখানে থাকলে কয়েকদিনের বেশী বাঁচা কিছুতেই সম্ভব নয়।

ঠিক সেই সময়েই হুইসেল বেজে উঠলো। ডিনারের জন্য বিরতি। কিন্তু ততক্ষণে আমি কাদার ওপরে শুয়ে পড়েছি। উঠে যে স্যুপ খাবো, সে শক্তিটুকুও আর নেই। সন্ধ্যের সময় দেখি অনেক মেয়েই আমার মতো কাদায় শুয়ে পড়েছে। আগামী কয়েকটা ঘণ্টাও আর পৃথিবীর আলো দেখবে কিনা সন্দেহ। আবার পাকা দুটো ঘণ্টা মারচ করে ক্যাম্পে ফিরে যাওয়া আমার পক্ষে অসম্ভব। তাই যাদের তখনো পর্যন্ত হাঁটার ক্ষমতা আছে, তারাই আমাদের হাত ধরে টেনে হিঁচড়ে নিয়ে চললো। তার ওপর আবার নাৎসী মেয়েগুলোর আদেশে গান করতে করতে। পথে দেখলাম একদল পুরুষও যাচ্ছে। তাদের অবস্থাও আমাদেরই মতো। যারা হাঁটার ক্ষমতা হারিয়ে ফেলেছে, অন্যান্য কমরেডরা তাদের কাঁধে বয়ে ক্যাম্পে ফিরিয়ে নিচ্ছে

চলেছে। তেষ্টায় বুকের ছাতি ফাটার জোগাড়। এক ফোঁটা জল যদি পাওয়া যেতো। নিদেন গলা ভেজাবার জন্য কয়েক ফোঁটা বৃষ্টি। ইচ্ছে করে মাটির ওপরে টান হয়ে শুয়ে পড়তে। কিন্তু যে করেই হোক্‌, মনের জোর আনতেই হবে। ক্যাম্পে ফিরে গিয়ে এর ওপর আবার ঘণ্টা দুই ধরে গুণতির পালা। শেষে একফালি শোওয়ার জায়গার জন্য মারামারি।

মাঝরাতে ঘুম ভেঙে চিন্তা করি পাথর বওয়ার হাত থেকে কি করে রেহাই পাওয়া যায়। এমন কি এর থেকে পাথরগুলো টুকরো করে ষ্টোন্‌ চীপ্‌ তৈবী করার কাজও কম কষ্টকর। পরেব দিন সকালে কাপো আমাদের দলটাকে কাজের জন্য বাইরে নিতে এলে, লুকিয়ে অন্য দলের সঙ্গে ভিড়ে গেলাম আমি।

নতুন দলের সঙ্গে আবার ঘণ্টা দু'য়েকের মারচ করা শুরু হলো। এ দলের কাজ হলো মাটি খোঁড়া। প্রত্যেকটি মেয়েকে নির্দিষ্ট পরিমাণ জমি দাগ দিয়ে দেওয়া হলো। সারাদিনে দাগ দেওয়া জমি খুঁড়তে হবে। প্রথমে ভেবেছিলাম চাষবাষেব জন্য, একটু পরে বুঝতে পাবলাম আসলে আমরা কবর খুঁড়ছি। খুঁডতে গিয়ে কোদালটা মাটিতে বসে যায়। এতো কাদা থেকে কোদালটাকে টেনে তোলা বীতিমতো শক্তির ব্যাপাব। যাই হোক্‌, তবু জমি খোঁড়া পাথর বওয়াব চেয়ে সহজ। আমাকে ক্লান্ত হয়ে পড়তে দেখে নীচু গলায় পাশের মেয়েটা বলে,—মনে করো ওদেব জন্য এই কবরগুলো খুঁডছো। তা'হলে দেখবে মনে জোব পাবে। ক্লান্তি আসবে না।

প্রায় সপ্তাহখানেক গড়িয়ে গেল ক্যাম্পের বাইবে গিয়ে কাজ কবতে করতে। শরীরেব ওপব দিয়ে বৃষ্টি বরফ প্রচুব গেছে। তার ওপব হাঁটু পর্যন্ত কাদা তো আছেই। কয়েকবার কুকুবে কামড়েছে। জায়গায় জায়গায় চাবুকের আঘাতে ফুলে উঠেছে। উপরন্তু, প্রায় রোজই কাজ থেকে ফেরাব পথে জ্ঞান হারানো কাউকে পিঠের ওপর বয়ে নিয়ে আসতে হয়েছে। আর তাব ওপর হাড়ে সূচ ফোটানো ঠাণ্ডা তো আছেই। পাকস্থলীটা ক্ষিদেতে অহরহ মোচড় দিচ্ছে শরীরের প্রতিটি অঙ্গ-প্রতঙ্গ ক্ষত-বিক্ষত। হৃদ্‌পিণ্ডটা যেন দিনের পর দিন দুর্বল হয়ে পড়ছে। যে কোনো মুহূর্তে তার গতি স্তব্ধ হয়ে যেতে পারে। সকালবেলা হলেই আমরা অপেক্ষা করতাম। কখন কাজের শেষে ক্যাম্পে ফিরবো। কিন্তু ফিরে এসে সেই ক্লান্তিতে ভেঙে পড়া শরীর নিয়ে আবার দু' ঘণ্টার গুণতির লাইনে দাঁড়ানো আরো কষ্টকর। যন্ত্রণাদায়কও বটে। শেষপর্যন্ত এক টুকরো রুটি। সেই এক টুকরো রুটির জন্যও কুকুরের মতো বিশ্রী মারামারি।

কিন্তু উপায় তো নেই। বেঁচে থাকতে গেলে যে রুটির টুকরোটার নিতান্ত প্রয়োজন। নইলে মৃত্যু তো 'হাঁ' করে ওৎ পেতে বসে আছে। ক্যাম্পে কয়েকদিনের মধ্যেই বুঝে নিয়েছিলাম যে, একাকী এখানে বাঁচা সম্ভব নয়। দু-তিনজনের হলেও ছোট্ট একটা সংসার নিজেদের মধ্যে গড়ে তোলা দরকার। একের প্রয়োজনে অপরে যাতে এসে দাঁড়াতে পারে। শীঘ্রই আমরা দু-তিন জনের একটা গোষ্ঠী তৈরী করে ফেললাম।

আমাদের ব্লকের একটা মেয়ের দল আলুর ক্ষেতে কাজ করতে যেতো। ভেবেচিন্তে নিজেকে সে দলে চোরাই করে দিলাম। ভাগ্য ভালো, ধরা পড়লাম না। মাটি খুঁড়ে আলু বার করা জমি খোঁড়ার চেয়েও সহজ। প্রথম দিনেই দু' বগলের নীচে করে লুকিয়ে দুটো আলু নিয়ে এলাম। কী আনন্দ! একটা ওভারকোট কোনোরকমে ম্যানেজ করতে পারলে আরো বেশী আলু চোরাই করে আনা যায়। স্থির করলাম, যে করেই হোক্ একটা ওভারকোট ম্যানেজ করতে হবে! পরদিন কয়েকটা আলু লুকিয়ে এনে দেখলাম ওভারকোট কেনার মতো হয়ে গেছে। আর সেই ওভারকোটের আড়ালে পাউণ্ড পাউণ্ড আলু চোরাই করে আনতে লাগলাম। তখন তো আমি রীতিমতো বড়লোক। এই চোরাই আলুর বদলে যা ইচ্ছে ম্যানেজ করতে পারি। দিনে দিনে সাহসও অনেক বেড়ে গেল। আমার আরেক বন্ধু ঠিক এই পন্থাতেই গাজর নিয়ে আসতো। ঠিক হলো রাত্রে সবাই ঘুমিয়ে পড়লে এক বন্ধু আগুন জ্বালিয়ে রান্না করবে। কিন্তু তার জন্যে তো জল চাই, কাঠ চাই। আলু আর গাজরেব বিনিময়ে সে দুটো জিনিসও ম্যানেজ হয়ে গেল। আর এই ব্যাপারেই আমি একদিন বিপদে পড়লাম।

রাত্তিরবেলা ক্যাম্পে কারফিউ। অর্থাৎ ব্লকের বাইরে কারো বেরোনো নিষিদ্ধ। ইলেকট্রিক তার দিয়ে ঘেরা সমস্ত ক্যাম্পে শক্তিশালী সার্চ লাইট্ ঘোরে। সামান্য একটা ছায়াও সতর্ক গার্ডদের নজব এড়ায় না। আর বাইরে যদি কেউ ধরা পড়ে, তবে সেই ব্লকের ব্লকোভা তার জন্য দায়ী। সুতরাং ব্লকের দোরগোড়ায় পাহারা দেবার জন্য একদল সহকারীকে সারারাত বসিয়ে রাখে।

কিন্তু আমরা পালা করে তাকে লক্ষ্য রাখতাম। যেইমাত্র সে ঝিমুতে আরম্ভ করতো, আমাদেরও তৎপরতা শুরু হতো। আমি তো টুক্ করে পিছনে গিয়ে হামাগুড়ি দিয়ে বা বুকে হেঁটে দেওয়াল ঘেঁষে একেবারে কাঠের পাঁজার আড়ালে লুকোতাম। কিন্তু সে রাত্রে আমার কপালটাই খারাপ। একজন নাৎসী মেয়ে-গার্ডের নজরে পড়ে যেতে বিদ্যুৎবেগে ছুটে এসে আমার বাংকে শুয়ে পড়েছি।

এতো জোরে এসেছি যে দোরগোড়ায় বসা ব্লকোভার এ্যাসিসটেন্টও আমাকে দেখতে পায়নি। কিন্তু নাৎসী মেয়ে-গার্ডটা ঠিক বুঝে ফেলেছে, কোন ব্লকে ঢুকেছি। সুতরাং ব্লকোভার ওপর কড়া নির্দেশ দিয়েছে, যে বেরিয়েছিলো তাকে খুঁজে বার করো, নয়তো পুরো ব্লককেই শাস্তি দেওয়া হবে। এমন শাস্তি যে শুনলেও শিউরে উঠতে হয়। সুতরাং পরের দিন সকালে আমি নিজে গিয়েই আত্মসমর্পণ করলাম। শাস্তি দেওয়া হলো, পঁচিশ ঘা বেত আর ব্লকোভার কাছ থেকে সজোরে পাছায় বুট পায়ের বিরাশী সিক্কার একটা লাথি। তবু দমলাম না। আগেকার মতোই রোজ রাত্রে বেরোতে লাগলাম।

একদিন খবর পেলাম, ব্লকে বাথরুম বানানো হবে। হাত মুখ ধোয়ার জায়গা ; জলের নলও থাকবে। অবশেষে, সত্যিই কয়েকটা নল বসানো হলো। হাজার হাজার মেয়ের জন্য কয়েকটা মাত্র নল। আমার মতো সাধারণ বন্দীদের অবশ্য সেই নলের চৌহদ্দির কাছে যাওয়ার সুযোগ পাওয়া দুষ্কর।

ক'মাস আগে যে স্নান করেছি তা স্মরণে নেই। যদিও মাঝে মধ্যে বরফ জুটেছে অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ তাই দিয়ে ঘষেছি। ক্যাম্পে যদিও মেয়েরা চাকে জল হিসেবে ব্যবহার করে, কিন্তু সে আর কতোটুকু! বেশীর ভাগ মেয়েই নিজেদেব প্রস্রাবকে দেহ পরিষ্কারের কাজে লাগায় এবং তাদের ধারণা এতে শুধু যে বীজাণু মুক্ত হয় তা-ই নয়, ত্বকের রঙও উজ্জ্বল করে। আমার গায়ের চামড়া বাদামী রঙের, তার ওপর লালের আভাস আছে। কিন্তু চামড়ার ওপরে যে প্রচুর উকুন ঘুরে বেড়ায়, সেগুলোর জ্বালাতেই আমি অস্থির। মাথা ভর্তিও উকুন। বেশী চুলকালেও বিপদ। চামড়ার ফাটা দাগগুলো বিষাক্ত হয়ে ওঠে। আর একবার চুলকাতে শুরু করলে, পাগলের মতো চুলকাতে হয়। সঙ্গে আবার মাছির যন্ত্রণা তো আছেই। অবশ্য মাছিগুলো আমাকে খুব একটা বিরক্ত করতে পারে না। পরনের সার্ট নাড়লেই মৌমাছির মতো দল বেঁধে উড়ে যায়। শুধু জায়গায় জায়গায় লাল থোকা থোকা দাগ রেখে। হঠাৎ দেখলে হামের মতো মনে হয়। আমার সারা শরীরটা তো ঘা আর চুলকানিতে ভরে গেছে। বিশেষ করে পা দুটোয় ; এসব নিয়েও বাঁচার চেষ্টা চালিয়ে যেতে হয়। এই পরিবেশে যতটুকু সম্ভব নিজেকে পরিষ্কার রাখতে হয়। নইলে তো অবধারিত মৃত্যু।

—যে যার ব্লকে যাও। গার্ডগুলোর কর্কশ গলার তীক্ষ্ণ চিৎকারটা কানে আসতেই সবার বুকের রক্ত জমে যাওয়ার জোগাড়। এই চিৎকারটাকে ক্যাম্পের সবাই ভয় পায়। এর মানে দুপুরবেলায় আবার গুণতি। তারপরে

বাছাই। বিশেষ কোনো একটা ব্লকের। কিন্তু কত নম্বর ব্লকের ভাগ্যে আজকে বাছাই ? নাৎসী ডাক্তার মেঙ্গলে, ক্যাম্প কমাণ্ডার হেস্‌লার আর ব্লক কমাণ্ডার টাউবে ধীরে ধীরে বাইশ নম্বর ব্লকের দিকে এগিয়ে যায়। আমরা হাঁফ ছেড়ে বাঁচি। ঈশ্বরের অশেষ করুণা। আমাদের ব্লকের পালা তবে নয়। এবারের মতো তো রক্ষে। বাইশ নম্বর ব্লকের সামনে এরা গেলে, সবাইকে উলঙ্গ হয়ে একে একে এদের সামনে এসে দাঁড়াতে হয়। মেঙ্গলে গ্লাভস্ পরা হাতে আঙুল দেখায়। কখনো বাঁয়ে, কখনো বা ডাইনে। প্রয়োজনে মেয়েদের অতি গোপন স্থানও পরীক্ষা করে। যাদের শরীরে ঘা একটু বেশী, অথবা অনাহারে কংকালসার, তাদের ডাইনের লাইনে গিয়ে দাঁড়াতে বলে। ও লাইনে গিয়ে দাঁড়ানো মানেই মৃত্যু। বাঁয়ে যেতে বললে তবু পববর্তী বাছাই পর্যন্ত বাঁচার আশা আছে। সেদিন চাবশো মেয়ের মধ্যে তিনশো কুড়িজনকে ডাইনের লাইনে গিয়ে দাঁড়াতে হলো। তারপর তাদেব নিয়ে গেল পঁচিশ নম্বর ব্লকে। পঁচিশ নম্বর ব্লকটা খালি থাকলেও ওব ধাবে কাছে কেউ ঘেঁষে না। সবারই একটা ভীতি আছে ওটা সম্পর্কে। মেয়েগুলোকে ঢুকিয়ে সদর দরজাটা বাইরে থেকে পেরেক ঠুকে বন্ধ কবে দেয়। লরী এসে পবে ওদের নিয়ে যাবে। জানালা-গুলো খোলা। ভেতবে উলঙ্গ তিনশো কুড়িটা মেয়ে। তিন চার দিন ওদের ঐ ভাবে রেখে দেওয়া হলো। খাওয়া তো দূরের কথা, একফোঁটা জল পর্যন্ত দেয় নি। সারা দিনরাত কী ভীষণ মর্মভেদী চিৎকার, মরণ আর্তনাদ। কান পাতা দায়। কেউ কাঁদছে, কেউ বা বদ্ধ পাগল হয়ে গিয়ে উঁচু গলায় গান গাইছে কেউ যীশুখ্রীষ্টের কাছে দিনরাত প্রার্থনা করছে। জানালার গরাদের ফাঁক দিয়ে হাত বার করে এক ফোঁটা জলের জন্য প্রাণপণে ভিক্ষে করছে। উঃ, সে কী মর্মান্তিক! কিন্তু জল দেবে কে ? ব্লকের ধারে কাছে যাওয়াও যে নিষিদ্ধ।

এইবার যে কোনো কারণে হোক্ লরী এলো না। তাই পঞ্চম দিনে দুটো নাৎসী গার্ড পঁচিশ নম্বর ব্লকের দরজাটা খুলতে এলো। এতো দুর্গন্ধ যে উভয়েই দরজাটা খুলে লাফ দিয়ে দূরে সরে এসেছে। বেশীর ভাগ মেয়েই মরে গেছে ইতিমধ্যে। একটার ওপর আরেকটা মৃতদেহ স্তূপ করে ডাঁই করা। যে ক'টা মেয়ে নিজেদের প্রাণশক্তির জোরে ওর মধ্যেও বেঁচে আছে, তাদের ব্লকে ফেরত পাঠানো হলে ক্যাম্পে একটা আনন্দের সাড়া পড়ে যায়। এর ওপর আবার জোর গুজব যে ভবিষ্যতে আর এরকম বাছাই হবে না। অবশ্য নাৎসী ক্যাম্পে এসব গুজব বিশ্বাস করাও চরম মূর্খতা। আসলে এখন পর্যন্ত ক্যাম্প কমাণ্ডার বার্লিন হেড কোয়ার্টার্স থেকে সবুজ সংকেত পায়নি। পরের দিন সবুজ সংকেত পেতেই

রাতারাতি আবার মেয়েগুলোকে ব্যারাক থেকে টেনে হিঁচড়ে বার করে উলঙ্গ করিয়ে লরীতে চাপিয়ে সোজা গ্যাস-চেম্বারে পাঠিয়ে দেয়। এ জীবনে এরা আর কখনো ফিরবে না।

ইতিমধ্যে আলু চোরাই করে এনে খাওয়ায় আর বিক্রি করায় রীতিমতো দক্ষ হয়ে উঠেছি আমি। তবু যে-করেই হোক, ক্যাম্পের বাইরে গিয়ে কাজ করার হাত থেকে রেহাই পেতে হবে। নইলে বাঁচা অসম্ভব। এমন কি ক্যাম্প কমাণ্ডার হেস্‌লারের ভাষায়,—এ ক্যাম্পে তিন মাসের বেশী কারো বেঁচে থাকা সম্ভব নয়, যদি না কোনো প্রকারে কর্তৃপক্ষকে কেউ ফাঁকি না দেয়। প্রচণ্ড মানসিক জোর আর ভাগ্য না থাকলে এখানে বাঁচাটা সত্যি অসম্ভব। প্রতিটি পদক্ষেপে এবং মুহূর্তে মৃত্যু ওঁৎ পেতে বসে আছে। চারিদিকের ঘেরা ইলেক্‌ট্রিকের তারের একটু ছোঁয়া, ব্যস্। মুহূর্তে সব শেষ। প্রত্যেক দিনই বেশ কয়েকটা মেয়ের মৃতদেহ তারের আশে পাশে পড়ে থাকে। মাঝে মাঝে আমিও ভাবি, এই দুর্বিষহ জীবনের বোঝাটা ধুঁকে ধুঁকে বয়ে চলার চাইতে মৃত্যু অনেক সহজ; অনেক শান্তিময়। কিন্তু কাপুরুষতার জন্যই শেষ পর্যন্ত পেরে উঠি না।

অনেক রাত পর্যন্ত জেগে জেগে চিন্তা করলাম, কী করে বাইরের কাজের হাত থেকে রেহাই পাওয়া যায়। যদি মাথায় বুদ্ধিসুদ্ধি কিছু থেকে থাকে, এই হলো প্রকৃষ্ট সময় সেগুলোর সদ্‌ব্যবহার করার। চকিতে আমার মাথায় খেলে গেল, পরের ব্লকের একদল মেয়ে এ্যামুনেসান কারখানায় কাজ করে। দু' শিফটে। সকালে আর রাত্রে। কিন্তু ওরা ডোরা ডোরা ফ্রক আর লাল স্কার্ফ পরে। ওটা জোগাড় করতে হবে। কয়েক দিনের মধ্যেই আলুর বিনিময়ে ইপ্সিত জামাকাপড় ম্যানেজ করলাম।

সকালবেলা গুণতির পরেই ড্রেস পরে চুপ করে ওদের দলে নিজেকে পাচার করে দিতাম। যেন রাতের শিফটে কাজ করে ফিরছি। লাইন দিয়ে রেশন নিয়ে ঐখানেই সারাটা দিন ঘুমোতাম। আবার সন্ধ্যেবেলা নিজেদের ব্যারাকে ফিরে এসে রেশন নিতাম। এইভাবে দ্বিগুণ রেশনও যেমন পেতাম, ঘুমোতামও তেমনি প্রচুর। সুতরাং বাইরের কাজ দূরে থাক্, কোনো কাজই আমাকে করতে হতো না। অনেক সপ্তাহ এই করে কাটিয়ে দিলাম। সৌভাগ্যক্রমে কারো নজরেও পড়ি নি।

মা কাজ করতেন হাসপাতাল কম্পাউণ্ডে। সারা কম্পাউণ্ডটা তার দিয়ে ঘেরা। একমাত্র ব্লকোভা ছাড়া আর কারো অধিকার নেই সেই কম্পাউণ্ডে

ঢোকার। তা'ছাড়া সেই হাসপাতালের আশেপাশে সুস্থ লোক দূরে থাক্, অসুস্থ কেউও ঘেঁষতে চাইতো না। হাসপাতাল বলতে অন্যান্য ব্লকের মতো কয়েকটা কুঁড়ে ঘর। ঘরগুলো আবার ভাগ ভাগ করা। মারাত্মক টাইফাস্, টি. বি., আমাশয়গ্রস্ত রুগীদের স্থানান্তরিত করা হতো। সবাই একসঙ্গে। মা'র কাজ ছিলো রাত্রে। অনেকটা নার্সিং গোছের। তার ওপর রুগীদের পাহারা দেওয়া। যাতে রাত্রিবেলা কেউ বাইরে না বেরোয়। ঘেরা তারে সব সময় বৈদ্যুতিক্ প্রবাহ দেওয়া রয়েছে। সেন্ট্রি-বক্সে দাঁড়ানো সতর্ক প্রহরী। হাতে দূরবীন লাগানো দূরপাল্লার রাইফেল। কাউকে দেখলেই সঙ্গে সঙ্গে গুলি। যাকে গুলি করা হলো, সে তো শেষ। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে রাতের ডিউটিরত নার্সের শাস্তিও যে নিদারুণ।

রোগের জ্বালায় বেশীর ভাগ রুগীই পাগল। বাইরে যাওয়ার জন্য কেউ দরজায় লাথি মারছে, কেউ বা চীৎকার করে কাঁদছে। কাউকে একটু জল না দিলেই নয়। মাকে তাই সদাসর্বদা ছোটাছুটি করতে হতো। হাজার খানেক প্রায়-উন্মাদ রুগীকে জল জোগান দেওয়াও তো সহজ কথা নয়।

হাসপাতাল ব্লকটাকে আটটা ভাগে ভাগ করা হয়েছে। এক একটা ভাগের নাম-ষ্টুবেন। দিনের বেলা প্রত্যেকটি ষ্টুবেনের জন্য মাত্র একজন নার্স আর একজন ক্লিনার। সমস্ত রুগীদের দায়দায়িত্ব এদের ওপরেই ন্যস্ত। এক একটা থ্রি-টায়ার বাংকে এপিডেমিকের সময় রুগী উপচে পড়ে। ছ' সাতজন করে। নোংরা খড় বিছানো। একটা করে কম্বল বরাদ্দ তিন-চারজনের জন্য। আর ওষুধ বলতে কয়েকটা ব্যাণ্ডেজ, কয়েক বোতল বীজাণু মুক্ত করার দাওয়াই, আর ম্যানেজ করা ইন্‌জেক্‌সান। সর্বসাকুল্যে এই।

পুরো ব্যারাকটায় টানা একটা হীটিং চ্যানেল চলে গেছে। তিন ফুট উঁচু আর দু' ফুট চওড়া। সেই হীটিং চ্যানেলের একপ্রান্তে ইটের চিমনী। চিমনীটাতে আগুন দিলে চ্যানেলটা গরম হয়ে ওঠে। যেসব রুগীর বিছানা ছাড়ার ক্ষমতা আছে, তারা গা ঘেঁষাঘেঁষি করে বসে এই চ্যানেলের ওপর ঠাণ্ডার হাত থেকে বাঁচতে। একজন মাত্র ডাক্তার, তারও বেশীর ভাগ সময় যায় রুগীদের বিষিয়ে ওঠা ঘা পরিষ্কার করতে। তার ওপর তুলোর অভাবে সেই ঘায়ে কাগজ চিপ্‌টে দেয়।

টাইফাস্ এপিডেমিকের সময় মৃত্যুর হারটা চরমে ওঠে। প্রতিটি ব্লকে দিনে প্রায় শ' চারেক করে মরে। মশামাছির মতো। পটাপট। সেই মৃতদেহগুলো সরানোও খুব একটা সহজ নয়, থ্রি-টায়ারের ওপরের বাংকে মরলে তো আরো

ভয়ংকর। মৃতদেহগুলোকে টেনে-হিঁচড়ে নামিয়ে ব্যারাকের শেষের দিকে প্রথমে ডাঁই করে; বেশ কিছু একসঙ্গে জমলে একদল মেয়ের ওপর ভার পড়ে লরীতে বোঝাই করার। একটা মৃতদেহের দু'দিকে দুটো মেয়ে ধরে দোলায়। তারপর কাপো এক-দুই-তিন বলার সঙ্গে সঙ্গে লরীতে ছুঁড়ে দেয়। সবচেয়ে আশ্চর্য, জীবন-মৃত্যুর ফারাক এখানে এতোই কম যে মেয়েগুলো মৃতদেহগুলো লরীতে ছুঁড়তে ছুঁড়তেই গান গায় অথবা পরবর্তী লাঞ্চ বা ডিনার নিয়ে আলোচনা করে।

নাৎসীদের সব ব্যবস্থার পেছনে সুনির্দিষ্ট একটা প্ল্যান আছে। বন্দীদের নার্ভ আর মরালিটিকে ভেঙে টুকরো টুকরো করে দেওয়া। বিশেষ করে হাসপাতালের রুগীদের রোববার বিকেলে কম্পাউণ্ডে জড়ো করে ক্যাম্প অর্কেষ্ট্রা পার্টি মৃত্যু-সঙ্গীত শোনায়। যাদের অপরিসীম মনের জোর আর ভাগ্য তাদের পক্ষেই একমাত্র বেঁচে থাকা সম্ভব, আর বাঁচাব জন্য দরকার সেই পরিবেশে সত্যিকারের কয়েকজন বন্ধুর।

নাৎসীরা হাসপাতালের ধারে কাছে ঘেঁষে না। ওদেব আবির্ভাব মানে সিলেক্‌সান অর্থাৎ বাছাই। বেশীব ভাগ মুমূর্ষুদেরই লরী করে নিয়ে যায়। সময় সময় নতুন রুগীদের জায়গা করার জন্য পুরো ব্যারাকটাকেই খালি করে। সেই মুমূর্ষু রুগীদের ছুঁড়ে ছুঁড়ে লরীতে গাদা করে। গ্যাস-চেম্বারে নিয়ে যাওয়ার আগে সেই অবস্থাতেই লরীগুলো বেশ কয়েক ঘণ্টা দাঁড়িয়ে থাকে। গরু ছাগলকেও মানুষ বোধহয় এমন নিষ্ঠুরভাবে বধ্যভূমিতে নিয়ে যায় না।

অনেকদিন মা'র সঙ্গে দেখা হয়নি। আসলে হাসপাতালটাকে ইচ্ছে করেই এড়িয়ে গেছি এতোদিন পর্যন্ত। মাকে দেখার ইচ্ছে প্রবল হতেই আবার সকালবেলা গুণতির পরে নিজেকে চোরাই করে দিলাম। মা'র রাতে ডিউটি চলে, দিনের বেলা ঘুমোয়। এরপরে রোজই দিনের বেলা মা'র কাছে যেতাম। আর সন্ধ্যের গুণতির হুইসেল বাজলেই নিজের ব্যারাকে ফিরে আসতাম। অবশ্য রোজ রোজ মা'র কাছে যাওয়ার বিপদ কম ছিলো না। ব্লকোভার হাতে ধরা পড়লে আমার সঙ্গে সঙ্গে মাকেও চরম শাস্তি পেতে হবে। সারাটা দিন রুগীদের মধ্যে একটা বাংকে শুয়ে থাকতাম। কেউ মুমূর্ষু, পাশে রুটির টুকরো পড়ে আছে; কিন্তু হাত তুলে খাওয়ার ক্ষমতা নেই। আবার অন্যদিকে শুয়ে শুয়ে রুগী খিদের জ্বালায় মাথার চুল ছিঁড়ছে। অর্ধ উন্মাদদের চিৎকার, মুমূর্ষুদের গোঙানি। কতোগুলো উলঙ্গ অবয়বের এক টুকরো রুটির জন্য

হাতাহাতি। বিশেষ করে, টাইফাসের পর প্রচণ্ড রকমের ক্ষিদে পায়। যাকে বলে রাক্ষুসে ক্ষিদে। মানুষ তো নয়, যেন কতোগুলো জানোয়ার! বিরাট বিরাট ভুঁই-ইঁদুর বাংক বেয়ে বেয়ে ওপরের তাকে উঠে মুমূর্ষু অথবা মৃতদেহ-গুলোর থেকে মাংস খাব্‌লে নিয়ে ধীরে সুস্থে নামে! দেখতে দেখতে সারা শরীরটা শিউরে ওঠে।

১৯৪৩ সালের শীতকালে আরেকবার বড়োরকমের বাছাই হলো। একসঙ্গে সব ব্লকে। চৌদ্দ ঘণ্টা ধরে। যারা চৌদ্দ ঘণ্টা সমানে দাঁড়িয়ে থাকতে পারবে না, তাদের জন্য সোজা ক্রিমেটোরিয়া। এর পরে ছোটানো। খোদ বার্লিন থেকে ব্লকগুলো খালি করার আদেশ এসেছে। নতুন বন্দীর স্রোত ধরবে কোথায়?

একদিন সকালে রোজকার মতো হাসপাতালের দিকে যাচ্ছি, হঠাৎ অনেকগুলো হুইসেল একসঙ্গে বেজে উঠলো। আর তার সঙ্গে কর্কশ গলায় চিৎকার,—ব্লক খালি করো, খালি করো! বুকটা ভয়ে হিম হয়ে গেল। কয়েকটা মুহূর্ত নড়বার ক্ষমতা হারিয়ে ফেললাম। আবার সেইরকমের বড়ো বাছাই হবে? সংবিত ফিরতেই এক ছুটে ব্লকে ফিরে এলাম। কিন্তু ঈশ্বরকে ধন্যবাদ, গুণতি নয়। আসলে সবাইকে বীজাণুমুক্ত করা হবে। মানে স্নান। আঃ, এক বছর পরে! আনন্দে আত্মহারা হয়ে পড়লাম। উঃ, কতোদিন গায়ে জল পড়েনি। আবার চুল কামাবে; মাথার চুলে হাজার হাজার উকুন বাসা বেঁধেছে। সেগুলোর হাত থেকে নিষ্কৃতি পাবো। রাতদিন চুলকাতে চুলকাতে মাথায় রীতিমতো ঘা হয়ে গেছে।

একসঙ্গে কয়েকটা ব্লককে নিয়ে ঢোকানো হয়েছে সাউনাতে। জলের নল মাত্র কয়েকটা। তা'ও তিন মিনিট অন্তর বন্ধ হয়ে যায়। নাতিশীতোষ্ণ জল, হাতাহাতি মারামারি করেও গা ভেজানোর সুযোগ পাওয়া অসম্ভব। টাওয়াল আর সাবান বলতে কিছু নেই।

পাশের হল্‌ঘরে জামা-কাপড় দেওয়া হবে। কিন্তু তার আগে ডিস্‌-ইনফেক্‌সানের পালা। দিনটা রৌদ্রোজ্জ্বল হলেও নভেম্বর। ঠাণ্ডায় দাঁতকপাটি লাগছে। আমরা পরস্পর পরস্পরকে জড়িয়ে ধরে গায়ের উত্তাপে যতোটুকু গরম হওয়া যায়, চেষ্টা করি। দু' ঘণ্টা হয়ে গেল উলঙ্গ।

বাইরে বিরাট একটা ড্রামে সবুজ রঙের জলীয় পদার্থ। এক এক করে নিজেদের চুবিয়ে আবার লাইন দিয়ে দাঁড়াই, মাথার চুল ইত্যাদি কামানোর

জন্য। একটু দূরে চাবুক হাতে দাঁড়িয়ে নাৎসী গার্ড। আমাদের ব্যাপার স্যাপার দেখে হাসিতে ফেটে পড়ছে। যেন আগাগোড়া পুরো ব্যাপারটাই মজার। ওরা এমনভাবে উপভোগ করছে যেন আমরা কতোগুলো জানোয়ার। লাইন সোজা না থাকলে এগিয়ে এসে হাতের চাবুকের গোড়া দিয়ে জোর খোঁচা দিচ্ছে যৌনদেশে। এক একটা মেয়ের তো রক্তারক্তি ব্যাপার। পুরো ব্যাপারটাতে বেশ কয়েক ঘণ্টা কেটে যায়। সন্ধ্যের মুখোমুখি আবার সেই হুইসেল। অর্থাৎ গুণতি। পাঁচজনের দলে ভাগ হয়ে দাঁড়িয়ে পড়তে হয়। একমাত্র ব্লকোভা আর তার সহকারীরা বাদে আর সবাই উলঙ্গ। তার মানে সবাইকে এই রকম উলঙ্গ অবস্থায় আরো দু' ঘণ্টা ঠায় দাঁড়িয়ে থাকতে হবে, গুণতি শেষ না হওয়া পর্যন্ত। হু হু করা ঠাণ্ডা! যেন হাড় কেটে কেটে বসে যাচ্ছে।

আমার মনে হয় জামা-কাপড়গুলো যে বীজাণুমুক্ত হতে গেছে, এখনো নিশ্চয়ই তা' হয়নি। গুণতির পরেও বীজাণুমুক্ত হয়ে ফিরবে কিনা সন্দেহ। আসলে গুণতির পরেই তো কারফিউ। জামা-কাপড় ফেরত পেতে সেই সকাল। তবু ব্যারাকে ঢুকতে পারলে বাঁচা যায়। আমার বাংকে কম্বল আছে; খড়ের মাদুরের ভেতরে সেঁধিয়ে কম্বল চাপা দিলে তবু এই হাড় কাঁপানো শীতের হাত থেকে তো রক্ষে। কিন্তু ব্যারাকে ঢুকে তো হতভম্ব। বাংকগুলো খালি। কম্বল-টম্বল সব কিছু তা'হলে জামা-কাপড়ের সঙ্গে নিয়ে গেছে? সুতরাং সারা রাত এই উলঙ্গ অবস্থায় থাকা আর হাতাহাতি। সবাই এক মুঠো গরমের জন্য বাংকের ভেতরে ঢুকতে চায়। কিছুক্ষণের মধ্যেই অনুভব করি সমস্ত শরীরটা যেন অবশ হয়ে আসছে। মনে মনে বারবার বলি, আমার শীত লাগছে না। বেশ কিছুক্ষণ পরে দেখি, অনুভূতিটাই চলে গেছে। সমস্ত শরীরটা যেন লোহায় তৈরী।

শেষপর্যন্ত পরের দিন বিকেলের মুখোমুখি ঠেলাগাড়ী ভর্তি করে জামাকাপড় এসে পৌঁছলো। ভিজে সপ্ সপ্ করছে। সুতরাং ছাদের ওপরে ছড়িয়ে দেওয়া হলো ওগুলো। কিন্তু শুকোবে কী করে? আকাশ ভেঙে বৃষ্টি নেমেছে। যাক্, তৃতীয় দিনে ব্লকোভা ছাদে উঠে ছুঁড়ে ছুঁড়ে জামাকাপড়গুলো নীচে ফেলতে লাগলো। আমরা হুড়োহুড়ি করে যে যেটা এবং যতোগুলো পারা যায় কুড়িয়ে নিলাম। যেগুলো গায়ের থেকে খুলে দিয়েছিলাম, সেগুলো নয়। যে যা এবং যেটা পারে। বাড়তি জামাকাপড়গুলো কোথাও জমিয়ে রাখার উপায় নেই। পরে থাকতে হবে; সুতরাং যতোগুলো পারা যায় পরে নিলাম। পরে

এই জামাকাপড়ের বদলে অন্য জিনিষ ম্যানেজ করা যাবে; এমনকি, চামড়ার জুতো পর্যন্ত আমার কপালে জুটে গেল। আঃ, একবছর পরে খড়মের হাত থেকে রেহাই পেলাম! কী নরম জুতোর চামড়াটা। কী আনন্দ!

নতুন জামাকাপড়ে চেক্‌নাই কিছুটা খুললেও শরীর আগে থেকে যেন বীজাণুমুক্ত করা জলীয় পদার্থের দরুন আরো নোংরা হয়ে গেছে। অল্প কয়েকদিনের ভেতরে আবার যে-কে সেই উকুন হাজারে হাজারে এসে জামা-কাপড় আর মাথায় বাসা বাঁধলো। আর এই স্নানের দৌলতে প্রায় শতকরা ষাটজন মেয়েকে গিয়ে হাসপাতালে আশ্রয় নিতে হলো। সুতরাং ব্লক প্রায় খালি। যে ক'জন স্নানের পরে সুস্থ ছিলাম, তাদের অন্যত্র বদলী করা হলো।

আমি যে ব্লকে গেলাম, সেখানকার মেয়েদের কাজ আগের চেয়ে অনেক ভালো। রান্নাঘরে, সাউনাতে, এমন কি কিছু কিছু মেয়ে অফিসে পর্যন্ত কাজ করে। বাকী কয়েকটা মেয়ে আমার দলের। অর্থাৎ চুরি করে লুকিয়ে বেড়ায়। আর আমার অপেক্ষাকৃত ভালো জামাকাপড় আর চামড়ার জুতো থাকাতে সবাই সমীহও করে। স্টাফেরাও পারতপক্ষে কিছু বলে না।

এখানেও অন্যান্য ব্লকের মতো কয়েকজনে মিলে নিজেদের মধ্যে একটা গণ্ডী তৈরী করে ফেললাম। কয়েকটা মেয়ে যারা সাউনাতে কাজ করে, তাদের সঙ্গে ভাবসাব হয়ে যাওয়াতে রোজই ঘণ্টার পর ঘণ্টা সাউনাতে স্নান করতে কোনো অসুবিধে নেই। এতে উকুনগুলোর হাত থেকে যেমন নিষ্কৃতি পেলাম, ঘাগুলোও দিনে দিনে শুকিয়ে এলো। হাসপাতালে মা'র কাছেও আর লুকিয়ে যাওয়ার দরকার হয় না। গেট দিয়ে গট্‌গট্‌ করে যাই। কেউ বাধাও দেয় না।

আর রাত্রে কারফিউর পরে আবার সেই আগেকার জীবন-প্রবাহ শুরু হলো! পেঁয়াজের বদলে ট্রাউজার, মার্গারিনের পরিবর্তে মোজা আর চিনির বিনিময়ে সোয়েটার। এর পরে আছে লুকিয়ে চুরিয়ে রান্না করা। রান্না করা খাবার ক্যাম্পের জীবনে একটা বিরাট বিলাসিতা। একমাত্র অ-ইহুদীরা প্রতিমাসে একটা করে ফুড পার্শেল বাড়ী থেকে আনাতে পারতো। আর রান্নাঘর থেকে চুরি করে আনা খাবারও বিক্রী করতো। অবশ্য ধরতে পারলে ধড় থেকে তৎক্ষণাৎ মাথা বিচ্ছিন্ন। তবে সবচেয়ে বিলাসী খাওয়া ছিলো পটাটো স্যান্‌ড্যুইচ্‌। অর্থাৎ শুক্‌নো দু' পিস্ স্লাইস্ রুটির ভেতরে কয়েক টুকরো সেদ্ধ করা আলু। এটাই ক্যাম্প জীবনে সবচেয়ে শ্রেষ্ঠ খাদ্য।

সাপারের পর হলো এন্‌টারটেইন্‌মেণ্ট। গ্রীসিয়ান মেয়েদের উদাত্ত গলার সুর। তার সঙ্গে ওদের জনপ্রিয় সেন্টিমেণ্টাল গান 'মামুমা' কানে গেলে প্রায়

সকলেই কাঁদতে শুরু করে। কারণ ক্যাম্পের অধিকাংশ মেয়েই তাদের মাকে হারিয়েছে। আর হাঙ্গারিয়ান মেয়েদের নাচ, সেই ছেঁড়া-খোঁড়া পোষাকেই ওরা পুরো ব্যালে করে। এর মধ্যে আবার অনেক লেখকও আছে। যারা মুখে মুখে কবিতা রচনা করে আবৃত্তি করে। তবে সবচেয়ে জনপ্রিয় মিমিকি। বিশেষ করে নাৎসীদের ব্যঙ্গ করে। সব মিলিয়ে মিশিয়ে আমরা চারিদিকের পৃথিবীটাকে উপেক্ষা এবং অবজ্ঞা করে হাসিঠাট্টায় দিনগুলোকে পাড়ি দিতাম। রোজ সন্ধ্যেবেলায় এক জায়গায় জড়ো হয়ে জটলা পাকাতাম। আলোচনার বিষয়বস্তু প্রত্যহই এক। মুক্তি পেলে কী করবো? দৈনন্দিন শোয়া, বসা, খাওয়া এমন কি মুক্তভাবে রাস্তায় উদ্দেশ্যবিহীন হাঁটার মধ্যেও কতখানি আনন্দ। সব আলোচনা শেষ হতো একটা প্রতীক্ষায়। মুক্তি পেলে জীবনের একটা মুহূর্তকেও বিষাদী হতে দেবো না। সব সময় হাসিখুসি আর আনন্দে বাকী জীবনটাকে কাটিয়ে দেবো।

মাঝে মাঝ সাউনাতে কনসার্ট বসে। অবশ্য আমাদের জন্য নয়। ক্যাম্পের এই দুঃসহ জীবনে দীর্ঘ দিন বেঁচে থেকে যে সব বন্দীদের কাপো, ব্লকোভাতে পদোন্নতি হয়েছে, কনসার্ট শোনাব অধিকার একমাত্র সেইসব পদস্থ বন্দীদেরই। আর এই কাপো ব্লকোভার দল নাৎসী মেয়ে-পুরুষেব চেয়েও নির্মম, নিষ্ঠুর। যেমন ষ্টেনিয়া, লিও অথবা খাতিয়ার নামেই ক্যাম্পে ভয়ে সবার মুখ সাদা হয়ে যায়।

একটা কনসার্ট তো আমার জীবনেব শেষ দিন পর্যন্ত মনে থাকবে। কখনো ভুলবো না। ভিয়েনার ইহুদী মেয়ে আল্‌মা রোজ অর্কেষ্ট্রা পরিচালনা করছিলো কন্‌সার্টটার। শুধু তাই নয়, কয়েকটা বিখ্যাত বেহালার সুরও নিজে বাজিয়ে ছিলো। আল্‌মা রোজ। পনেরো নম্বর ব্লকের সামনে জমা বরফের ওপর হাঁটু গেড়ে মাথার পেছনে হাত রেখে দেওয়ালে ঠেস্ দিয়ে বসে বসে শুনছিলাম কনসার্টটা। এই সময়েই আমাদের ব্লকের একটা মেয়ে ধবা পড়ে। তার প্রিয়তমাকে চিঠি লিখছিলো। ক্যাম্প জীবনে এটা একটা জঘন্য অপরাধ বলে পরিগণিত। যদিও ছেলেদের ক্যাম্প আমাদের ক্যাম্পের থেকে বেশ কিছুটা দূরে। তবু যোগাযোগের কানাগলিপথ আছে। এই অপরাধে ধরা পড়লে শাস্তি হিসেবে তাকে বাংকারে পাঠানো হয়। বাংকার হলো এক ধরনের সেল। যাতে স্রেফ দাঁড়িয়ে থাকার মতো অল্প একটু পরিসর। বসা বা শোওয়ার উপায় নেই। খাওয়া বলতে শুধু এক টুকরো রুটি আর জল। এক ঠায় দিনের পর দিন দাঁড়িয়ে থাকতে থাকতে বেশীর ভাগই মারা যায়। আর সেই ব্লকের বাকী বন্দীদের

সারাদিন হাঁটু গেড়ে ব্লকের বাইরে বসে থাকতে হয়। নাৎসীরা যদিও হাসি-মস্করা করে পুরো ব্যাপারটাকে স্পোর্টস বলে।

আউস্‌ভিৎজ্‌ বীরখেন্‌হাউতে আমার তখন বন্দী জীবনের দ্বিতীয় বছর চলছে। ইতিমধ্যে ক্যাম্পের প্রায় প্রতিটি বিষয়ই আমার নখদর্পণে। কি করে জামাকাপড অথবা খাদ্য ম্যানেজ কবতে হয়, অথবা দিনের পর দিন কাজে ফাঁকি দেওয়া যায়। এখানে বেঁচে থাকতে হলে কাজে কি করে ফাঁকি দিতে হয় সেটাই সবচেয়ে আগে জানা দরকার। এমন কি সামান্যতম বিপদের গন্ধও আমি আগে থেকে টের পেয়ে যেতাম। যখন ব্লক নম্বর পনেরোর জীবনযাত্রা মোটামুটি রকমের সড়গড় হয়ে এসেছে, তখনই ঘটনাটা ঘটলো।

সেদিন রাত্রে কিছুতেই ঘুম এলো না। এপাশ ওপাশ করলাম অনেকক্ষণ। কখনো গরমে ঘামছি, পবমুহূর্তেই আবার ঠাণ্ডায় কাঁপছি। সাধারণতঃ একবার বাংকে পড়তে পারলে কাঠের গুঁড়িব মতো ঘুমোই আমি। সকালের হুইসেল না বাজা পর্যন্ত যাকে বলে বেহুঁশ। মনে হলো শরীরটা যেন খারাপ লাগছে। তবে কী টাইফাস্‌ হতে পারে? তাড়াতাড়ি অথবা দেরীতে সবাইকে একবার টাইফাস্‌ আক্রমণ করে। আর একবার টাইফাসের আক্রমণ হলে বাঁচার সম্ভাবনা খুবই কম। আব তার ওপরে হাসপাতালের অবস্থা নিজের চোখেই দেখেছি। নরকের চেয়েও ভয়াবহ।

সকালবেলায় ঘুম থেকে উঠে দাঁড়ানোর চেষ্টা করতে পা ভেঙে মাটিতে বসে পড়লাম। পা দুটো যেন তুলোর তৈরী। দেহের ভার বইতে অক্ষম। সকালের গুণতির পরেই আমাকে টেনে হিঁচড়ে হাসপাতালে নিয়ে গেল। আমার তখন পুরোপুরি জ্ঞান না থাকলেও ব্লকোভার কাছে বারবার কাতর স্বরে প্রার্থনা করতে লাগলাম, দয়া করে আমাকে যেন হাসপাতালের বারো নম্বর ব্লকে নিয়ে যায়। আর কিছু না হোক্‌, মা তো আছে।

পুরো ব্লকটা রুগীতে টইটুম্বুর। উপচে পড়ছে। আমাকে যে বাংকে ছুঁড়ে দিলো, তা'তে আরো তিনজন রুগী। একজনের ডিপ্‌থিরিয়া, আরেকজনের ম্যালেরিয়া আর তৃতীয় জনের আমার মতোই টাইফাস্‌ এবং প্রত্যেকের অবস্থাই সংকটাপন্ন। বিশেষ করে টাইফাসে আক্রান্ত মেয়েটাকে নিয়েই হয়েছে যতো জ্বালা। একে তো মেয়েটার জ্ঞান নেই। তার ওপর অবিশ্রান্ত হাত-পা ছুঁড়ে চলেছে। অন্যেরা ক্রমাগত অনুরোধ করলেও মেয়েটার অবস্থা তখন সেসব কথা শোনার বাইরে। আমার মুখের ওপরেও মাঝে মাঝেই মেয়েটার পায়ের

লাথি এসে পড়ছে। সেই ঘোরে স্বপ্ন দেখছি, আমি বাড়ীতে। পায়ের তলায় থরে থরে সাজানো আঙুর, আপেল, কমলা। কতো-রকমারী ফল আর কোল্ড ড্রিংকস্। মা সামনে দাঁড়িয়ে থাকলেও চিনতে পারি না। নিষ্ঠুর ভাষায় একনাগাড়ে মাকে গালাগাল দিয়ে চলেছি। কেন ফলগুলো আর কোল্ড ড্রিংকস্ এগিয়ে দিচ্ছে না। মাথাটা যেন তীব্র যন্ত্রণায় এক্ষুণি ফেটে পড়বে ; গলার নলিটা অসহ্য তেষ্টায় শুকিয়ে কাঠ। মা সারারাত আমার পাশেই। কোনো-রকমে ম্যানেজ করে আলুর স্যুপ রান্না করে একটু একটু করে আমার গলায় ঢেলে দিয়েছেন। দিনের বেলায় মা র ইচ্ছে থাকলেও নিষেধ।

একদিন আমি প্রায় অজ্ঞান হয়ে শুয়ে রয়েছি, ঠিক এমন সময় বারো নম্বর ব্লকে এলো বাছাই। মানে যারা বিছানা ছেড়ে উঠতে অক্ষম, তাদের ছুঁড়ে ছুঁড়ে লরীতে গাদা করে সোজা গ্যাস-চেম্বারে পাঠিয়ে দেবে। মা সেদিন আমাকে অতিকষ্টে খড়ের মাদুরের নীচে লুকিয়ে রাখলেন। আর মনে মনে প্রার্থনা করতে থাকলেন, আমি যেন চুপটি করে থাকি। কারণ আমি তখন কখনো প্রলাপ বকছি, কখনো বা উঁচু গলায় গান গাইছি। যাইহোক্, নাৎসী ডাক্তার আমার বাংকটা পেরোলে মা হাঁফ ছেড়ে বাঁচেন। আবার ভাগ্য আমাদের রেহাই দিয়েছে।

অনেকদিন পর্যন্ত আমি সেই জ্ঞান-অজ্ঞানের মাঝামাঝি অবস্থায় ছিলাম। তারপর ধীরে ধীরে আবার যেন প্রাণ ফিরে এলো। প্রথমে বসতে, তারপর ধীরে ধীরে হাঁটতে শুরু করলাম। রোজ কয়েক পা করে বেশী হাঁটতাম। প্রতিটি পদক্ষেপের সঙ্গে সঙ্গে বাঁচার আনন্দ নতুন করে অনুভব কবতাম। পা দুটোর দিকে অবাক বিস্ময়ে দেখতাম। পা দুটো দেশলাইয়ের কাঠির মতো সরু লিকলিকে হয়ে গেছে। সারা শরীরে শুধু হাড় ছাড়া মাংস বলতে কিছু নেই। চামড়াটা ঝুলে পড়েছে। মাথার চুল থেকে পায়ের নখ পর্যন্ত দগদগে ঘা আর চুলকানিতে ভর্তি। এমন কি অসুস্থ অবস্থায় কপালে যে ইঁদুরে কামড়িয়েছে, তার স্পষ্ট ক্ষত।

যদিও শারীরিক দিক থেকে একটু একটু করে উন্নতি হতে লাগলো, তবু মানসিক ভারসাম্য প্রায় সম্পূর্ণ হারিয়ে ফেলেছি। বোকার মতো কথাবার্তা বলতাম, মাকেও চিনতে পারতাম না। মাথার চুলগুলো ইতিমধ্যে বেশ লম্বা হয়ে উঠেছে ; কিন্তু হাত দিলেই মুঠো মুঠো উঠে আসে। কয়েক সপ্তাহ পরে টাক পড়ে গেল। হঠাৎ দেখলে মনে হয় সুন্দরভাবে মাথাটা কামানো। কোনোদিন এই টাকটাতে যে চুল গজাবে তা নিয়ে আমারই তখন চরম সন্দেহ। কিন্তু না ;

ধীরে ধীরে আবার মাথার চুল গজাতে আরম্ভ করলো।

কোনো রুগী টাইফাস্ থেকে সম্পূর্ণ আরোগ্য হবার আগেই এরা ক্যাম্পে ফেরত পাঠিয়ে দেয়। এবং তা'ও সব সময় যে ক্যাম্প থেকে হাসপাতালে গেছে সেই ক্যাম্পে নয়। বেশীর ভাগ ক্ষেত্রেই অসুস্থ হওয়ার পর ফিরে গিয়ে বাইরে কাজ করতে যেতে হয়। যাইহোক, মা ব্লকোভাকে কাতর প্রার্থনা জানাতে, সে আরো কয়েকদিন হাসপাতালে থাকার অনুমতি দেয়।

যখন ঠিক সুস্থ হওয়ার পথে, ঠিক তখনই আবার হঠাৎ একদিন বারো নম্বর ব্লকে বাছাই এলো। তখন অবশ্য আমি মোটামুটি হাঁটতে পারি। মা তো উদ্বিগ্ন। সারা শরীরে চুলকানি, তার ওপর রুগ্ন। একের পর এক উলঙ্গ হয়ে ডাক্তার মেঙ্গলের সামনে গিয়ে দাঁড়ালাম। মেঙ্গলে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে প্রতিটি অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ দেখার পর দৌড়তে বললো। যারা দৌড়তে অক্ষম তারা বাঁ দিকে, আর বাকী সব ডানদিকে। মেঙ্গলে আমার চুলকানি ভর্তি শরীর, অঙ্গপ্রত্যঙ্গ দেখে দৌড়তে বললো। গায়ের সমস্ত শক্তি জড়ো করে নিয়ে দিলাম দৌড়। শেষ পর্যন্ত সব দেখেশুনে মেঙ্গলে আমায় ডানদিকের লাইনে গিয়ে দাঁড়াতে বললো। অর্থাৎ ভাগ্য আরেকবার আমায় বাঁচিয়ে দিলো। জীবনের দিকে গিয়ে দাঁড়ালাম।

শরীর দুর্বল, তার ওপর একনাগাড়ে বেশ কয়েক ঘণ্টা উলঙ্গ অবস্থায় দাঁড়িয়ে থেকে আবার নিউমোনিয়াতে পড়লাম। মা'র আবার রাতের পর রাত জেগে স্যুপ খাওয়ানো, আর সারারাত চুলকানির জ্বালায় যখন অস্থির হয়ে উঠি তখন বাধা দেওয়া। আসলে চুলকোতে চুলকোতে সারা শরীরে তখন দগ্‌দগে ঘা হয়ে গেছে। আর সেই ঘা বিষাক্ত হয়ে গিয়ে বিরাট বিরাট ক্ষতে পরিণত। চামড়া সরে গিয়ে লাল মাংসগুলো বেরিয়ে এসেছে। এর থেকে সেপ্‌টিসিমিয়া অর্থাৎ রক্ত দূষিত হয়ে শ'য়ে শ'য়ে রুগী দৈনিক মারা যাচ্ছে। অসুখটা ক্রমে ক্রমে আরো জটিল হয়ে উঠলো। দুটো কানের ঘাগুলোও বিষিয়ে উঠেছে তখন। একজন বন্দী ডাক্তার সেলাই করার ছুঁচ দিয়ে ফুঁড়ে দিতে একেবারে সম্পূর্ণ বধির হয়ে গেলাম। এবং বেশ কয়েক সপ্তাহ লেগে গেল আবার শ্রবণশক্তি ফিরে পেতে।

প্রায় তিন মাসের ওপরে বারো নম্বর ব্লকে আছি। কিছুতেই আর স্বাস্থ্যটার উন্নতি হচ্ছে না। হজম শক্তি প্রায় হারিয়ে ফেলেছি। ক্যাম্পের খাওয়া দেখলেই বমি আসে। তার ওপর বুকে সর্দি বসেছে। সবচেয়ে খারাপ, বেঁচে থাকার ইচ্ছেটা আর মনের জোর হারিয়ে ফেলেছি। বাঁচার জন্য সংগ্রাম করতে

আর ইচ্ছে করে না। কঙ্কালসার চেহারা। জীবন সম্পর্কে নিস্পৃহ; উদাসীনও বটে। ধীরে ধীরে স্মৃতিশক্তিটা ফিরে আসছে। বাস্তব অবস্থার কথা ভেবে দিনে দিনে আরো বেশী নৈরাশ্য আর হতাশার কালো সমুদ্রে ডুবে যাচ্ছি।

ব্লকোভা রোজই এসে আমাকে তাড়া লাগায় লাগায় ব্লকে ফেরার জন্য। শেষে মা-ই তার হাতে পায়ে ধরে রাজী করায় হাসপাতালেই একটা কাজ দেবার জন্য। শেষপর্যন্ত তার করুণা হয়। যে কারণেই হোক্, উনত্রিশ নম্বর অর্থাৎ ডিসেন্টি ব্লকে আমার কাজ হয়।

স্টাফ হলাম। স্টাফ মানে বন্দীদের থেকে কিছু বেশী সুযোগ সুবিধে। আর? আর গ্যাস-চেম্বারের সিলেক্সান অর্থাৎ বাছাইয়ের হাত থেকে বাঁচোয়া।

ক্যাম্পের ভাষায় আমার কাজ হলো ক্লিনারের। সারাদিন বালতি হাতে রুগীদের মলমূত্র পরিষ্কার করে কিছুটা দূরে খোঁড়া গর্তে নিয়ে গিয়ে জমা করা।

কিছুদিন পরে পদোন্নতি হলো নার্সে। আমার কাজ হলো যে সব রুগী নিজে থেকে খেতে পারে না, তাদের খাওয়ানো। খাওয়া মানে তো শুধু জল। তা'ও সব সময় জোগাড় হয়ে ওঠে না। আর বাকী সময় মৃতদেহগুলোকে বয়ে নিয়ে গিয়ে এক জায়গায় জড়ো করা। এটা আমার পক্ষে খুব সহজ কাজ নয়। একে তো দুর্বল শরীর, তায় এক একটা মৃতদেহের ওজন কম নয়। বেশীর ভাগ মৃতদেহকে বাংক থেকে টেনে হিঁচড়ে নামিয়ে মেঝের ওপর দিয়ে হেঁচড়ে নিয়ে যেতে হয়। এমনভাবে মৃতদেহ টানতে গিয়ে বহু বন্ধু-বান্ধবদের মৃতদেহ দেখতে পেয়েছি। এমন কি একবার তো নিকটতম এক আত্মীয়ার মৃতদেহও ছিলো। কিন্তু আমি কী করতে পারি? সবই ভাগ্যের খেলা।

এই ব্লকে বাছাই লেগেই আছে। হয় টাইফাস্ নয় খালি জায়গার দরুন সপ্তাহে এক একটা বাছাইয়ে দু'তিনশো রুগীকে গ্যাস-চেম্বারের গরু ছাগলের মতো গাদা দিয়ে নিয়ে যায়। ক্যাম্পের শাসন ব্যবস্থায় ডাক্তার মেঙ্গলে, ডাক্তার রোকে অথবা ডাক্তার কনিগ্‌কে নিজে হাতে গ্যাস-চেম্বারের জন্য রুগী বাছাই করতে হয়। কখনো কখনো নাম-কা-ওয়াস্তে ওরা সঙ্গে থাকে, বন্দী কোনো ডাক্তার বা জার্মান ক্রিমিনাল ওদের হয়ে কাজটা সেরে দেয়।

বাস্তবক্ষেত্রে রুগীদের হীটিং চ্যানেলের সামনে উলঙ্গ হয়ে লাইন দিয়ে দাঁড়াতে হয়। যারা বিছানা ছেড়ে উঠতে অক্ষম, তারা তো প্যারেড হবার আগেই যাত্রা করে। অনেক সময় অবশ্য ডাক্তাররা ক্যাম্পের কোনো বন্দী ডাক্তারকে লিষ্ট দিতে বলে। লিষ্টের নাম্বারগুলো মিলিয়ে লরীতে তুলে নেয়।

কখনো কখনো নাৎসী ডাক্তাররা নিজেরাই ঘুরে ঘুরে বাংকে বাংকে চক্ দিয়ে ক্রশ চিহ্ন দিয়ে দেয়। অর্থাৎ যেই বাংকে ক্রশ চিহ্ন পড়েছে, তাদের লরীতে তুলে দেওয়ার দায়িত্ব ব্লকোভার। ক্রশ চিহ্ন দেওয়ার সঙ্গে সঙ্গে রুগীদের অবস্থাও শেষ। ভয়েই ধুকপুক করা প্রাণটা উড়ে যায়।

একদিনের কথা আমি জীবনে ভুলবো না। সেদিন ছিলো আমার জন্মদিন। মা এসেছিলেন আশীর্বাদ করতে। একটা পেঁয়াজ হাতে নিয়ে। ক্যাম্পের খাদ্য তালিকায় পেঁয়াজ রীতিমতো অভিজাত। বিলাসিতা। মা'র ঢোকার সঙ্গে সঙ্গে দেখি সবুজ রঙের ইউনিফর্মও ঢুকছে। তার মানে বাছাই। এবার এসেছে শুধু মুমূর্ষুদের বাছবার জন্য নয়; স্টাফ ছাড়া বাকী সবাইকে গ্যাস-চেম্বারে পাঠানো হবে। তার মধ্যে আমার দু'জন অন্তরঙ্গ বন্ধুও রয়েছে। গতবার সিলেক্‌সানের সময় বাংকের ওপর বিছানো খড়ের মাদুরের নীচে ওদের লুকিয়ে রেখেছিলাম। কিন্তু সবুজ ইউনিফর্ম এবার লাঠি দিয়ে খোঁচা মেরে বাংকের ওপর বিছানো খড়গুলো উল্টেপাল্টে দেখছে। সুতরাং লুকানো অসম্ভব। তা'ছাড়া ক্যাম্প ডাক্তারের সঙ্গে টাউবে, হেড ওয়ার্ডার হাসে প্রভৃতি আরো অনেকে রয়েছে। আমার অন্তরঙ্গ বন্ধু দু'জন পরস্পর সহোদরা। বিটারফেল্ড ছাড়াও অন্যান্য জেলে আমরা একসঙ্গে ছিলাম। যাইহোক্, আমরা স্টাফেরাই শেষ পর্যন্ত সবাইকে শেষ যাত্রার জন্য প্রস্তুত লরীতে তুলে দিলাম। আমি বন্ধু দু'জনকে জড়িয়ে ধরে চুমু খেলাম। ওরা গান গাইতে গাইতে মৃত্যুর পথ ধরে হেঁটে হেঁটে লরীতে গিয়ে উঠলো। এক সময় লরীর ইঞ্জিনটা গর্জে উঠলো। গান আর আর্তনাদের শব্দ বাতাসে মিলিয়ে এলে স্টাফেরা শূন্য ব্লকে ফিরে এলাম।

নিথর নিস্তব্ধ ব্লকটা। শুধু আমাদের কান্নায় ফোঁপানির একটা শব্দ শোনা যাচ্ছে। আমি আর নিজেকে ধরে রাখতে পারলাম না। এই প্রথম চীৎকার করে কান্নায় ভেঙে পড়লাম। মৃত্যু নিশ্চিত জেনেও নিজের হাতে বন্ধুদের লরীতে তুলে দিয়েছি। কিছুতেই ভুলতে পারি না মেয়েগুলোর কাতর প্রার্থনা। জীবন ভিক্ষা আর ভীত দৃষ্টিতে তাকানো। নিজেকে অপরাধী মনে হয়। এর চেয়ে ওদের দলে নিজেও মিশে যাওয়া অনেক ভালো ছিলো। না, আমি আর বাঁচতে চাই না। এতোটুকু বাঁচার ইচ্ছে আর আমার ভেতরে নেই। কি হবে এই জীবন সংগ্রাম করে? মাকে গিয়ে সব কথা খুলে বললাম। আর মা'র জন্যই সেদিন রাত্রে ইলেক্‌ট্রিক তার ছুঁয়ে মরা হলো না। মা সারাক্ষণ বোঝাতে লাগলেন—আশা হারানো পাপ। কিছুতেই আশা ছাড়বে না। দেখো, আমরা ঠিক একদিন এখান থেকে মুক্তি পাবো। নীল আকাশের নীচে গিয়ে দাঁড়াবো।

পরের কয়েকটা দিন এলোমেলো দল ছাড়া মেঘের মতো ঘুরে বেড়াতে লাগলাম। অনেক চেষ্টা করেও কোনো কাজে মন বসাতে পারলাম না। তবু মনকে বোঝালাম, তীর এখনো অনেক দূরে ; যে করেই হোক্ এ বিশাল সমুদ্র যে পাড়ি দিতেই হবে।

খবরটা আগুনের মতোই লক্লক্ করে সমস্ত ক্যাম্পে ছড়িয়ে পড়লো। কয়েকজন স্টাফকে নাকি 'কানাডা কমাণ্ডো'তে যোগ দিতে হবে। কানাডা কমাণ্ডো ক্যাম্পের ডাক নাম। অর্থাৎ যাদের প্রয়োজনের অতিরিক্ত সবকিছু আছে। প্রায় শ'খানেক মেয়ে এই কানাডা কমাণ্ডোর দলভুক্ত যাদের তেল চক্চকে আর পরিপাটি চেহারা দেখেই বোঝা যায়। খাওয়া-দাওয়া জামা-কাপড়ের অভাব নেই। সবচেয়ে বড়ো সুবিধে, এরা যে জিনিষ ইচ্ছে তা-ই ক্যাম্পের ভেতর চোরাই করতে পারে। ক্যাম্প থেকে প্রায় মাইল তিনেক দূরে ওদের কাজ করতে যেতে হয়। যদিও ওটা বীরখেন্হাউ বা ব্রীজিজিনীকির আওতার মধ্যেই পড়ে। যে কোনো কারণেই হোক্, মেয়েগুলো কাজ অথবা কর্মস্থল সম্পর্কে কোনো কথা বলে না। একেবারে মুখে কুলুপ আঁটা। একটা গোপনীয়তা বা রহস্যের চাদরে নিজেদের ঢেকে রাখে। যদিও এই কানাডা কমাণ্ডো সম্পর্কে অনেক ধরনের গুজব ক্যাম্পের আকাশে বাতাসে ভেসে বেড়ায়, তবু মেয়েগুলো ছাড়া আর কেউ কখনো ওখানে যায় নি।

কানাডার জন্য আমি নির্বাচিত হয়েছি জেনে মা মোটামুটি খুশী-ই হলেন। কারণ আমার শরীরের যা হাল তা'তে ভালো খাবার দাবার না পেলে বাঁচার আশা কম। আর যাই হোক্, কানাডাতে তা জুটবে নিশ্চয়ই। কিন্তু শেষ-মুহূর্তে ঠিক হলো, আমাদের এ কাম্পে রাখা হবে না। অন্য কাম্পে স্থানান্তরিত করা হবে। যেটা মা'র পক্ষে সহ্য করা প্রায় অসম্ভব।

বসন্তের আরম্ভ। ১৯৪৪ সালের ঝক্ঝকে একটা সকাল। মাকে বিদায় জানালাম। জানি না জীবনে আবার মা'র সঙ্গে দেখা হবে কিনা। সেই পুরনো অর্কেষ্ট্রাটা আমাদের ক্যাম্পের সদর দরজা পর্যন্ত এগিয়ে দিলো। তারপরেই ড্রামটা একক গলায় উঁচু স্বরে বেজে উঠলো, —বাঁয়ে, বাঁয়ে।

আমরা বাঁদিকে মোড় নিলাম। কিছুটা পর্যন্ত দু'পাশে সারি সারি ক্যাম্প।

তারপরেই মাঠ, ধূ-ধূ করা নীচু প্রান্তর। আর কতোদিন পরে বাদামী রঙের চটচটে কাদা থেকে চোখ গেল সবুজে। এখানে ওখানে দল-বেঁধে অথবা দলছুট বুনো ফুল ফুটে রয়েছে। বাতাসে অল্প অল্প দুলছে। দূরে পাহাড়ের ঢেউ খেলানো সারি। যেন দিগন্তে গিয়ে মিলেছে। আমাদের বাড়ীও এ পাহাড়-শ্রেণীর কাছেই ছিলো। ভাবতেও মনটা খারাপ হয়ে যায়। একদৃষ্টে পাহাড়-গুলোর দিকে তাকিয়েই পথ চলি। কে জানে রাস্তার উল্টোদিকে কি আছে। পুরো ব্যাপারটাতেই উদাসীন হয়ে রাস্তা হাঁটছিলাম। হঠাৎ একজন হাত ধরে টেনে বললো,—রেললাইন দেখে চল।

রেললাইনের দিকে তাকিয়ে দেখি, ইয়ার্ডের কাছাকাছি একটা ট্রেন দাঁড়িয়ে। ভর্তি লোক। সমস্ত ইউরোপ থেকে বন্দী ভর্তি করে নিয়ে এসে এখানে খালাস করে। পুরুষ-স্ত্রীলোক, যুবক-যুবতী, ছোট ছোট ছেলেমেয়ে, এমন কি শিশুক্রোড়ে মা পর্যন্ত। এখানে প্রথমে বাছাই হয়। নাৎসীদেব সামান্য একটু আঙুল দেখানো, ব্যস্ তাতেই হাজার হাজাব মানুষের ভাগ্য মুহূর্তে নির্ধারণ হয়ে যায়। বৃদ্ধ-বৃদ্ধা আর ছোট ছোট ছেলেমেয়েদেব তো প্রথমেই বাঁ দিকের লাইনে গিয়ে দাঁড়াতে হয়। তারপর আমরা যে বাস্তা ধরে হাঁটছি, সেই রাস্তাতেই এগোয়। এই পদযাত্রাই তাদের জীবনেও শেষযাত্রা। যেখানে এরা যায় সেখান থেকে কেউ কখনো আর ফেরে না। এই নির্বোধ হতবুদ্ধি মানুষগুলোর পেছনে নিঃশব্দে একটা কালো ভ্যান্ পিছু নেয়। তা'তে ভর্তি থাকে গ্যাস। সাক্ষাৎ যম। যদিও এ ক'বছরে মৃত্যুর মুখোমুখি বহুবার দাঁড়িয়েছি, তবু কথাটা ভাবতেই মেরুদণ্ড বেয়ে ভয়ের একটা শীতল স্রোত ছুটে পালায়। ভয়ে ভয়ে পেছনে ফিরে তাকিয়ে দেখি, কোনো এ্যামবুলেন্স আমাদের পিছু নিয়েছে কিনা। কিন্তু না। আমরা ক্যাম্পের যতো নিকটে এগোচ্ছি, ততো যেন অজানা একটা ভয় বুক চেপে ধরছে। কি জানি! কী ধরনের অভ্যর্থনা আমাদের জন্যে তৈরী হয়ে আছে, কে জানে!

হাঁটতে হাঁটতে ছোট্ট কিন্তু সুন্দর একটা বার্চ বনে এসে হাজির হলাম। এতোদিনে বুঝলাম জায়গাটার নাম কেন বীরখেনূহাউ। বার্চ গাছের জার্মান নাম হলো বীরখে। জায়গাটা বার্চ গাছে পরিপূর্ণ। সুন্দর বার্চ গাছের জঙ্গলটা কিন্তু হঠাৎ শেষ হয়ে এলো। সামনেই ক্যাম্প। দূর থেকেই বিরাট বড়ো চৌকোণা চারটে আকাশচুম্বী চিমনী দেখা যায়। সামনে এগিয়ে দেখি অদ্ভুত নীচু কতোগুলো লালরঙের বাড়ী। গেটের বাঁ-দিকে সাউনা। পেছনে একটা বড়ো টুকরো জমিতে রকমারী শাকসব্জীর চাষ করেছে। কিছুটা ছেড়ে দিয়ে সাদা

রঙের একটা বাড়ী ; চারপাশে সুন্দর ছাঁটা ঘাসের সবুজ লন, নানারকম উজ্জ্বল রঙের ফুলের বাগান। হঠাৎ দেখলে হলিডে-হোম বলে মনে হয়। সাদা রঙের বাড়ীটা খালি। ভেতরের দেওয়ালগুলো রক্তে মাখামাখি। নির্দোষ লোক-গুলোকে ধরে এনে রোজ এখানে গুলি করে হত্যা করে নাৎসীরা।

একটা রাস্তা সোজা চলে গেছে। লাগার ষ্ট্রাসে। ক্যাম্পের প্রধান রাস্তা এটা। সেই রাস্তা থেকে ডানদিকে আরেকটা সংকীর্ণ রাস্তা এগিয়ে গেছে। সেই সংকীর্ণ রাস্তাটার দু'পাশে ছোট ছোট কুঁড়ে ঘর। প্রায় ছ' সাত সারি। কুঁড়ে ঘরগুলোর পেছনে বাথরুম। তারপরেই কাঁটা তারের বেড়া। ঠিক সেই তারের পেছনেই লালরঙের নীচু কিন্তু চওড়া একটা বাড়ী। সেই বাড়ীটার ছাদ ফুঁড়ে আকাশ ছোঁয়া দুটো চিমনী। এটাই হলো এক নম্বর ক্রিমেটোরিয়াম। ঠিক এর পেছনেই দু'নম্বর ক্রিমেটোরিয়াম। রাস্তার উল্টোদিকেব কুঁড়েঘরগুলোর পেছনে তিন নম্বব ক্রিমেটোরিয়াম। আর সাউনার পেছনে হলো চার নম্বর ক্রিমেটোরিয়াম। আমাদের ঠাঁই জুটলো ঠিক এসবের মাঝামাঝি জায়গায়। পৃথিবীর নরকে।

বাঁ দিকের কুঁড়েগুলোর একেবারে শেষ প্রান্তে তিনতলা বাড়ীর সামনে উঁচু, ছোটখাটো পাহাড়ের মতো ডাঁই করা জিনিষপত্তর। যাদের ইতিমধ্যেই হত্যা করা হয়েছে তাদের। কি নেই তাতে? স্যুটকেশ, ছেঁড়া জামা-কাপড়, জুতো, এমন কি ছোট ছোট ছেলেমেয়েদের খেলনা পর্যন্ত। এই জিনিষপত্তরের স্তূপের পেছনে কাঁটা তার দিয়ে ঘেরা আরেকটা ক্যাম্প। পুরুষদের।

আমাদের কুঁড়েঘরগুলো ক্যাম্পের অন্যান্য কুঁড়েঘরগুলোর তুলনায় অনেক ভালো। প্রায় বিলাসিতার পর্যায়ে পড়ে। আমরা সব মিলিয়ে শ' তিনেক মেয়ে।

থ্রি-টায়ার বাংকগুলোও আগেকার তুলনায় আরামপ্রদ। পুরু খড়ের বিছানা। তার ওপর দুটো করে কম্বল। প্রত্যেকটি ঘরে তিনটি করে জানালা। সেই জানালা দিয়ে গ্যাস-চেম্বার আর ক্রিমেটোরিয়ামগুলো স্পষ্ট দেখা যায়।

ঘরে ঢুকতেই ইসা আমাকে হাত ধরে টেনে জানালার ধারে নিয়ে আসে। কিন্তু আমি কিছু দেখতে চাই না। বিশেষ করে ক্যাম্পের যে কোনো দৃশ্যই ভয়াবহ।

রাস্তায় আসতে আসতেই ইসার সঙ্গে বন্ধুত্ব হয়েছে। ক্যাম্পের জীবন অনুসারে সে বন্ধুত্ব গাঢ় হতেও বিশেষ সময় লাগেনি। সঙ্গে সঙ্গে আমরা একটা পরিবার হয়ে গেছি।

চোখ তুলে তাকাতেই গজ পঞ্চাশেক দূরে দৃষ্টিটা আটকে গেল। সম্মোহিতের

মতো দাঁড়িয়ে পড়লাম আমি। এমন কি নড়াচড়া করার ক্ষমতাটাও কে যেন হঠাৎ আমার শরীর থেকে কেড়ে নিয়েছে। আমি নীরব দর্শক। হ্যাঁ, একজনের নয়, শ'য়ে শ'য়ে নিরীহ মানুষকে জোর করে হলঘরটায় নিয়ে গিয়ে হত্যা করা হচ্ছে। জীবনে এ দৃশ্যটাকে মুহূর্তের জন্যও কোনোদিন ভুলতে পারবো না। সম্ভবও নয়। নীচু বাড়ীটার দেওয়ালে একটা মই লাগানো। মইটা গিয়ে ঠেকেছে ছোট একটা ঘুলঘুলিতে। একজন ইউনিফর্ম পরা নাৎসী মুখে গ্যাস মাস্ক আর হাতে গ্লাভস্ পরে চটপট সেই মইটা বেয়ে ওপরে ওঠে। ঘুলঘুলিটার ওপরের কাঁচের ঢাক্‌নাটা একহাতে তুলে ধরে আরেক হাতে ট্রাউজারের পকেট থেকে একটা ছোট প্যাকেট বার করে। সাদা রঙের পাউডারের প্যাকেট। হঠাৎ পাউডারটা ভেতরে ছুঁড়ে দিয়েই ঢাকনাটা ফেলে দিয়ে একলাফে মই থেকে লাফিয়ে পড়ে মইটাকে ধাক্কা দিয়ে মাটিতে ফেলে ছুটে পালায়। যেন লোকটার পেছনে পেছনে ভূতে তাড়া করেছে।

কয়েক মুহূর্ত বাদেই বাতাসে ভেসে আসে তীব্র মরণ আর্তনাদ। দম বন্ধ হওয়ার যন্ত্রণায় বীভৎস চিৎকার। আমি সঙ্গে সঙ্গে নিঃশ্বাস বন্ধ করে সজোরে হাতের তালু দুটো কানের ওপর চেপে ধরি। কিন্তু আর্তনাদ এতো তীব্র যে মনে হয় সারা পৃথিবীটা শুনতে পাচ্ছে।

কিছুক্ষণ পরে একটা মেয়ে হাতের কনুইয়ের ধাক্কা দিয়ে বলে,—সব শেষ হয়ে গেছে। শুনতে পাচ্ছো আর চিৎকার? আর কেউ চিৎকার করবে না। এরা মরে গেছে।

পাঁচ থেকে আট মিনিট সময় লাগে পুরো ব্যাপারটা ঘটতে। প্রায় সঙ্গে সঙ্গে একদল লোক বন্দী পুরুষদের ক্যাম্প থেকে এগিয়ে আসে বাড়িটার কাছে। এরা হলো সোণ্ডার কমাণ্ডো বা বিশেষ কমাণ্ডো গ্রুপ। এদের কাজ হলো ক্রিমেটোরিয়ার ভেতরে। প্রায় শ'তিনেক পুরুষ এ কাজে নিযুক্ত। আবার কয়েক মাস পরে এদের বদলি করে নতুন দলকে এই কাজের জন্য আনা হবে। এ কাজ পর পর কয়েক সপ্তাহ করার পর মনের দিক থেকে কেউ-ই আর নিজেকে সুস্থ রাখতে পারে না। হয় আত্মহত্যা করে, না হয় পাগল হয়ে গিয়ে গ্যাস-চেম্বারের দরজায় লাইন দিয়ে দাঁড়ায়। আর তা' নাহলে নাৎসীরাই এদের হত্যা করে। কারণ এদের যতোটুকু জানার কথা, তারচেয়ে বেশী-ই জেনে ফেলে। যদি কোনোক্রমে বাইরের পৃথিবীকে একথা জানিয়ে দেয়! তবে? অনেক সময় এরা নিজে হাতে বাপ-মা, স্ত্রী-সন্তান বা নিকটতম আত্মীয় স্বজনের মৃতদেহ গ্যাস-চেম্বার থেকে বার করে ক্রিমেটোরিয়ামে নিয়ে যায়।

কিছুতেই আমি চেষ্টা করেও দৃষ্টিটাকে ওদিক থেকে ফেরাতে পারি না। চিমনীগুলোর মুখ দিয়ে গল্‌গল্‌ করে ধোঁয়া বেরোচ্ছে। মাঝে মাঝে কয়েক ফুট উঁচু লক্‌লকে আগুনের শিখা আকাশের দিকে ঠেলে উঠছে। ধীরে ধীবে ধোঁয়ার কুণ্ডলীগুলো ঘন আর কালো হচ্ছে। বাতাসে একটা বিশ্রী পোড়া গন্ধ। অনেকটা মুরগী ঝলসানোর মতো। চুল আর চর্বি পোড়ার গন্ধ তার-চেয়েও উৎকট। বমি হওয়ার জোগাড। তার মানে এতোদিন ধরে যে গুজব শুনে আসছি তা' মিথ্যে নয়। এখানেই তা'হলে হত্যার কারখানা। সন্ধ্যে যতো এগিয়ে আসছে, আকাশটা চিমনীর আগুনে ততো গনগনে লাল হয়ে উঠছে। চিমনীগুলো যেন রাজরুগী। মুহুর্মুহু গলগল করে রক্ত উগবাচ্ছে। আমাদের ক্যাম্প ঘিরে সব চিমনীগুলোই জ্বলছে। বাতাসের গন্ধে দম বন্ধ হয়ে আসে। সেই রাত্রে আমরা কেউ-ই আর ঘুমোতে পারি না। জানালায় দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখি।

পরের দিন নবাগত দু'শো মেয়েকে দুটো দলে ভাগ করে। একদলের দিনের শিফ্‌টে কাজ, আরেক দলের রাত্রে।

আমাদেব কাজ হলো হত্যা করা লোকজনের জিনিষপত্র বাছাই করা। .একটা কুঁড়ে ঘরে শুধু জুতো বাছাই, অপবটাতে ছেলেদের জামাকাপড। কোনো কুঁড়েতে শুধু ছোট ছোট ছেলেমেয়েদের জিনিষপত্র ইত্যাদি। একটা কুঁড়ের নাম হলো ক্যাম্পের ভাষায় ফ্রেজ ব্যারাক। অবশ্য জার্মান ভাষায় ফ্রেজ ব্যারাক মানে জাব্‌না কাটার ঘর। যেখানে ডাঁই করা খাদ্যদ্রব্য খাদকের অভাবে পচছে। অপরটাতে দামী দামী অলংকার বা টাকা পয়সা, মূল্যবান রত্ন। একটা দলের শুধু কাজ হলো বাইরে ডাঁই করা জমা জিনিষপত্র বয়ে নিয়ে কুঁড়ে ঘরগুলোতে জিনিষ অনুসারে ভাগ করে রাখা।

আমার কাজ হলো নাইট শিফ্‌টে। গ্যাস-চেম্বারে হত্যা করা মেয়েদের জামাকাপড় বাছাই। আমাদের কুঁড়ের বাইরে ডাঁই করা জমা মেয়েদের জামা-কাপড়ের স্তূপ। ছোটোখাটো পাহাড় যেন! সেখান থেকে সাইজ অনুসারে বেছে নির্দিষ্ট সংখ্যক বাণ্ডিল বেঁধে আরেকটা কুঁড়েতে বয়ে নিয়ে গিয়ে জমা করতে হবে। নির্দিষ্ট সংখ্যক বাণ্ডিল জমা হলে পরে লরী এসে এগুলো জার্মানীতে নিয়ে যাবে। রোজই এ রকম বেশ কয়েকটা লরী যায়।

বাণ্ডিল করার সময় সমস্ত পকেটগুলো ভালো করে সার্চ করার নিয়ম। অনেক সময়েই দামী জিনিষপত্র, আইডেন্‌টিটি কার্ড অথবা ফটো বেরিয়ে পড়ে। আমি কিছুতেই সেগুলোর দিকে তাকাই না। যদি পরিচিত কেউ বেরিয়ে

পড়ে? বেশীর ভাগ মেয়েই শিফ্‌টে পাঁচ বাণ্ডিলের বেশী করতে পারে না। এগুলো আবার গুণে গুণে জমা দিতে হয়। একজন নাৎসী মেয়ে-গার্ড সেগুলোক চেক্‌ করে তবে টেবিলের পেছনে ভাঁই করে। বেশীর ভাগ দিনই আমি একটা বাণ্ডিল জমা দিয়ে তক্কে তক্কে থাকি। নাৎসী মেয়ে-গার্ডটা একটু সময়ের জন্য পেছন ফিরলেই হলো। সেই বাণ্ডিলটাই লুকিয়ে নিয়ে এসে আবার ফেরত দিই। এই করে পাঁচবার হলেই ব্যস। লুকিয়ে কেটে পড়ি। কুঁড়ের বাইরে যেখানে জামাকাপড়ের স্তূপ জড়ো করা, তার ভেতরে সেঁধিয়ে টেনে ঘুমোই। একেবাবে রাত ফর্সা না হওয়া পর্যন্ত।

কখনো কখনো দামী জুয়েলারী পাথর হীবে অথবা ডলারও পাই। কিন্তু ওগুলো দিয়ে কী কববো? ববং পুরুষদের হাতে পৌঁছে দিতে পারলে কাজ হবে। ওদের সঙ্গে যে আণ্ডার গ্রাউণ্ড দলের যোগ আছে, তারা এ সবের বিনিময়ে গোলা বারুদ জোগাড় কবে নাৎসীদের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ কবতে পারবে। তাই আমরা আপ্রাণ চেষ্টা করতাম জিনিসগুলো ওদের হাতে পৌঁছে দিতে। যতদিন পর্যন্ত না সে সুযোগ পেতাম, ততোদিন বাক্সবন্দী কবে মাটির তলায় পুঁতে রাখতাম।

একটা ঘটনার কথা স্পষ্ট মনে আছে। কয়েকজন পুরুষ বন্দী এসেছিলো সাউনার বেস্‌মেণ্টের কয়েকটা ড্রাম সারাই করতে। আমাব কাছে তখন বেশ কিছু জুয়েলারী জমে গেছে। কিন্তু পুরুষ বন্দীদের তখন একজন নাৎসী গার্ড পাহারা দিচ্ছে, যাতে আমাদের সঙ্গে কথা বলতে না পারে। হঠাৎ মাথায় একটা বুদ্ধি খেলে গেল। নিরীহ গোবেচারা মুখ করে নাৎসী গার্ডটাকে বললাম, এদেব একটু স্যুপ দিতে পারি? চারিদিক দেখে নিয়ে নাৎসী গার্ডটা বলে,— শূক্‌রী, স্যুপ যদি দিতে হয় তবে চটপট জল্‌দি।

দৌড়ে গিয়ে যতো দ্রুত সম্ভব স্যুপ করে একটা বালতিতে ঢেলে তার তলায় জুয়েলারী ও হীরেগুলো রেখে নিয়ে এলাম। স্যুপ তো নিয়ে এলাম, বন্দীদের বোঝাবো কী করে যে বালতির তলায় কী আছে? ধরা পড়লে অপরাধীর মৃত্যু। যাইহোক্‌, গার্ডটা একটু দৃষ্টি ফেরাতেই ইসারা করলাম। ওদের বুঝতে দেরী হলো না। জীবনে এতো আনন্দ কম পেয়েছি। অবশ্য এতে নাৎসীদের কিছুমাত্র ক্ষতি হতো না। বিশাল সমুদ্রে নেহাৎ-ই শিশির-বিন্দু এগুলো।

চারজন মেয়ে মিলে আমাদের সংসার। ইসা, জোলা, রুডা এবং আমি। এর মধ্যে দু'জনের ডিউটি পড়লো মেয়েদের জামাকাপড় বাছাইয়ের ঘরে।

বাকী দু'জনের ক্রেজ ব্যারাক অর্থাৎ খাদ্য ভাণ্ডারে। বন্ধুরা দলে ভাগ হয়ে কাজ করাতে অনেক সুবিধা। অনেক জিনিস পাওয়া যায় তাতে। যদিও জিনিষ স্পর্শ করা পর্যন্ত কঠোরভাবে নিষিদ্ধ। তবু শুনছেটা কে? এখানে সব কিছুই নিষিদ্ধ, আবার সেই নিষিদ্ধতার আড়ালে সবকিছুই হচ্ছে। সব সময় কাজ করার পদ্ধতি হলে একজন লক্ষ্য রাখে কেউ আসছে কিনা, অপরজন চুরি করে। প্রথম প্রথম সেই চুরি করা খাবার কিছুতেই আমি খেতে পারতাম না। গলায় আটকে গিয়ে দম বন্ধ হয়ে আসতো। ইসা, রুডা আর জোলা আমার সেই অবস্থা দেখে লুটিপুটি হয়ে বলতো,—এতো পুরনো অর্থাৎ পাকা কয়েদী হয়েও তুই একটা আস্ত ইডিয়ট্। এতদিন বাঁচার পর তবে কি এখন মরবি? নাৎসী শূয়োরগুলো হাঙ্গারিয়ান সালামি, ইটালিয়ান সারডিন্, ডাচ্ মাখন আর পোলিশ সুস্বাদু মদ গিলে দিনে দিনে নেচে কুঁদে মোটা শূয়োর হবে আর আমরা শুকিয়ে মরবো, তাই না? চোর জোচ্চোর খুনীর থেকে এইসব খাদ্যে আমাদের দাবী অনেক বেশী সোচ্চার।

সত্যি বলতে কি, আমার বন্ধুরাই ঠিক। এইসব খাবার খাওয়া তো দূরে থাক্ চোখেই যে কতো বছর দেখিনি তার ঠিক নেই। যদিও ধরা পড়লে গলা বন্ধক, তবু সেদিন থেকে মন স্থির করি যতোটা ওদের ক্ষতি করতে পারা যায়। এর পর থেকে নিত্য নূতন আণ্ডারওয়্যার, মোজা, জুতো এবং জামাকাপড় পরতে লাগলাম। রোজ নতুন সিল্কের নাইট্ ড্রেস আর চাদর নিয়ে শুতে আরম্ভ করলাম। অবশ্য এ-সবকিছুই লুকিয়ে লুকিয়ে একান্ত গোপনীয় ভাবে করতে হতো।

একদিন আদেশ এলো, মোটা কোড়া নীল-খয়েরী রঙের বদলে আমরা নীল সাদায় ছাপ ছাপ সামার ড্রেস পরতে পাববো। আদেশ তো হলো কিন্তু সামার ড্রেস কোথায়? সুতরাং আবার সেই ম্যানেজ। নবাগতদের পিঠে লাল রঙের বিরাট ক্রশ্। মোটা, গভীর আর ইঞ্চি পাঁচেক চওড়া আপাদমস্তক সেই ক্রশ্। যতো পুরনো হবে ক্রশ্‌টাও ছোট আব হালকা হয়ে যাবে। মোটা ক্রশের অসুবিধে, যে কেউ ইচ্ছে করলেই তাকে মারধোর বা যে কোনো ধরনের অত্যাচার করতে পারে। যে অত্যাচার করবে তাকে যে নাৎসী হতে হবে এমন নয়। এমন অনেক বিকৃতমনা গার্ড আছে, যারা নবাগতা সুন্দরী যুবতীদের ধরে নিয়ে গিয়ে পুরুষদের ক্যাম্পের কাঁটা তারের এপারে তাদের সম্পূর্ণ উলঙ্গ করে ঘণ্টার পর ঘণ্টা দাঁড় করিয়ে হাতের চাবুকের গোড়া দিয়ে যৌনদেশে অত্যাচার চালায়। কিন্তু ক্রশ্‌টা হালকা হলে এইসব অত্যাচারের হাত থেকে বাঁচোয়া।

সবারই ধারণা সোণ্ডার কমাণ্ডোদের মতো আমাদেরও এরা বেশীদিন বাঁচতে

দেবে না। মুক্তির আশা দুরাশা মাত্র। কারণ প্রত্যহ শ'য়ে শ'য়ে লোকের খুনের সাক্ষী আমরা। যদি বেঁচে ফিরে গিয়ে বাইরের লোকেদের বলে দিই। এখানে আমাদের প্রতিটি মুহূর্ত মৃতদেহ, চুল্লীর আগুন, মেসিনগান আর কাঁটাতার দিয়ে ঘেরা। এমন কি আমাদের সবাই ঈশ্বরের ওপর পর্যন্ত বিশ্বাস হারিয়ে ফেলেছে। যদি সত্যই ঈশ্বর থেকে থাকেন, দিনের পর দিন এতোগুলো নিরীহ নির্দোষ লোকের মরণ আর্তনাদ কি তাঁর কানে পৌঁছতো না? এখানে আমাদের জীবনে 'আজ' আছে, কিন্তু 'আগামীকাল' আসবে কিনা কেউ জানে না।

সুন্দর গ্রীষ্ম। দিনের বেলায় গরমে ঘুমোনো দায়। কিন্তু নাইট্ শিফট্ করে দিনের বেলাতে কিছুটা না ঘুমোলেও তো নয়। তবু দুপুরের পরেই ঘুম থেকে উঠে সামনের সবুজ ঘাসের গালিচার লনে শুয়ে শুয়ে রৌদ্রস্নান করতাম। গরম লাগলে ঠাণ্ডা জলের নীচে গিয়ে দাঁড়াতাম। নিজেদের ভেতরেই নাচ গান করতাম। পুরুষদের ক্যাম্প থেকে রোববারে-রোববারে অর্কেস্ট্রা আসতো। একবার আমরা তিন অংকের একটা নাটকও করেছিলাম। মাঝে মাঝে জামাকাপড় বাণ্ডিল করার সময় যে দু'চারটে বই পেতাম, রোদে স্নান করতে করতে সেইসব পড়তাম। সত্যি বলতে কি, অদ্ভুত একটা পৃথিবীতে বাস করতাম। আমাদের চারিদিকে বীভৎস মৃত্যু, মৃত্যু যন্ত্রণায় বাতাস ভারী, চিমনীর ধোঁয়ায় চারিদিক ধোঁয়াশা, আর আমরা সেই চারদিকের প্রজ্জ্বলিত নরকের মধ্যে বসে হাসি-ঠাট্টা নাচ-গান করছি। যেন আমরা এক একজন এক একটা নীরো। আমাদের ভেতরকার অনুভূতিটাই ততদিনে মরে গেছে।

আমরা যে লনে বসে সান্‌বাথ নিতাম, তার দু'গজেরও কম দূর দিয়ে ছোট রাস্তা সোজা চলে গেছে সাউনা আর গ্যাস-চেম্বারের দিকে। সাউনাতেই বেশীর ভাগ বাছাই করা হতো। রাস্তাটার দু'পাশে কাঁটা তার দেওয়া। এটা তিন নম্বর ক্রিমেটোরিয়ামে নিয়ে যায়। সব জাতের লোকই সেই ভীড়ে মিশেল। আমাদের ওপরে কঠিন নিষেধাজ্ঞা ছিল, এদের সঙ্গে কোনোরকম কথাবার্তা বা ইসারা না দেওয়ার। বেশীর ভাগ বন্দীই পুরো ব্যাপারটাতে সন্দেহ করতো না তবে কেউ কেউ অস্বাভাবিক কোনোকিছুর গন্ধ পেয়ে কিছুটা চনমনে হয়ে উঠে আমাদের দিকে যখন তাকায়, দেখে ভালো খেয়েদেয়ে পুরুষ্ট শরীর, ঝকঝকে জামাকাপড় পরে আমরা সান্‌বাথ নিচ্ছি তখনই ভেতরের উঁকি মারা সন্দেহটা ঝেড়ে ফেলে দেয়। তবু কেউ কেউ ক্রিমেটোরিয়ামটাকে দেখিয়ে জিজ্ঞাসা করে,—ও মেয়ে, তোমরা কি এই কারখানাগুলোতে কাজ

করো ? অথবা, এই কারখানাগুলোতে কি তৈরী হয় ? মাঝে মাঝে আমাদের মধ্যে কেউ কেউ আর নিজেকে ধরে রাখতে না পেরে সত্যি কথাটা বলে ফেলে। আর মুহূর্তে আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়ে লাইন বেঁধে এগিয়ে আসা বিভিন্ন জাতের মানুষগুলোর মধ্যে। অবশ্য সেই বিশৃঙ্খলাকে দমন করতে নাৎসীদের বেশী বেগ পেতে হয় না। কুকুর আর মেসিনগান তো সব সময়েই তৈরী। কয়েক মিনিটের মধ্যে কয়েক শো বন্দীকে চিরদিনের জন্য স্তব্ধ করে মাটিতে শুইয়ে দেয়।

সেই লাইন বেঁধে কাঁটা তারের ভেতর দিয়ে হেঁটে যাওয়া দলের মধ্যে ধনী-নির্ধন সব রয়েছে। মা বাচ্চার হাত ধরে বা শিশুকে কোলে নিয়ে রোদ লাগবে বলে টুপি দিয়ে মাথাটা ঢেকে দিচ্ছে। আগে আগে পুরুষটা সমস্ত সংসার কাঁধে ঝুলিয়ে চলেছে। অনেক ছোট ছোট ছেলেমেয়েরা পেরামবুলেটরে পুতুল বসিয়ে ঠেলে নিয়ে যাচ্ছে। কোনো কোনো ছেলেমেয়ে আবার দুষ্টুমি করে ছোটাছুটি করছে। নির্ভয়ে। এতোক্ষণে যেন খেলার মতো সুন্দর একটা জায়গা পেয়েছে। কেউ এগিয়ে গিয়ে কৌতূহল ভরে দু'চারটে ফুল ছিঁড়ছে। অবশ্য সঙ্গে সঙ্গে নাৎসী গার্ড ছুটে এসে পেছনে সজোরে লাথি কষায়।

আর আমরা লনে শুয়ে শুয়ে মিঠে রোদ্দুর উপভোগ করতে করতে দেখছি, চোখের সামনে শিশুক্রোড়ে মা, গভীর মমতায় সন্তানের হাত ধরা। স্নেহবৎসল পিতা এগিয়ে চলেছে। কয়েক মিনিট বা কয়েক ঘণ্টা পরে এদের দেহ পঞ্চভূতে মিলিয়ে যাবে। বিশ্বাস করতেও পারা যায় না। নিজের দৃষ্টিকেই অবিশ্বাসী মনে হয়। প্রথমদিকে তো বিশ্বাস হতেই চাইতো না। তারপর অবশ্য রোজ রোজ একই দৃশ্য দেখে মনটাতেই কড়া পড়ে গেছে। সবার মতো আমার মনেও ব্যাপারটা আর প্রথমদিকের মতো অতোটা উদ্বেল হয়ে বাজে না। যেমন সেই মানুষপোড়া গন্ধে আর দমবন্ধ হয়ে আসে না। সংসারে অন্যান্য জিনিসের মতো ব্যাপারটা স্বাভাবিক না হলেও আর অতোটা অস্বাভাবিক মনে হয় না।

সেদিন আমরা রোজকার মতো লনে আধ-শোয়া অবস্থায় রোদ্দুরের তাপ উপভোগ করছি। এমন সময় ছোট্ট একটা দল সেই কাঁটাতার দিয়ে ঘেরা রাস্তাটা দিয়ে যাচ্ছে। দেখলেই বোঝা যায় দীর্ঘ অনাহারে প্রাণ-শক্তির শেষ পর্যায়ে এসে পৌছেছে মানুষগুলো। কোনো ক্যাম্প থেকে আসছে নিশ্চয়ই। আমাদেরও সেই একই প্রশ্ন, কোথা থেকে আসছো ?

উত্তর দিলো, —লডজ্ ঘেটো থেকে।

কিন্তু ইতিমধ্যে দেখি রুডা এদিক ওদিক ছোটাছুটি শুরু করে দিয়েছে। ও এগিয়ে যাওয়া দলের মধ্যে ওর বাবাকে চিনতে পেরেছে। রুডা ব্লকোভার কাছে ছুটে যায়। ব্লকোভাকে নিশ্চুপ থাকতে দেখে কানাডা কমাণ্ডোর কাপোর কাছে দৌড়ায়। কাপো সেদিনের নাৎসী গার্ড ইনচার্জ বেডার্ফের কাছে ছোটে। কিন্তু হা হতোস্মি। সবাইকে সোজা দু' নম্বর ক্রিমেটোরিয়ামে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে। সাউনাতে নিয়ে গিয়ে বাছাই পর্যন্ত হবে না। ওপরের নাৎসী কর্তা ব্যক্তিদের আদেশ।

কাপোর অনুরোধে খেঁকিয়ে ওঠে বেডার্ফ,—এইসব কংকালদের দিয়ে আমাদের কী উপকারটা হবে শুনি? রাস্তা অথবা রেললাইন পাতার মতো শক্তি তো এদের গতরে আর নেই। এখন জিইয়ে রাখা মানেই বসে বসে গেলানো। তা' শূকরীর যদি বাপের জন্য এতো প্রাণ টনটন করে, ওকে বলো না বাপের পেছনে পেছনে গিয়ে দাঁড়াক, তবেই তো সব ল্যাঠা চুকে যায়।

এরপর আর কী বলা যায়? কাপো নীরবে ফিরে আসে। রুডা একদৃষ্টে তাকিয়ে থাকে দু' নম্বর ক্রিমেটোরিয়ামটার দিকে। কিছুক্ষণ পরে দু' নম্বর ক্রিমেটোরিয়ামের চিমনীটা দলা দলা রক্ত রঙের আগুন আকাশের বুকে ছুঁড়ে দেয়। ঘণ্টার পর ঘণ্টা স্থবির অনড় হয়ে এক জায়গাতেই দাঁড়িয়ে থাকে রুডা। তারপরে হঠাৎ চিৎকার করে হাসতে কাঁদতে নাচতে গাইতে শুরু করে। অর্থাৎ রুডা ইতিমধ্যে মানসিক ভারসাম্য হারিয়ে পাগল হয়ে গেছে। অবশ্য এটা ওর পক্ষে ভালোই হয়েছে। পৃথিবীর কোনো অভিশাপই আর ওর মনের পলিতে আঁচড় কাটতে পারবে না। পরের দিন সকালে তারের পাশে রুডার মৃতদেহ পাওয়া যায়। রাত্রে কোন এক ফাঁকে গিয়ে তারটা ছুঁয়েছে। মরে বেঁচে গেল রুডা।

১৯৪৪ সালের মে-জুন মাস নাগাদ আমরা আবার আমাদের পুরনো ক্যাম্পের সঙ্গে যোগাযোগ করতে পারলাম। অবশ্যই কাপোর ব্যক্তিগত প্রচেষ্টায় এটা সম্ভব হলো। ঠিক হলো, প্রতি সপ্তাহে ডজনখানেক মেয়ে ঠেলা ভর্তি করে খারাপ জামা-কাপড় যা জার্মানীতে পাঠানোর যোগ্য নয়, নিয়ে মেইন্ ক্যাম্পে যাবে। সাউনাতে ধুয়ে-টুয়ে সেগুলো ক্যাম্পে ব্যবহার করা হবে। এই ব্যবস্থা হওয়াতে আমার মতো অনেকেই খুসী হলো। আমার যেমন মা আছে, অনেকেরই তেমনি বন্ধু বা আত্মীয়-স্বজন রয়েছে সেই ক্যাম্পে। তা'ছাড়া কাপড়-চোপড়ের গাদায় লুকিয়ে জিনিষপত্রও চোরাই চালানের মস্ত সুবিধে।

প্রতিবারেই সেই বারো জনের দলে ভিড়তে ঝগড়া-ঝাঁটি মারামারি হতো। তবে যে করেই হোক্ আমি ম্যানেজ করতাম। একে পুরনো তায় আমার মা আছেন বলে অনেকেই আমার দাবীটাকে মেনে নিতো। অল্প কয়েকদিনের ভেতরে আবিষ্কার করলাম, দাঁতের যন্ত্রণা হচ্ছে বলে কোনো একটা দাঁতে গর্ত দেখাতে পারলে নাৎসী মেয়ে-গার্ডরা একটু নরম হয়। কারণ মেইন্ ক্যাম্পে ডেন্টাল চেম্বার আছে। অবশ্য আধুনিক যন্ত্রপাতি থাকলেও চিকিৎসা হয় না। যাই হোক্, প্রথমবার সেই ক্যাম্পে গিয়ে আগেভাগে হাজির হলাম সেই ডেন্টাল চেম্বারে। একটা সোনার ঘড়ি কবুল করলাম তথাকথিত ডেন্টাল ইনচার্জকে। তার বদলে নাৎসীটা আমাব একটা ভালো দাঁতে গর্ত করে দিলো। যাতে ভবিষ্যতে সেই গর্তটা দেখিয়ে অন্যান্যদের থেকে বেশী সুযোগ-সুবিধে নিতে পারি।

কয়েকবার যাতায়াতের পরেই নাৎসী মেয়ে-গার্ডগুলো আমাকে চিনে ফেললো। এমনিতেই ওরা সদা সতর্ক থাকে, যাতে ক্যাম্পেব ভেতরে চোরাই মাল না ঢোকে। সদর দরজায় ঢোকার মুখে আমাদের দাঁড করিয়ে সার্চ করে। কোনো চোরাই মাল ধরা পড়লে আব রক্ষে নেই। চরম শাস্তি। আমি পিঠে পিন দিয়ে একটা টাওয়েল আটকে নিতাম। ঢোলা জামা-কাপড়ের হাতের মধ্যে লুকোতাম ছোট খাবারের টিন ইত্যাদি। আব মুখেব ভেতরে রাখতাম সোনার ঘডি, ছোট ছোট জুয়েলারী। তবু সেদিন হঠাৎ ধরা পডে গেলাম। একটা সার্ডিন মাছের টিন আমাব কোমরে লুকিয়ে রেখেছিলাম। নাৎসী মেয়ে-গার্ডরা খুঁজে পেতেই এক ধাক্কায় আমাকে মাটিতে ফেলে দিয়ে মুখে সজোরে এক লাথি কষায়। ঠিক এমন সময়ে আরো দুটো মেয়ে ধবা পড়লো। সঙ্গে সঙ্গে নাৎসী মেয়ে-গার্ডটা ওদের দিকে ছুটলো। আরো সার্চ করতে। প্রথমে ওদের উলঙ্গ অবস্থায় দাঁড় করিয়ে পাছায় চাবুক মারা হবে। সেই উলঙ্গ অবস্থাতেই ক্যাম্পের বাইরের কাজে সাত দিন বা চৌদ্দ দিনের জন্য পাঠানো হবে। পাথর তোলা বা পাথর ভাঙার কাজ। পুরুষ বন্দীরা যেখানে কাজ করবে, ঠিক তার পাশে।

প্রত্যেকবার মা'র কাছে এলেই চারপাশের ক্ষুধার্তরা আমাকে ঘিরে ধরতেন। এমন কি আমাকে নিয়ে ওদের মধ্যে রীতিমতো কাড়াকাড়ি পড়ে যেতো। আমি ওপরের জামাটা বাদ দিয়ে সব কিছু খুলে রেখে খালি পায়েই আবার ফিরে আসতাম। ওগুলোর বদলে মা-ও খাবার-দাবার পেতেন প্রচুর। অবশ্য বেশীর ভাগ সময়েই মা ওগুলো বিলিয়ে দিতেন।

একদিন হঠাৎ সার্ডিন মাছের একটা বড়সড় টিন পেয়ে গেলাম। মুহূর্তে নিজের মন স্থির করে ফেললাম। যেমন করে হোক্, যা-ই কপালে থাকুক না কেন, এটাকে ক্যাম্পে মা'র কাছে পাচার করতে হবে। টিনটা দুই উরুর মধ্যে লুকোলাম। কিন্তু ক্যাম্প বেশ কয়েক মাইলের হাঁটা পথ। সুতরাং উরুর মধ্যে নিয়ে হাঁটা বেশ অসুবিধাজনক। তবু খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে কোনোরকমে ক্যাম্পের সদর দরজা পর্যন্ত এলাম। সদর দরজাটা পার হলাম। দু'পাশে দুটো মেয়ের কাঁধে ভর দিয়ে। দরজাটা পার হয়েই বুঝতে পারলাম, ক্যাম্প কমাণ্ডার হেস্‌লার এগিয়ে এসে জিজ্ঞাসা করে, – শূক্‌রীটা খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে হাঁটছে কেন?

পাশের মেয়েটা উত্তর দেয়, – আসতে আসতে পা হড়কে পড়ে গেছে।

পাছায় একটা লাথি মেরে হেস্‌লার চীৎকার করে ওঠে, – দৌড়ো শূক্‌রী, ভাগ হিঁয়া সে।

কোনোরকমে মা'র কাছে এসে হাঁফ ছেড়ে বাঁচি। ভাগ্য আবার আমাকে মাফ্ দিলো। ক্যাম্প কমাণ্ডারের হাতে ধরা পড়লে নির্ঘাত ক্রিমেটোরিয়ামের লাইনে গিয়ে দাঁড়াতে হতো।

একদিন ক্যাম্পে এসে দেখি মা অসুস্থ। টাইফাসে। অবশ্য আশ্চর্য হইনি। সারাক্ষণ যাকে টাইফাস্ রুগীদের পরিচর্যা করতে হয়, আজ হোক্ কাল হোক্ তাকে রোগ আক্রমণ করবেই। তবু বাঁচোয়া। আমি যে চোরাই খাদ্যদ্রব্য নিয়ে আসি, তার বদলে কেউ না কেউ মাকে দেখে। তা'ছাড়া কার্ডিক ষ্টিমুলাণ্ট পর্যন্ত এনে দিয়েছি। যেটা টাইফাস্ রুগীদের পক্ষে অপরিহার্য। মা'দের ব্লকে টাইফাসের সংক্রমণে পটাপট মশা-মাছির মতো রুগী মরছে। সৌভাগ্য-ক্রমে মা'র টাইফাসের ধরণটাও সাংঘাতিক নয়। ভালো খাওয়া দাওয়ায়, সারাক্ষণের পরিচর্যায় আর কার্ডিক ষ্টিমুলাণ্টের দৌলতে মা ধীরে ধীরে সুস্থ হয়ে ওঠেন।

ক্যাম্পে এলে প্রায় সব ব্লকগুলোই আমি ঘুরে ঘুরে দেখি। আমাদের প্রথম তেরোজনের মধ্যে মাত্র চারজন আজ পর্যন্ত জীবিত। দিনের বেলায় ব্লকগুলো খাঁ খাঁ করে। প্রায় সবাইকেই বাইরে কাজ করতে যেতে হয়। আর নবাগতরা কংকালসার চেহারা নিয়ে রান্নাঘর থেকে ফেলে দেওয়া ঘোড়ার হাড় অথবা আলুর খোসার জন্য কুকুরের মতো পরস্পর মারামারি কামড়াকামড়ি করে। মাঝে মাঝে ডক্টর রোডে কম্পাউণ্ডের ভেতরে নিরীহ মুখ নিয়ে ঘুরে বেড়ায়। বন্দীদের সঙ্গে সহানুভূতি মাখানো নরম গলায় কথাবার্তা বলে। দেখলে কে বলবে লোকটা নেকড়ের চেয়েও বেশী হিংস্র। এই লোকটারই অঙ্গুলি হেলনে

হাজার হাজার লোককে গিয়ে গ্যাস-চেম্বারের সামনে লাইন দিয়ে দাঁড়াতে হয়। আর একজন হলো ডক্টর মেঙ্গলে। ক্যাম্পের মেডিকেল ইনচার্জ। লোকটার ক্যাম্পে আবির্ভাব হলেই সবার বুক ভয়ে হিম হয়ে যায়। সুস্থ দেখলেই আউস্-ভিৎজের একটু দূরে মেডিকেল এক্সপেরিমেণ্ট চালাবার ডিসপেন্সারীতে ধরে নিয়ে যাবে। আর ওর সুযোগ্য সহকারীরা তো সব সময়ই তৈরী। সঙ্গে সঙ্গে তার ওপর অদ্ভুত ধরনের অমানুষিক সব একস্পেরিমেণ্ট চালাবে। গ্ল্যাণ্ড ট্রানস্প্লানটেড্, বিভিন্ন ধরনেব সাংঘাতিক বীজাণু ইন্জেক্সান করে শরীরে ঢুকিয়ে দিয়ে তার ফলাফল দেখবে। মানুষের সুস্থ শরীর বীজাণু চাষের জমি হিসেবে ব্যবহার এর আগে পৃথিবীতে কোনো ডাক্তার করে নি। এই ধরনের অপারেশনের পর দুএকদিনের মধ্যেই রুগীটা মারা যেতো। তাই মেঙ্গলেকে ক্যাম্পের ভেতর দেখলেই ব্লকের পেছনে গিয়ে লুকিয়ে পড়তাম। যেন ইঁদুরকে বেড়াল তাড়া কবেছে। আব লুকিয়ে লুকিয়ে দেখতাম মেঙ্গলে কি করে।

কিন্তু একদিন হঠাৎ ধরা পডে গেলাম। মনে মনে ঈশ্বরকে স্মরণ করলাম। হয়তো বা পৃথিবীতে এটাই আমাব শেয দিন। কিন্তু না। সীমান্তে ফাদার-ল্যাণ্ডের জার্মান সৈন্যদের জন্য রক্ত দরকাব। রক্ত নিয়ে ছেড়ে দিতেই আমি চোঁ চোঁ দৌড়। যত তাডাতাডি পারা যায়। বলা যায় না, হয়তো বা মেঙ্গলের মাথায় মুহূর্তে আবার কোনো এক্সপেরিমেণ্টেব পবিকল্পনা ঢুকে বসবে।

সেদিন মেঙ্গলেব মাথায় একটা বিশেষ ধবনের মেডিকেল এক্সপেরিমেণ্টের পরিকল্পনা ঘুরছিলো। যার জন্য মেঙ্গলে হন্যি হয়ে গত কয়েকদিন থেকে যমজ মেয়ে খুঁজে বেডাচ্ছিলো। ট্রেনে ভর্তি বন্দী সাইডিংয়ে এলেই মেঙ্গলে এগিয়ে যেতো ট্রেনের সামনে। তারপব আঁতিপাতি করে খুঁজে বেড়াতো যদি যমজ বোন পাওয়া যায়। কখনো কখনো সারাটা ক্যাম্প তোলপাড করতো যমজ বোনেব জন্য। একদিন যমজ বোনের একজনকে পেতেই পাগলের মতো চিৎকার করে উঠলো মেঙ্গলে,—তোমার যমজ বোন কোথায়? মেয়েটার মুখ ভয়ে সাদা। কাঁপা গলায় মেয়েটা উত্তর দেয়,—আমাদের তো বলা হলো, যারা ক্লান্ত তাদের জন্য লরী অপেক্ষা করছে। তাই আমার যমজ বোন সেই লরীতে উঠে গেছে। পাগলের মতো মাথার চুল ছিঁড়তে শুরু করে মেঙ্গলে। তার মানে মেয়েটা নিশ্চয়ই এতোক্ষণে সোজা গিয়ে ঢুকেছে গ্যাস-চেম্বারে। মেঙ্গলের এক্সপেরিমেণ্ট তখন যমজ মেয়েদের অপারেশান করে দেখা যে তাদের সব গ্লাণ্ডস্ এক কিনা! যেসব যমজদের মেঙ্গলে নিয়ে যেতো এক্স-পেরিমেণ্টের জন্য, তারা আর কোনোদিনই ফিরে আসতো না।

মাঝে মাঝে পুরুষ বন্দীদের স্পোর্টস করাতো বেড়ার ওদিকে। আমরা এদিকে দাঁড়িয়ে দেখতাম। বৃদ্ধ, যুবক, বালক সবাইকে উলঙ্গ করে সার দিয়ে মাঠের মধ্যে দাঁড় করাতো। নাৎসী গার্ড ভাগ্নার চাবুক হাতে স্পোর্টস করাতো, অর্থাৎ ছুটতে হবে। ঘামে এবং দৈহিক ক্লান্তিতে কেউ মাঠের মধ্যে মুখ থুবড়ে পড়ে গেলেই তার পিঠে সপাং সপাং করে চাবুক পডতো। তারপর আবার উঠে দাঁড়াতেই সোজা গুলি। মৃতদেহটাকে অন্যরা বয়ে নিয়ে যেতো ক্রিমেটোরিয়ামে। কখনো কখনো আবার ওদেব ছুটিয়ে পেছনে মোটর সাইকেলে মেসিনগান হাতে নাৎসী গার্ড ক্ষ্যাপা কুকুরের মতো তাডা করতো। পেছিয়ে পড়লেই গুলি। তাই স্পোর্টসের নামেই সমস্ত ক্যাম্প শিউরে উঠতো।

হঠাৎ একদিন নাৎসীদের মধ্যে সাড়া পডে গেল। ব্যস্ততস্থ সবাই ছোট ছোট দলে ঘুরে বেড়াচ্ছে। উত্তেজিত ভাবে কথা বলছে। পরস্পর আলোচনা করছে। সমস্ত পরিবেশটায় একটা অস্বস্তিকর ভাব। ক্রিমেটোরিয়ামের সামনে বিরাট সব গর্ত খোঁড়া হয়েছে। আর তাব পাশে জড়ো করা হয়েছে মোটা মোটা কাঠের গুঁডি, গাছপালা। কানাঘুষোয় যা শুনছি তা'তে বুকের রক্ত জমে যাওয়ার জোগাড়। তবে কি এদের গ্যাস ফুরিয়ে গেছে? হাজার হাজার বন্দীকে কি তবে পুড়িয়ে মারা হবে? ইতিমধ্যে সারা ক্যাম্পে গুজব ছড়িয়ে পড়েছে যে খোদ হেড কোয়ার্টার বার্লিনেব রাইখ্ সিখ্‌হারহাইত্ আমট্ অর্থাৎ জার্মান প্রটেকশান্ ফ্রন্ট, ছোট করে রাসহা, যার ইনচার্জ হলো হিমলার আর আইখ্‌ম্যান,অর্ডার দিয়েছে যে নবাগত আট লক্ষ হাঙ্গারিয়ান ইহুদীকে ছ' সপ্তাহের মধ্যে যে ভাবেই হোক খতম করতে হবে।

সমস্ত ক্যাম্পটাতেই থমথমে একটা ভাব। দৈনিক কুড়ি হাজার লোককে হত্যা করা সহজ কথা নয়। গ্যাস-চেম্বার বা ক্রিমেটোরিয়ামের ডিজাইনও এত লোকের জন্য করা হয় নি। তাই নাৎসী গার্ডরা সব সময়েই নিজেদের মধ্যে এক আলোচনা নিয়ে ব্যস্ত। তবু ফ্যুয়েরার প্রশংসায় সবাই মুখর। হাঙ্গারির শহরে ও গ্রামে শুধু ঢেঁড়া পিটিয়ে দেওয়া। নিজেরাই এসে ফাঁদে পা দেবে। তারপর? তারপর প্রায় ধ্বংসোন্মুখ জার্মানীতে আবার সোনা, মদ আর বাক্সের বন্যা। কী চমৎকার পরিকল্পনা! যুদ্ধে জার্মান যতো হারছে, ততো বেশী নৃশংস হয়ে উঠেছে।

আমাদের দ্বারা সম্ভব নয় বলে এদের জিনিষপত্র বাছাইয়ের জন্য আরেক দল ক্যাম্প থেকে নিয়ে এসেছে। আমাদের ক্যাম্প থেকে মেইন্ ক্যাম্প পর্যন্ত কয়েক মাইল রাস্তায় দু'ধারে কাঠ এনে জড়ো করা হয়েছে।

সাংঘাতিক কিছু একটা ঘটতে চলেছে তা' বুঝতে পারলাম যখন বিরাট বড়ো একটা কালো রঙের গাড়ী ক্যাম্পে এসে ঢুকলো। আরোহী তা'তে আইখ্‌ম্যান। সঙ্গে পদস্থ নাৎসী অফিসারবৃন্দ। ক্র্যামার, শ্মেলিংগার, হাস্‌টেক, মল এবং বাখ্‌ ইত্যাদি। নিশ্চয়ই কোনো কিছু বিরাট একটা কাজ হতে চলেছে, নইলে এতো চাঁই চাঁই নাৎসী পরিবৃত হয়ে আইখ্‌ম্যান এখানে আসবে কেন ?

ইতিমধ্যে সংবাদ পেলাম, হাঙ্গারিয়ান ইহুদী ভর্তি হয়ে আট দশটা ট্রেন ইয়ার্ডে খালাসের জন্য অপেক্ষা করছে। নাৎসীদের এতো তড়িঘড়ি করতে হচ্ছে, কারণ হাঙ্গারির ভেতরে রেড আর্মি ঢুকে পড়েছে। বুদাপেস্টের পতন আসন্ন। সুতরাং বাছাটাছাব আব সময় নেই। এতোগুলো ইহুদীকে যতো তাড়াতাড়ি হত্যা করা যায়। এমন কি, অনেক যুবক যাদের অন্য সময় খাটিয়ে যতোটা পারা যায় আদায় কবে নিয়ে এবা হত্যা করে, তাদেরকেও সোজা ক্রিমেটোরিয়ামে পাঠানোর ব্যবস্থা হচ্ছে।

তখন সকাল দশটা। প্রথম ট্রেন খালাস কবছে। আমরা দূর থেকে দেখি কাতারে কাতারে লোক। সাইডিংটা ভর্তি হয়ে গেছে হাঙ্গাবিয়ান ইহুদীতে। ওদের দুটো ভাগে ভাগ করে নাৎসীবা। একটা দলকে সুন্দর বার্চ গাছের ছোট অরণ্যটার পাশ দিয়ে ফুলগাছগুলোর পেছনে সাদারঙের বাড়ীটায় নিয়ে যায়। অপর দলকে আমাদের লনের পাশের কাঁটাতারেব বেড়াব ভেতরের রাস্তা দিয়ে তিন নম্বর ক্রিমেটোরিয়ামে। বিরাট লাইন। যতোদূরে তাকানো যায়, লাইনের আর শেষ নেই। যেন সারা ইউরোপটাকেই এরা ক্রিমেটোরিয়ামে পুরবে। শিশুক্রোড়ে মা, ছোট ছোট ছেলের হাতধরা বাপ সমস্ত গৃহস্থালী সঙ্গে নিয়ে এগিয়ে চলেছে। পুরুষগুলোকে যেন কিছুটা সন্দেহপ্রবণ আর চঞ্চল বলে মনে হয়। তবু এটা নিশ্চিত, কি ঘটতে চলেছে সেটা তখনো নিশ্চয়ই এরা কেউ কল্পনা করতে পারে নি। কোনো মানুষের পক্ষে কল্পনা করা সম্ভবও নয়। আর যে চোখে না দেখেছে, তার পক্ষে এ জিনিষ কল্পনারও বাইরে। ওদের মুখের দিকে নিরীক্ষণ করি। না, তা'তে আগামী ঘটনার কোনো ছাপ নেই। শুধু নতুন অপরিচিত জায়গায় কৌতূহল আর উদ্বিগ্নতা। কেউ কেউ এর মধ্যে আবার আমাদের দেখে এক টুকরো হাসে। আমাদের পাশ দিয়ে যাওয়ার সময় জিজ্ঞাসার উত্তরে অনেকে বলে যে হাঙ্গারিতে ওদের হোম-টাউনে অনেক জায়গায় নাৎসীরা পোষ্টার মেরেছে, যারা ভালো চাকরী পেতে চায় তারা যেন ওদের ডাকে সাড়া দিয়ে সমস্ত মূল্যবান জিনিষপত্র নিয়ে ট্রেনে এসে ওঠে।

থেকে সরিয়ে দেবার ব্যবস্থা। কিন্তু না। পরে জানলাম, কোনো একটা গ্যাস-চেম্বারের দরজা আগেভাগে খুলে দেওয়াতে সারা ক্যাম্পেই গ্যাসের গন্ধ ছড়িয়ে পড়েছে।

প্রায়ই নাৎসীরা গ্যাস-চেম্বারের দরজা নির্দিষ্ট সময়ের আগেভাগেই খুলে দেয়। তড়িঘড়িতে তখনো অনেকে মরেনি। একবার তো খোলার পর নাৎসী ভাগ্‌নার দেখতে পায়, কয়েক মাসের একটা বাচ্চা তখনো মরেনি। আসলে দরজা বন্ধ হওয়ার পরেই বাচ্চাটা মায়ের স্তন খাচ্ছিলো বলে গ্যাস যেতে পারেনি। ভাগ্‌নার তো বাচ্চাটা বেঁচে আছে দেখে রেগেমেগে কাঁই। মৃত মায়েব বুক থেকে বাচ্চাটাকে টেনে হিঁচড়ে নিয়ে সঙ্গে সঙ্গে প্রজ্বলিত অগ্নিকুণ্ডে ছুঁড়ে দেয়।

একদিন তো রীতিমতো ঐতিহাসিক একটা ব্যাপার ঘটে গেল আউস্‌ভিৎজ্ ক্যাম্পে। সবেমাত্র সেদিন ট্রেনভর্তি পোলিশ ইহুদীরা এসেছে। ট্রেন থেকে নেমেই এরা বুঝতে পাবে, এদের কপালে কী ঘটতে চলেছে। সঙ্গে সঙ্গে ঐ নিরস্ত্র অবস্থাতেই মেসিনগানে সুসজ্জিত নাৎসীদের মোকাবেলা করতে শুরু করে। দলের একটা মেয়ে তো বিদ্যুৎবেগে একটা পদস্থ নাৎসী গার্ডের হাত থেকে মেসিনগানটা কেড়ে নিয়ে শ্লেলিংগাবকে কুকুরের মতো তলপেটে গুলি করে মাবে। এই হঠাৎ বিদ্রোহে সমস্ত ক্যাম্পে আনন্দের স্রোত বয়ে যায়। তবে সে ক্ষণিকের। তারপরেই নাৎসীরা কঠোব হাতে মেয়ে-পুরুষ নির্বিশেষে সমস্ত ক্যাম্পের বন্দীদের ওপর প্রতিশোধ নিতে আরম্ভ করে। ক্যাম্পের রাস্তাঘাট, লন মৃতদেহে ভরে যায়। তবু কিন্তু আনন্দ পেয়েছিলাম। এতোদিনে হলেও বা, একটা স্ফুলিঙ্গ, আগুন তো দেখা গেছে।

আরেকদিন আর একটা ঘটনা ঘটলো। স্নানঘরে যাওয়ার আগে প্রায়-বৃদ্ধা একজন ইহুদী ভদ্রমহিলা দেখে তার ছেলে কাঠ সাজাচ্ছে। ছুটে গিয়ে জড়িয়ে ধরে ছেলেকে। আদর করে, চুমু খায়। কতোদিন পরে দেখা। ছেলেও আনন্দে মাকে বুকে জড়িয়ে ধরে। এতোদিন মৃতদেহগুলোকে ভালো করে নিরীক্ষণ করেছে, যদি বা মা'র মৃতদেহটা হঠাৎ পেয়ে যায়। কিন্তু না। খুশী-ই হয়েছে মা'র মৃতদেহ খুঁজে না পেয়ে। কিন্তু আজ সে জীবন্ত এবং সামনেই দাঁড়িয়ে। আবেগের পর্ব শেষ হতে মা ছেলেকে জিজ্ঞাসা করে,—এতো কাঠ স্তূপ করছিল কেন রে বাবা?

কয়েকটা মুহূর্ত চুপ করে ছেলেটি মাকে বলে,—মা তুমি শান্তিতে চিরকালের জন্য বিশ্রাম করবে বলে।

মা'র হাতে টাওয়েল আর সাবান তুলে দেয় ছেলেটা। তারপর মা'র পেছনে পেছনে নিজেও গিয়ে গ্যাস-চেম্বারে ঢোকে। এরকম ঘটনা একটা নয়, হাজার হাজার ঘটছে দৈনিক।

এতোদিনে আমরাও অভ্যস্ত হয়ে গেছি ক্যাম্প জীবনে। কবে মুক্তি পাবো? বাইরের পৃথিবীতে কি চলেছে? এইসব খবরাখবরে আর উত্তেজনা বোধ করি না কেউ। আজকে খেয়ে পড়ে বেঁচে আছি। কাল কি হবে একমাত্র ভবিতব্যই তা বলতে পারে। তারজন্য চিন্তা করাটাও সবাই ছেড়ে দিয়েছে। আর ভেবেচিন্তেই বা লাভ কী? সীমান্তে অপরপক্ষ কতোদূরে এগোল, সেই সংবাদেও আর কেউ উৎসাহ বোধ করে না, আসলে আজ হোক্, কাল হোক্ আমাদের মরতে হবেই। পৃথিবীব বুকে নাৎসীরা নিজেদের এই কুকীর্তির কোনো স্বাক্ষর রাখবে না। সুতবাং আগামী কিছু ভেবে আজকের দিনটা ক্ষয় কবার কোনো অর্থ হয় না।

সেই নিস্তরঙ্গ দিনগুলোতেই হঠাৎ ঘটনাটা ঘটে গেল। সারা ক্যাম্পে রীতিমতো উত্তেজনা। সব বন্দীর মুখে মুখে একই খবর। মালা নাকি একজন পুরুষ বন্দীর সঙ্গে ক্যাম্প থেকে পালিয়েছে। এর আগেও অনেকে পালাতে চেষ্টা কবেছে। কিন্তু পারে নি। একে তো তিন সারিতে এতোগুলো গার্ডের শ্যেন চোখকে ফাঁকি দেওয়া, তার ওপর আবার ইলেক্‌ট্রিক তারের বেড়া পেরিয়ে বাইবে পালানো একেবারে অসম্ভব। যতোবারই পালাতে চেষ্টা করেছে, হয় ধরা পড়েছে নাৎসী গার্ডের হাতে, নয় বেড়ায় বিদ্যুৎস্পৃষ্ট হয়ে মারা গেছে। গার্ডের হাতে ধরা পড়লে তো উপায় নেই। নৃশংসতম অত্যাচার করে তারপর ক্যাম্পের কেন্দ্র বিন্দুতে এনে তাকে বিশেষভাবে প্রস্তুত ফাঁসিকাঠে সবার সামনে ফাঁসি দিয়ে মৃতদেহটা যতোদিন না পচে ততোদিন ঝুলিয়ে রাখে, যাতে ক্যাম্পের সবাই পালানোর অপরাধটা উপলব্ধি করতে পারে। মালা আর পুরুষ বন্দীটা নাকি নাৎসী ইউনিফর্ম জোগাড় করে পরে নিয়ে গার্ডদের মধ্যে দিয়ে সোজা দৃঢ় পদক্ষেপে ক্যাম্প ছেড়ে বাইরে বেরিয়ে গেছে। ওদের বুদ্ধিমত্তায় আমরা সবাই আনন্দিত। তা'হলে আমাদের মধ্যেও কেউ আছে যে বুদ্ধিতে এই নাৎসী কুকুরগুলোর চেয়ে অনেক উঁচুতে। অবশ্য এর জন্য আমাদের ওপর গার্ডগুলো কম অত্যাচার চালায় নি। তবু গায়ে মাখিনি। একজন হলেও তো সভ্য জগতে ফিরে গেছে। পেয়েছে মুক্তির স্বাদ। নীল আকাশের নীচে গিয়ে দাঁড়াতে পেরেছে।

বেশ কয়েক সপ্তাহ পরে আবার ক্যাম্পে গুজব ছড়ালো, ওরা দু'জনে নাকি ধরা পড়েছে। প্রথমে আমরা বিশ্বাস করিনি। ভেবেছি, আমাদের বিশ্বাসের মেরুদণ্ডটা ভেঙে দেওয়ার জন্যই সম্ভবতঃ নাৎসীরা এই গুজব ছড়িয়েছে। ক্যাম্প ছেড়ে পালানো যে অসম্ভব, এটাই হয়তো বা আমাদের মনে বদ্ধমূল করে দেওয়ার জন্য এই গুজবের সৃষ্টি। কিন্তু শেষ পর্যন্ত পুরুষদের ক্যাম্প থেকে খবর পেলাম যে সত্যি ওরা দু'জনে ধরা পড়েছে। এবং শাস্তি স্বরূপ ওদের এই হাড় কাঁপানো শীতের দিনে সম্পূর্ণ উলঙ্গ করে গলা পর্যন্ত বরফে দাঁড় করিয়ে রেখেছে। ওরা ধরা পড়ে অত্যাচারিত হবার সঙ্গে ক্যাম্পেও একটা শোকের ছায়া নেমে আসে। অত্যাচারেয় জন্য নয়, সেটা তো ক্যাম্প জীবনের একটা অঙ্গ। কিন্তু ওরা ধরা পড়েছে জেনে সবাই বিমর্ষ।

কয়েক সপ্তাহ পরে নাৎসীরা মালাকে এই ক্যাম্পে নিয়ে আসে। যাতে সবাই বিশ্বাস করে যে সত্যি মালা ধরা পড়েছে। মালাকে প্রকাশ্যে ফাঁসি দিয়ে ওর মৃতদেহটা সেই ফাঁসিকাঠে না পচা পর্যন্ত ঝুলিয়ে রাখা হবে। সমস্ত কিছু তৈরী। প্রায় নাৎসী নেতাদেব সবাই এক এক করে জড়ো হয়েছে ফাঁসির জায়গায়। একে তো পলাতক আসামী ধরা পড়েছে, দ্বিতীয়তঃ অনেকদিন এ ক্যাম্পে থাকায় প্রায় সবাই চেনে ওকে। ধীরে ধীবে মুহূর্তটা এগিয়ে আসে। ঠিক ফাঁসিতে ঝোলাবার আগের মুহূর্তে মালা পোষাকের ভেতবে লুকানো একটা রেজারব্লেড বার করে মণিবন্ধের শিরাটা কেটে দেয়। ফিন্‌কি দিয়ে রক্ত ছোটে।

কয়েকটা নাৎসী ছুটে এগিয়ে আসে ওকে থামাতে, —কি করছিস তুই মালা ?

মালা সেই অবস্থাতেই গর্জে ওঠে, —নরকের কুকুর তোবা, আমাকে ছুঁস নে।

একটু বাদে চাপ চাপ রক্তের মধ্যে ওর শরীরটা আছড়ে পড়ে।

মালার সেই প্রায়-অজ্ঞান দেহটার কাছে নাৎসী ড্রেচ্‌লার এগিয়ে গিয়ে বলে, —মাগী ভেবেছিলি খুব জোর আমাদের ফাঁকি দিয়ে পালিয়ে যাবি ? সেটি হচ্ছে না। গেষ্টাপোর হাত কতো লম্বা তা তো বাছাধন টের পাওনি ! স্বর্গে গেলেও টেনে নামিয়ে নিয়ে আসবো। জার্মান রাইখ্‌কে প্রতারণা করার মতো লোক এখনও পৃথিবীতে জন্মায়নি, বুঝলি ?

কথাগুলো শুনে মালার মুখে অবজ্ঞার একফালি ম্লান হাসি ফুটে ওঠে ; শেষ নিশ্বাস ফেলার আগে যতোটা জোরে পারা যায় চিৎকার করে বলে, —আমি মরে যাচ্ছি, কিন্তু তোদের দিনও গুণতির মধ্যে। শুধু তোদের নয় হাজার হাজার

এই নাৎসী কুকুরগুলোর দিনও আর বেশী নেই ; পৃথিবীর কোনো শক্তিই ধ্বংসের হাত থেকে তোদের বাঁচাতে পারবে না।

মালার ঠোঁট দুটো কেঁপে ওঠে। হয়তো আরও কিছু বলতে চেয়েছিলো। কিন্তু ততোক্ষণে ড্রেচ্‌লার ছুটে গিয়ে মালার মুখে সজোরে বুটের লাথি মারে। গল গল করে নাক-মুখ দিয়ে রক্ত উগ্‌লে পড়ে। কিছুক্ষণ পরে মালার দেহটা কয়েকবার মোচড় খেয়ে চিরদিনের মতো স্থির হয়ে যায়।

মালার অন্তরঙ্গ বান্ধবীদের ডেকে নাৎসী গার্ড ড্রেচ্‌লার ওর রক্তাক্ত দেহটাকে ঠেলাগাড়ীতে তুলতে বলে। তারপর মৃতদেহটাকে সারা ক্যাম্পে ঘোরানো হয়। ঘোরানো শেষ হলে ড্রেচ্‌লার বলে,—এইবার শূকরীটাকে ক্রিমেটোরিয়ামে নিয়ে যাও।

আমরা সারিবদ্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে ওকে শুভ বিদায় জানাই। বিষণ্ণতার একটা চাদর যেন সবার অলক্ষ্যে ক্যাম্পের ওপর কে যেন ঢাকা দিয়ে দিয়েছে। হয়তো মালা পালাবার চেষ্টা না কবলেই ভালো করতো। তা'হলে এভাবে ওকে মরতে হতো না। কিন্তু এই দুঃসহ বন্দী জীবনের ভার ও নিশ্চয়ই সইতে পারছিল না। তাই সুযোগ পেতেই আর দ্বিধা করে নি। দুঃখ এই, মাত্র কয়েকটা দিনের স্বাধীনতার স্বাদের জন্য এ পৃথিবী ছেড়ে ওকে চলে যেতে হলো।

কিছুদিন পরে প্রায় তিনশো মেয়ের একটা দল এসে পৌঁছলো। এরা এসেছে পোল্যাণ্ডের ভেতর দিকের মাজ্‌দানেক কনসেন্ট্রেশন ক্যাম্প থেকে। লাব্‌লিন আর ভারসাউ ঘেটোর প্রায় সমস্ত ইহুদী-ই এই মাজ্‌দানেক কনসেনট্রেশন ক্যাম্পে প্রাণ হারিয়েছেন। এই মেয়েগুলোব ভবিষ্যৎ এখনো ঠিক হয় নি। আসলে ওদের সম্পর্কে পাকাপাকি কি ব্যবস্থা নেওয়া হবে, গেষ্টোপারা তখন পর্যন্ত মনস্থির করতে পারে নি। ওদের স্নানের জন্য সাউনাতে নিয়ে যায়। আমাদের দলের যে মেয়েটা সাউনাতে কাজ করতো, তাকেই নতুন দলের একটা মেয়ে জিজ্ঞাসা করে,—আমাদের এখানে নাম লেখানো নাম্বার দিয়ে তারপরে ক্যাম্পে পাঠানো হবে, তাই না? ক্রিমেটোরিয়ামের দিকে আঙুল দেখিয়ে বলে,—নইলে তো সোজা ওখানে পাঠিয়ে দিতো?

আমাদের দলের মেয়েটা চিৎকার করে বলে,—কি সব বাজে কথা বলছো? ওটা তো—

ওকে মাঝপথে থামিয়ে দিয়ে মেয়েটা ম্লান হেসে বলে,—আমাকে ভোলাতে চেষ্টা করো না ভাই। আমরা মাজদানেক্ কনসেনট্রেশন ক্যাম্পে কানাডা কমাণ্ডোর কাজ করতাম। অর্থাৎ মৃতদেহ জিনিষপত্র বাছাইয়ের কাজ। সুতরাং

আমাদের মিথ্যে বলে কোনো লাভ নেই। আর সত্যির জন্য ভয়ও পাই না। তুমি যদি আমাদের অবস্থায় পড়তে তা'হলে তোমাকে মিথ্যে বললে তোমার অবস্থা কি রকম হতো শুনি?

রেড আমি অর্থাৎ রাশিয়ানরা মাজদানেক্ কনসেনট্রেশন ক্যাম্পের কাছাকাছি আসা মাত্র মেসিনগানের গুলিতে পনেরো হাজার বন্দীকে তক্ষুনি হত্যা করে গেষ্টাপোরা। শুধু এই তিনশো মেয়েকে জীবিত রাখে। তারপর ওদের উলঙ্গ করে জিনিষপত্র পোষাক পরিচ্ছদ কেড়ে নিয়ে সমস্ত কিছু থার্ড রাইখের জন্য জার্মানীতে পাঠিয়ে দিয়ে মেয়েগুলোকে ট্রেনের কামরায় গাদা করে। মেয়েগুলো বুঝতে পারে পৃথিবীতে ওদের দিন ফুরিয়ে এসেছে। নাৎসীরা নিজেদের বীভৎস হত্যা আর অত্যাচারের সাক্ষী কাউকে রাখবে না।

উলঙ্গ করার সময়ে অনেক মেয়ে প্রচুর সোনা গিলে ফেলে। যদি কোনোরকমে পালাতে পারে তবে এগুলো কাজে লাগবে ভেবে। অনেক মেয়ে আবার চলন্ত ট্রেন থেকে নাৎসীদের অজ্ঞাতে রেললাইনের ওপরেই ঝাঁপিয়ে পড়ে, যদিও বাঁচবে কিনা সন্দেহ। ইতঃস্তত করেই বা লাভ কী? কারণ ওরা তো জানে ওদের সামনের দিনগুলো গোনা। এখন শুধু শেষ দিনটার প্রতীক্ষা। যাইহোক্, মেয়েগুলোকে যখন স্নানের আগে কামানো হলো, নম্বর দেওয়া হলো, তখন আমরাও হাঁফ ছেড়ে বাঁচলাম। যাক, তাহলে এদের ক্যাম্পে পাঠানো হবে।

কিন্তু পরের দিন সকালে খবর পেলাম, হঠাৎ মাঝ রাতে তুটো লরী ওদের ব্লকে এসে থামে। সেই লরীতে মেয়েগুলোকে ঠাসাঠাসি করে ভর্তি করে সোজা গ্যাস-চেম্বারে নিয়ে যায়। বহু অভিজ্ঞতায় অভিজ্ঞ মেয়েগুলোকে হঠাৎ গেষ্টাপোরা এইভাবে ধোঁকা দেয়।

পরের দিন অপেক্ষাকৃত নরম একটা নাৎসী মেয়ে-গার্ডকে দেখতে পেয়ে জিজ্ঞাসা করে, —মাজদানেক্ থেকে আনা সুন্দর মেয়েগুলোর কি হলো?

দাঁত মুখ খিঁচিয়ে মেয়ে-গার্ডটা উত্তর দেয়, —হবে আবার কি? শূকরীগুলো সুযোগ পেয়ে প্রচুর সোনা গিলেছিলো। গ্যাস-চেম্বারে ঢোকাতে আপনা থেকে সোনাদানা যা কিছু বেরিয়ে এসেছে। আমাদের এখন প্রতিটি সোনার টুকরো চাই। হ্যাঁ, যুদ্ধ চালাবার জন্য এক টুকরো সোনাও আমরা হারাতে রাজী নই।

মাঝে মাঝেই এরকম হঠাৎ রাত্রে নির্দিষ্ট ব্লকে এসে লরী দাঁড়ায়। সেই ব্লকের বন্দীদের নিঃশব্দে গ্যাস-চেম্বারে নিয়ে যায়। আগে থেকে জানাজানি

হয়ে ক্যাম্পে যাতে বিদ্রোহ না হতে পারে, তারজন্যই এই ব্যবস্থা। কাপুরুষতার জন্য প্রতিটি ছায়াতেই এরা ভূত দেখে।

একদিন খবর এলো, পাশের ব্লকের পুরুষ বন্দীদের অন্য ক্যাম্পে স্থানান্তরিত করা হবে। দীর্ঘদিন ক্রিমেটোরিয়াম আর ক্যাম্পে বিভিন্ন রকম কাজ করে এরা নাৎসীদের অনেক চালাকিই জেনে গেছে। এটাও হয়তো বা নাৎসীদের একটা ফন্দী। অন্য ক্যাম্পে নিয়ে যাওয়ার নাম করে সোজা ফাঁদে ফেলবে। ঢুকিয়ে দেবে গ্যাস-চেম্বারে। সুতরাং ওরা প্রস্তুতি শুরু করে। প্রতিটি ব্লকে গোপনে সংবাদ পাঠায়। মরতে যদি হয়-ই, তবে যতগুলো সম্ভব নাৎসীকে মেরে মরবে। ভালো ছেলের মতো কিছুতেই গ্যাস-চেম্বারে ঢুকবে না। আমাদের ক্যাম্পের পাশ দিয়ে যাওয়ার সময় অনেকেই মৃদু হাসতে হাসতে গেছে। অর্থাৎ, তারা যে মেরে তবে মরবে, হাসিটা তারই ইঙ্গিত। সারা ক্যাম্পেই একটা থমথমে গুপ্ত উত্তেজনা। আনন্দও বটে। তবু এরা নিঃসন্দেহ নয়; সত্যি কি গ্যাস-চেম্বারে নিয়ে যাবে নাকি অন্য ক্যাম্পে কাজ করার লোকের ঘাটতি পড়েছে? সেক্ষেত্রে দ্বিতীয়টা সত্যি হলে মিছিমিছি মেসিনগানের গুলিতে প্রাণ দিয়ে কী হবে? বাঁচতে কার না সাধ হয়?

যাইহোক, আউস্‌ভিৎজ্‌ এক নম্বর ক্যাম্পের বাইরে খালি ট্রেন অপেক্ষা করছে অন্য ক্যাম্পে নিয়ে যাওয়ার জন্য। ওদের এক নম্বর ক্যাম্পের বাইরে নাৎসী গার্ডরা মারচ করতে নিয়ে যায়। চোখে মুখেও আনন্দের অভিব্যক্তি। শেষ পর্যন্ত তা হলে নরকের থেকে বার হওয়া গেল। ওদের গেটের বাইরে বের করে সাধারণ একটা ব্লকে নিয়ে যায়, পরনের জামাকাপড় ছেড়ে ভালো জামা-কাপড় পরে নিয়ে যাতে ট্রেনে ওঠে। সন্দেহের কোনো প্রশ্ন ওঠে না। নিঃসন্দেহ মনেই সবাই জামাকাপড় বদলাতে ব্লকে ঢোকে। এমন সময় হঠাৎ ব্লকের দরজাগুলো বাইরে থেকে বন্ধ করে দেয় নাৎসী গার্ডগুলো। আর জানালা দিয়ে ঢুকিয়ে দেয় গ্যাসের নল। কয়েকটা মুহূর্ত মাত্র। তারপরেই সব শেষ।

১৯৪৪ সালের আগস্ট মাসের প্রথমদিকে গুজব ছড়িয়ে পড়লো যে পুরো আউস্‌ভিৎজের সব ক্যাম্পগুলোকে ইভাকুয়েট্ করা হবে। রেড আর্মি অর্থাৎ রাশিয়ানরা অপ্রতিহত গতিতে এগিয়ে আসছে। আর নাৎসীরা নিশ্চয়ই এতো

বন্দীকে তাদের হাতে তুলে দেবে না। ইদানীং কয়েকদিন ধরে নতুন বন্দীদের আসার স্রোতও বন্ধ। এর মানে এই নয় যে নাৎসীরা হত্যা বন্ধ রাখবে। আউস্‌ভিৎজ্‌ ছাড়াও তো অনেক কনসেনট্রেশন ক্যাম্প আছে। আর সব ক্যাম্পেই ক্রিমেটোরিয়াম রয়েছে। অবশ্য নাৎসী কুকুরদের বিশ্বাস নেই। হয়তো বা রাতের অন্ধকারে চুপচাপ এসে নতুন বন্দীদের সোজা গ্যাস-চেম্বারে ঢুকিয়ে দিচ্ছে! তাই আমরা জানতে পারছিনে। কে বলবে?

গুজবটা ধীরে ধীরে শাখা প্রশাখা বিস্তার করছে। ভারসাউ নাকি রেড আর্মির দখলে। আর সেই কারণেই নতুন বন্দীর স্রোত বন্ধ। এখনও শোনা যাচ্ছে, বার্লিন হেড-কোয়ার্টার থেকে নাকি নির্দেশ এসেছে গ্যাস-চেম্বার বন্ধ করে দেবার। ঠিক এমন সময়ে হঠাৎ একদিন মাঝরাতে লরী আসতে আরম্ভ করলো। প্রথমে ভেবেছিলাম রুগীদের ক্রিমেটোরিয়ামে নিয়ে যাওয়ার জন্য। কিন্তু তারজন্য এতো লরী কেন? সত্যি কি পুরো ক্যাম্পটাকেই ইভাকুয়েট্‌ করা হবে? উদ্বেগে আতঙ্কে প্রত্যেকেই অস্থির। ক'দিন পরে জানতে পারলাম সেই রাতে লরী আসার কারণ। পুরো জিপ্‌সীদের ব্লকগুলোকে খালি করে ক্রিমেটোরিয়ামে নিয়ে গেছে। সংখ্যায় প্রায় হাজার পাঁচ ছয় হবে। জিপ্‌সীদের ব্লকগুলো আমাদের থেকে আলাদা। ইহুদী না হওয়ায় ইউরোপের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে ধরে আনা জিপ্‌সীদের পুরো পরিবার অর্থাৎ স্বামী, স্ত্রী আর বাচ্চাদের একসঙ্গে থাকতে দিতো। ছোট ছোট কয়েক শো ছেলেমেয়ে সকাল সন্ধ্যে সারাটা ক্যাম্পে ছোটাছুটি করে খেলাধূলা করতো। অবশ্য সুযোগ সুবিধে বলতে এতোটুকুই। খাবার দাবার আর বসবাসের পরিবেশ আমাদেরই মতো। যাই হোক ক্যাম্পে আনার সময় ওদের নামধাম রেজেস্ট্রী করা হয়েছিলো বলে ওদের নিশ্চিহ্ন হওয়ার পেছনেও তো একটা কারণ দেখাতে হবে! সুতরাং রেকর্ডে রাখা হলো ভয়ংকর টাইফাস্‌ রোগে আক্রান্ত হয়ে এই পাঁচ-ছ' হাজার মানুষ একরাতে শেষ। কিন্তু নাৎসীরা এতো বোকা নয়; সারা পৃথিবী নিশ্চয়ই এটা বিশ্বাস করবে না। সুতরাং রেজিষ্টারে রেকর্ড করা হয় যে কুড়ি জন পোলিশ এবং ইহুদী ডাক্তার তাদের কর্তব্য কর্মে অবহেলার দরুন টাইফাস্‌ রোগ ছড়িয়ে পড়ে সেই কারণে তাদের নাম শ্রম শিবিরে পাঠানো হলো।

সারা ক্যাম্পে একটা অস্বস্তিকর আবহাওয়া—তলায় তলায় উত্তেজনার ফল্গুস্রোত বইছে। গোপনে খবর পাচ্ছি, পুরুষদের ক্যাম্প থেকে শীঘ্রই বিক্ষোভ শুরু হবে। তবে তারা এ বিষয়ে বার বার আমাদের শান্ত থাকতে অনুরোধ করছে। কারণ বিক্ষোভের সময় নাকি এখনো আসেনি। সত্যি তো রাশিয়ানরা

যদি ভারসাউ পর্যন্ত পৌঁছেও থাকে, তবু ভারসাউ এখান থেকে অনেক দূর। রাশিয়ানরা এসে পৌঁছনোর আগেই নাৎসীরা পুরো ক্যাম্পকে মাটিতে মিশিয়ে দেবে। নৃশংসতায় ওদের জুড়ি নেই।

নতুন বন্দী কয়েকদিন ধরে না এলেও আগেকার মৃত বন্দীদের জিনিষপত্র বাছাইয়ের প্রচুর কাজ পড়ে রয়েছে। পড়ন্ত বিকেল। আমরা তখন সবেমাত্র প্রস্তুত হচ্ছি ডিউটিতে যাওয়ার জন্য। হঠাৎ পুরুষ বন্দীদের ক্যাম্পের দিক থেকে গুলির শব্দ শুনেই আমরা ছুটে বেরোলাম ঘর থেকে। নিজের চোখকেই যেন বিশ্বাস করতে পারছিনে। করা সম্ভবও নয়। তিন নম্বর ক্রিমেটোরিয়াম থেকে গলগল করে ধোঁয়া বেরোচ্ছে। আকাশমুখী ধোঁয়ার কুণ্ডলী। কয়েক মিনিট পরেই মড় মড় করে বিরাট একটা শব্দে চিমনীটা ভেঙে পড়লো। চারিদিকে গোলাগুলির শব্দ ; মটর সাইকেলে তীব্র গতিতে নাৎসী গার্ডদের ছোটাছুটি।

আমরা তখন হতভম্ব। বিমূঢ় অবস্থা। সত্যিই কি তা'হলে বিদ্রোহ শুরু হলো ? পুরুষ বন্দীরা কি শেষ পর্যন্ত অস্ত্র-শস্ত্র জোগাড় করতে পেরেছে ? তাই যদি হয়, তবে আমাদের খালি হাতেই লড়তে হবে।

কী করবো বুঝতে না বুঝতেই দু' নম্বর ক্রিমেটোরিয়ামের আকাশচুম্বী চিমনীটা বিরাট শব্দে মাটিতে ভেঙে পড়লো। পুরো বাড়ীটাকে আগুনের লেলিহান শিখা মুহূর্তে গ্রাস করলো। গ্যাস-চেম্বার আর ক্রিমেটোরিয়াম-গুলোকে ধ্বংস হ'তে দেখে আমাদের কি উল্লাস !

নাৎসী কুকুরগুলো এতোক্ষণে রীতিমতো ভয় পেয়ে গেছে। এদিক ওদিক ছোটাছুটি শুরু করছে। এলোপাথাড়ি মেসিনগান ছুঁড়ছে। এর মধ্যে খবর পেলাম, এটা বিদ্রোহ নয়। সোণ্ডার কমাণ্ডোদের প্রতিহিংসা। গতবার ওদের একটা দলকে অন্য ক্যাম্পে নিয়ে যাওয়ার নাম করে ব্লকে ঢুকিয়ে হত্যা করে। এবার সেইরকম একটা পরিকল্পনা নাৎসীরা করতেই ওরা মুষ্টিমেয় কয়েকজনেই ক্রিমেটোরিয়াম গ্যাস-চেম্বার ধ্বংসে মেতে উঠেছে।

কয়েকটা মানুষের কী ভীষণ সাহস ! ভাবতেও বুকটা গর্বে ভরে ওঠে।

ফায়ার ব্রিগেড আসার শব্দ পেলাম। কিছুক্ষণের মধ্যেই আগুন নিভিয়ে ফেললো। তারপর চললো নাৎসী গার্ডদের প্রতিশোধ নেওয়ার পালা। অবিরাম সোণ্ডার কমাণ্ডোদের ওপর গুলি বর্ষণ। বৃষ্টির মতো। ক্রিমেটোরিয়াম দুটোকে ধ্বংস করার বিনিময়ে নিজেদের জীবন দিতে হলো ওদের।

একসময় নাৎসী গার্ডগুলো যুদ্ধ জয় করার ভঙ্গীতে মারচ করতে করতে ফিরে এলো। পুরুষদের ক্যাম্প কমাণ্ডার হান্ চাবুক হাতে পাগলের মতো

চিৎকার করতে করতে ছোটাছুটি করছে। অবশিষ্ট বন্দীদের পাঁচজন করে লাইনে দাঁড় করিয়ে গুণতিতে ব্যস্ত। একবার ভাবলাম এর জের হয়তো বা আমাদের ওপরেও পড়বে। কিন্তু না। যে কারণেই হোক, আমাদের ওপর এবার অত্যাচারের খড়্গ নামলো না।

ক্রিমেটোরিয়াম আর গ্যাস-চেম্বার ধ্বংস করার বারুদ চারটে মেয়ে লুকিয়ে সোণ্ডার কমাণ্ডোকে দিয়েছিলো। মেয়ে চারটে ইউনিয়ান ওয়ার্কাস কেমিকেল প্ল্যাণ্টে কাজ করতো। সেখান থেকেই চুরি করেছিলো মেয়ে চারটে। ধরা পড়লে ওদের উলঙ্গ করে ক্যাম্পের কেন্দ্রস্থলে ফাঁসিকাঠ পুঁতে, সেই ফাঁসিকাঠে ফাঁসি দিয়ে মৃতদেহগুলো না পচা পর্যন্ত ঝুলিয়ে রাখে। যাতে ক্যাম্পের সবার সব সময় নজরে পড়ে।

নিঃসঙ্গ হলেও অন্যান্য ক্যাম্পের খবরাখবর ঠিক সময় মতো পাচার হয়ে আমাদের কাছে পৌঁছে যেতো। গুজব ছড়িয়ে পড়েছে, বিভিন্ন কারখানার ডাইরেক্টররা শ্রমিক নিচ্ছে। কিন্তু কেউ বিশ্বাস করতে রাজী নই আমরা। যদিও বিশ্বাস না করার মতো কোনো কারণ ঘটেনি। তবু এই কনসেনট্রেশন ক্যাম্পে হঠাৎ কোনো সত্যিকেও কেউ বিশ্বাস করতে চায় না। সেটাই সবার ধারণা। আসলে রাশিয়ানবা এগিয়ে আসছে বলে সবাইকে সরিয়ে গ্রস্-রোজেন, রাভনস্-ব্রুক, বারগেনবেলসন্ প্রভৃতি অন্যান্য কনসেনট্রেশন ক্যাম্পে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে। ঠিক এই সময়েই হঠাৎ মা'র কাছে যাওয়ার সুযোগ এসে গেল। মা'র কাছ থেকে খবর পেলাম সেখানে নাম রেজিষ্ট্রি করার হিড়িক পড়ে গেছে। যদিও ষোল থেকে চব্বিশ বছরের মেয়েকে স্থানান্তরিত করা হবে স্থির হয়েছে, তবু মা'র দৃঢ় বিশ্বাস সে দলে মাও ঢুকতে পারবেন। কারণ পলেটিসে আবটাইলুঙ্ অর্থাৎ রেজেষ্ট্রি অফিসে যারা কাজ করে, মা'র সঙ্গে তাদের রীতিমতো দহরম মহরম। আর বেশীর ভাগই এই নরকেও মা'র কাছে ইংরেজী শেখে। বিনিময়ে মাকে আলু, পেঁয়াজ, রুটির টুকরো ইত্যাদি দেয়। মা আমাকে যতখানি পারা যায়, সোনা-দানা এবং ওষুধ-পত্তর নিয়ে আসতে বলে। যাতে প্রয়োজনে ঘুষ দিয়ে মাও দলভুক্ত হতে পারেন।

কিন্তু এখন সবচেয়ে বড়ো সমস্যা হলো, আমি কী ভাবে আগেকার অর্থাৎ মা'র ক্যাম্পে ফিরে আসবো? নইলে তো বাইরের কারখানায় কাজ করতে যাওয়ার কোনো সুযোগই জুটবে না। বিশেষ করে কানাডা কমাণ্ডো থেকে বিচ্ছিন্ন হওয়া রীতিমতো শক্ত ব্যাপার। কারণ সাক্ষী হিসেবে এরা একেবারে প্রত্যক্ষদর্শী। তবুও মা মনস্থির করে ফেলেন, কপালে যা-ই থাকুক না কেন,

সোজাসুজিই লাগার ফ্যুয়েরার হেস্‌লারকে অনুরোধ করবেন। অবশ্য ব্যাপারটা খুব সহজ নয়; একজন সাধারণ বন্দীর পক্ষে গেষ্টাপোর সঙ্গে কথা বলা অত্যন্ত সাহসের প্রয়োজন। বিশেষ করে যেখানে গেষ্টাপাদের দেখলে সামনে যাওয়া দূরে থাক্, সবাই পালাতে ব্যস্ত। যাই হোক কয়েকদিন অপেক্ষা করার পর হেস্‌লারকে লাগার ষ্ট্রাসে দিয়ে যেতে দেখে, সাহসে বুক বেঁধে মা এগিয়ে যান, —হের লাগার ফ্যুয়েরার, যতোখানি সম্ভব চোস্ত্ করে মার্জিত মোলায়েম জার্মান ভাষায় বলেন মা, আমার মেয়ে আজ আট মাস ধরে কানাডা কমাণ্ডোতে কাজ করছে; কিন্তু আমরা দু'জনেই বাইরের কারখানায় কাজ করতে যেতে চাই। যদি দয়া করে ওকে আমাদের ক্যাম্পে বদলীর ব্যবস্থা করে দেন, তবে চিরকৃতজ্ঞ থাকবো।

—ঠিক আছে; মেয়ের নম্বরটা দাও। চেষ্টা করে দেখবো।

ছোট্ট উত্তরটা দিয়ে হের হেস্‌লার আবার এগিয়ে যায়। নতুন বন্দীর স্রোত আসা বন্ধ। চিমনীগুলোও আর ধোঁয়া উদ্‌গীরণ করছে না। মৃতদের জিনিষ-পত্রের স্তূপও আস্তে আস্তে অপসারিত হচ্ছে। কাজও তেমন নেই। তবু নাৎসীরা নিজেদের স্বার্থেই কাজের প্রবাহটাকে ধীর গতি করে দিয়েছে। যাঁতে ক্যাম্পটা না গোটায়। তা'হলে তো ওদের সীমান্তে যুদ্ধ করার ডাক পড়বে। আমাদের ওপরে আদেশ হলো কাজ করার গতি কমিয়ে দিতে: শিফ্‌টের সময়ও ছোট করে দেওয়া হলো। যাতে করে যতোদিন পারা যায় ক্যাম্পটাকে ধরে রাখা। আমাদের হাতেও প্রচুর সময়। ব্লকে শুয়ে বসেও সময় কাটানো দায়। খাদ্যাভাবও দেখা দিয়েছে। সেই বিশ্রী স্বাদহীন বাদামী রঙের স্যুপ যা আমরা বহুদিন স্পর্শ পর্যন্ত করিনি, তাই বাধ্য হয়ে আবার গিলতে হচ্ছে।

হঠাৎ একদিন সকালে আবার বিকট বিস্ফোরণের শব্দ। আবার সেই উত্তেজনা। তা'হলে কি শেষ পর্যন্ত রাশিয়ানরা ইতিমধ্যে পৌছে গেল? নাকি, সেই বিদ্রোহ শুরু হয়ে গেছে?

কিন্তু নিজের চোখকেও যেন বিশ্বাস করা যায় না। চার নম্বর ক্রিমেটোরিয়ামটাকে ধ্বংস করছে নাৎসীরা। কয়েকদিন পরে আরেকটা ক্রিমেটোরিয়াম। এমন কি খুঁড়ে খুঁড়ে নীচেকার মাটি সুদ্ধ সরিয়ে ফেলছে। আমরা এ দৃশ্য দেখার জন্য বেঁচে থাকবো এটা ভাবতেই যেন কেমন লাগছে। তার মানে নাৎসীরা সমস্ত খুনের প্রমাণ লোপ করতে চায়। প্রত্যক্ষদর্শী হিসেবে একমাত্র আমরা কয়েকটা মেয়েই যা জীবিত। ওরা কি আমাদেরও হত্যা করবে না? যাতে এই বীভৎস হত্যাকাণ্ডের সমস্ত প্রমাণ মুছে যায়? আর এক

আধজন দলছুট্ হয়ে যদি পালিয়েও যেতে পারে, তবু সেই একার কথায় কি সারা পৃথিবী এই বীভৎস নারকীয় হত্যাকাণ্ডের কথা বিশ্বাস করবে ? প্রমাণ কোথায় ?

আতঙ্কিত এক প্রতীক্ষায় দিনগুলো কাটছে। জোর গুজব যে রাইখ্‌সিখ্‌হারহাইত্‌ আমট্ অর্থাৎ বার্লিনের কোয়ার্টার থেকে থেকে শীঘ্রই আমাদের হত্যা করার আদেশ আসবে। অনেকে আবার বলাবলি করতে লাগলো যে ওপর থেকে আমাদের ওপর একটা শক্তিশালী বোমা ফেলে প্রচার করা হবে যে এ্যালাইড্‌ ফোর্স অর্থাৎ মিত্রশক্তি বোমা ফেলেছে বলে। কাজকর্ম বলতে কিছু নেই। শুধু এখান ওখান থেকে কুড়িয়ে বাড়িয়ে কয়েকটা বন্দীকে ইভাকুয়েশানের জন্য ধরে আনা হচ্ছে। রোজই ট্রেন ভর্তি বন্দী আউস্‌ভিৎজ্‌ ছেড়ে যাচ্ছে। হাজার দশেক রুগ্ন বন্দীকে রেখে ক্যাম্প প্রায় খালি। সবচেয়ে কষ্টকর আমাদের অবস্থা। একটা অনিশ্চয়তার খড়্গ আমাদের ওপর সদা সর্বদা ঝুলিয়ে রাখাতে বোঝার উপায় নেই আমাদের কী ভবিষ্যৎ !

কয়েকদিন পর একদিন সকালে গুণতির পর ডাক এলো : নম্বর ৩৯৯৩৪ ; কাপোর কাছে এক্ষুণি রিপোর্ট করো।

তার মানে ? এ তো আমারই নম্বর। তা'হলে কি আমার বাংকের নীচে কিছু পাওয়া গেছে ? ভয়ে যখন কাঁপছি ঠিক তখনই একজন নাৎসী মেয়ে-গার্ড আমার দিকে তাকিয়ে বলে,–লাগার ফ্যুয়েরার হেস্‌লার তোমাকে পুরনো ক্যাম্পে বদলীর আদেশ দিয়েছে। তোমার মায়ের সঙ্গে তুমিও বাইরে কাজে যাবে।

আমার হতবুদ্ধি অবস্থা। কান দুটোকেই অবিশ্বাস করছি তখন। এও কি হতে পারে ? নাকি সম্ভব ? অলৌকিক বললেও বোধহয় সম্পূর্ণ ব্যাপারটাকে কম বলা হয়। সত্যি কি তা'হলে আমি এ নরক থেকে উদ্ধার পাবো ? যেন আমার ওপর থেকে মৃত্যুদণ্ডটা হঠাৎ কেউ তুলে নিয়েছে। এতোদিন পরে স্বাধীনতার স্বাদ ফিরে পেলাম। প্রায় আজ আট মাস হলো এই ক্রিমেটোরিয়ামে কাজ করছি। মৃত্যু আর বিভীষিকা, এখানে প্রতিটি মুহূর্তে ছায়ার মতো সঙ্গী। এ-ক'মাসে দু'লক্ষের ওপর লোককে নাৎসীরা এই ক্যাম্পে হত্যা করেছে। আট মাস পর যেন কবরখানা থেকে মুক্তি পেলাম। পৃথিবীর যে কোনো জায়গা এর চেয়ে অনেক ভালো। এর থেকে নিকৃষ্ট স্থান সমস্ত পৃথিবী চুঁড়ে ফেললেও কোথাও মিলবে না।

পুরনো ক্যাম্পে ফিরে এসে দেখি ক্যাম্প প্রায় ফাঁকা। নতুন-আসা দলকে সঙ্গে সঙ্গেই অন্য ক্যাম্পে সরিয়ে দেওয়া হচ্ছে। যাই হোক্ এতো দিন পরে মা'র

সঙ্গে একত্রিত হতে পারায় আনন্দের সীমা নেই। ক্যাম্পের এক পাশের ট্রান্সপোর্ট ব্লকে রাখা হলো আমাদের। সময় এলেই রওনা করিয়ে দেবে। হঠাৎ একদিন রাত্রে ট্রান্সপোর্ট ব্লকের আলোটা জ্বলে উঠলো। আমি আর মা সহ একশো জনের নাম ডাকা হলো। প্রথমে তো আমি ভয়ে নাক সিঁটিয়ে গেছি। হাজার লোকের মধ্যে থেকে অকস্মাৎ একশো জনকে ডাকলো কেন? তবে কি—? কিন্তু চার পাশে তাকিয়ে দেখি একশো জনের প্রায় সবাই প্রিভিলেজ্ গ্রুপের। হাঁফ ছেড়ে বাঁচলাম। যাক্ কোথাও তা'হলে নিয়ে যাবে নিশ্চয়ই। যদিও এর মধ্যে অনেকের সঙ্গেই আমার টানা-পোড়েনের সম্পর্ক। তবু কি আর করা যাবে? উপায় তো নেই।

তবে মনে হয় আউস্‌ভিৎজের নরক থেকে একবার বেরোলে আর কেউ পরস্পরের প্রতি হিংসা দ্বেষ রাখবে না। পরিবেশের জন্যই মানুষ নিজের মনুষ্যত্ব হারিয়ে ফেলে, জানোয়ার হয়।

সাধারণত ক্যাম্পের বাইরে যাবার বা ভেতরে আসার সময় সাউনার মধ্যে দিয়েই যেতে আসতে হয়। আর সাউনা পেরিয়েই রিসেপশন্ রুম। যেখানে জামা-কাপড় এবং জিনিষপত্র রাখতে হয়। বদলে ছেঁড়া জামা-কাপড় আর এক জোড়া খড়ম দেয় রিসেপশন্ রুম থেকে কিন্তু সৌভাগ্যবশত এবার আর আমাদের সাউনার ভেতর দিয়ে যেতে হলো না। এমন কি ক্যাম্পের সদর দরজাতেও আমাদের তল্লাসী হলো না। যদি আগে জানতাম তবে এতোদিনের জমানো সোনা-দানা সঙ্গে নিয়ে আসতে পারতাম, যেটা ক্যাম্পের বাইরে অনেক কাজে আসতো। যাক্, আমার আর মা'র জন্য যে গরম জামা এনেছিলাম, বাইরে বেরিয়ে তা' পরে নিলাম। আমাদের হাতে হাতে রেশন মাফিক রুটির টুকরো দেওয়ার পর দেখলাম, একটা ট্রেন দাঁড়িয়ে আছে। বুকের ভেতরটা ধক্ করে উঠলো। শেষ পর্যন্ত জিপ্‌সী মেয়েগুলোর মতো আমাদেরও অবস্থা হবে না তো? ভালো করে তাকিয়ে দেখলাম রেলের ইঞ্জিনের মুখ ক্যাম্পের বাইরের দিকে অর্থাৎ ডানদিকে। তবু পুরোপুরি সন্দেহ যায় না। নাৎসীদের বিশ্বাস নেই। গাড়ীটা পিছোতে কতোক্ষণ! এরা সব পারে। পেছনে ফেলে আসা নরকের দিকে তাকালাম। রাত্রের অন্ধকারে যে ক্যাম্পে এসে ঢুকেছিলাম, আবার সেই রাতের অন্ধকারেই তা' ছেড়ে যাচ্ছি। মাঝে মাত্র দুটো বছর। কিন্তু মনে হয়, দীর্ঘ সমস্ত জীবনটাই বুঝি বা এই নরকে কাটিয়ে গেলাম।

জীবনটা এখানে অন্ধকার হলেও দেখার অনেক কিছু আছে। এই দু' বছরে আমার বয়েস অনেক বেড়ে গেছে। জীবন সম্পর্কে অভিজ্ঞতা হয়েছে-

তারচেয়েও বেশী। সবচেয়ে প্রতিকূল পরিবেশে কি করে জীবনসংগ্রাম করতে হয়, সেই পাঠ এখন আমার সম্পূর্ণ আয়ত্তে। সভ্য জগতের মাঝখানে দাঁড়িয়ে মানুষের সঠিক চরিত্রের অনুধাবন করা যায় না। কারণ সেখানে চরিত্রের সঠিক দিকটা মুখোসের আড়ালে ঢেকে রাখার সুযোগ পায় মানুষ। কিন্তু এই জীবন-মৃত্যুর সীমানায় দাঁড়িয়ে আয়নায় আসল রূপের প্রতিচ্ছবি পড়ে। এখানকার বন্ধুত্বই আসল বন্ধুত্ব। শেষ রুটির টুকরো অথবা শেষ বিন্দু জল দিয়েও যেমন এখানে একজন আর একজনের প্রাণ বাঁচিয়েছে অসীম উদারতায়, তেমনি অন্যের প্রাণের বিনিময়ে নিজের প্রাণ বাঁচাতেও দ্বিধা নেই—এমন চরম স্বার্থপর মনুষ্যত্বও দেখেছি। আলো এবং অন্ধকার জীবনের দুটো দিকই এখানে প্রকট।

বিষণ্ণ এই নভেম্বরের রাত্রে আর একবার ফিরে তাকালাম আউস্‌ভিৎজের দিকে। লক্ষ মানুষ চিরদিনের জন্য ক্যাম্পের মাটিতে মিশে গেলো। কতো আত্মা পঞ্চভূতে বিলীয়মান। আমরা মাত্র ক'জন সৌভাগ্যবতী এখনো বেঁচে থাকার জন্য বারবার সর্বশক্তিমান ঈশ্বরকে ধন্যবাদ জানালাম।

আমাদের ট্রেনের কম্পার্টমেন্টে তুলে দিয়ে বাইরে থেকে দরজা বন্ধ করে দিলো। গাদাগাদি অবস্থা। দমবন্ধ হয়ে আসার জোগাড়। একটু হাওয়া বাতাস আসার জন্য একটা জানালা বা ঘুলঘুলিও নেই। শুধু মেঝের দুটো ইস্পাতের জোড়ের ফাঁক দিয়ে যা এক আধটু বাতাস ভেতরে ঢুকছে। বসার মতো জায়গা নেই। কিছুক্ষণ বসে একজন উঠে দাঁড়ালে, আরকজনের বসার মতো জায়গা হয়। প্রায় ঘণ্টা দুই তিন পরে ট্রেনটা ছাড়ে। ট্রেনটা গতি নিলে অনেক মেয়ে সত্যি আউস্‌ভিৎজ্‌ থেকে বেরোতে পারার আনন্দে কাঁদতে আরম্ভ করে। কিন্তু আমার অবস্থা অন্যরকম। আমি ততোক্ষণে হাসতে শুরু করেছি। দুঃখের সাগরে দুটো বছর কাটিয়ে আমি যেন কাঁদতে ভুলে গেছি। নয়তো বা চোখের জলেরও একটা সীমা আছে। চেষ্টা করলেও আর চোখের জল বেরোবে না। সব শুকিয়ে গেছে, জীবনের সূক্ষ্ম অনুভূতিটাই যেন ইতিমধ্যে হারিয়ে ফেলেছি। কোথায় যাচ্ছি, সঠিক কেউ জানি না। তবু পরোয়া নেই। কাঁটা তারে ঘেরা নরক আউস্‌ভিৎজ্‌ থেকে তো মুক্তি পেয়েছি। যেখানে ইচ্ছে নিয়ে চলুক আমাদের। আমরা সবাই প্রতিজ্ঞা করি, আমাদের নতুন গন্তব্যস্থলে আমরা পরস্পর একত্রিত থাকবো। একতাই শক্তি। বিশেষ করে আউস্‌ভিৎজের দল। পৃথিবীর কোনো শক্তিই আমাদের আলাদা করতে পারবে না। হঠাৎ একটা মেয়ে গলা ছেড়ে গান গাইতে শুরু করে, আমরাও গলা মেলাই :

ডাই গেডাংকেন ঝিন্দ্ ফ্রাই···।

অর্থাৎ চিন্তা যেথা ভয়শূন্য···।

সময় নিরবধি। যেন স্থির হয়ে একজায়গাতেই দাঁড়িয়ে পড়েছে। আমি ঢুলতে আরম্ভ করেছি, মাঝে অন্যের লাথি খেয়ে সচকিত হয়ে উঠি। এতো অল্প পরিসর যে কারোরই পা ছড়াবার উপায় নেই। পা ছড়াতে গেলেই অপরের গায়ে লাগে। তবু তার মধ্যেই যতটুকু ঘুমানো যায়।

হঠাৎ ট্রেনটা থেমে পড়ে। দরজা খোলার শব্দ। এতোক্ষণ অন্ধকারে কাটিয়ে দিনের আলোতে চোখ ধাঁধিয়ে যায়। কোন দিকে ট্রেনটা এসেছে বলা অসম্ভব। কিছুটা দূরে আবার কাঁটা তারে ঘেরা জায়গা। আউস্‌ভিৎজের মতো। তার মানে এটা হলো গ্রোস-রোজেন। আউস্‌ভিৎজ্ থেকে অনেক বন্দীকে এখানে আনা হয়েছে। তা'হলে এতোক্ষণ আমরা পশ্চিমদিকে এসেছি। কিন্তু গ্রোস্-রোজেন তো আউস্‌ভিৎজের থেকে খুব একটা দূরে নয়? যাই হোক্ গ্রোস্-রোজেনের পুরনো বন্দীরা জানালো, রোজই বহুসংখ্যক বন্দীকে গ্রোস্-রোজেন থেকে বাইরে কোথাও নিয়ে যাওয়া হচ্ছে।

পরের দিন সকালবেলাতেই আবার আমাদের যাত্রা শুরু হলো। গ্রোস্-রোজেন ক্যাম্প থেকে আরো একশো মেয়ে আমাদের সঙ্গে জোটে। আবার সেই দম বন্ধ করা ট্রেনের কম্পার্টমেণ্ট। ট্রেন এবারেও পশ্চিমে ছোটে। অল্প কিছুক্ষণ পরেই একটা মাঠের মাঝখানে হঠাৎ ট্রেনটা দাঁড়িয়ে পড়ে। সঙ্গে সঙ্গে কম্পার্টমেণ্টের দরজাটা খুলে দিয়েই নাৎসী গার্ডদের কর্কশ গলার চিৎকার, —শূক্‌রীর দল, জল্‌দি নাম ট্রেন থেকে। নইলে পেটের তলায় লাথি মেরে ফাঁক করে দেবো সব।

অবশ্য এসব গালাগাল আর খিস্তি খেউড় শুনতে আমরা তখন প্রত্যেকেই অভ্যস্ত।

পাঁচজনের এক একটা দল করে সেই মাঠের মধ্যে দিয়ে আমরা হাঁটতে শুরু করলাম। ঘণ্টাখানেক হাঁটার পর দূরে দেখি, আবার সেই কাঁটা তারের বেড়া; সেন্টি বক্স, বিরাট বড়ো সদর দরজা। হঠাৎ মনের পরদায় ঝিলিক্ দিয়ে উঠলো, ওখানে কি তা'হলে চিমনীও আছে?

ক্যাম্প সুপারিন্‌টেন্‌ডেন্ট আমাদের চার্জ নিলো। আর ব্লকোভা আমাদের ঘরে নিয়ে এলো। আবার সেই বাংকের বিছানা। তবে দুটো মাত্র থাক্। এই যা বাঁচোয়া। আর এক একটা ঘরে মাত্র একশো জনের থাকার ব্যবস্থা। বাথরুম পায়খানা ছাড়াও ঠাণ্ডা জলের নল আছে। আঃ, বিলাসিতার চরম।

হ্যাঁ, আমাদের বর্তমান অবস্থায় এগুলো বিলাসিতারই নামান্তর। তবু একটা জিনিষ জানার জন্য মনটা আঁকুপাকু করে। গ্যাস-চেম্বার? এখানেও কি গ্যাস-চেম্বার আছে? কিন্তু ক্যাম্পের পুরনো মেয়েরা গ্যাস-চেম্বারের নামই শোনেনি জেনে হাঁফ ছেড়ে বাঁচলাম। সত্যি কি আরাম। নিশ্চিন্ত।

এ ক্যাম্পটা আগেকার তুলনায় অনেক ছোট। জার্মানীর দক্ষিণপুবের ছোট্ট সহর রাইখেনবাখ্, প্রায় ঘণ্টা দু'য়েকের হাঁটা পথ। সবাইকেই কাজ করতে নিয়ে যায় টেলিফুংকেন কারখানায়। টেলিফুংকেন কারখানায় যুদ্ধের আগে রেডিও তৈরী হতো। বর্তমানে অবশ্য যুদ্ধের উপকরণ তৈরী হয়। বর্তমানে মনে হয় এনারক্রাফ্‌টের বিভিন্ন অংশ প্রস্তুত করে। অবশ্য সঠিক বলা সম্ভব নয়; কারণ পুরো ব্যাপারটাই এখানে অত্যন্ত গোপনীয়।

পরদিন সকালে আউস্‌ভিৎজ্ থেকে আসা মেয়েদের কারখানায় নিয়ে যাওয়া হলো। কি ধরনের কাজ আমাদের করতে হবে তাই দেখাতে। আউস্‌ভিৎজ্ ক্যাম্পের মতো সকাল চারটের সময় উঠে গুণতি, তারপর রুটির টুকরোর রেশন। শেষে দল বেঁধে ছোট্ট সহর রাইখেনবাখের ভেতর দিয়ে কারখানায় যাওয়া। যেতে যেতে দেখতাম, রাস্তার পাশের বাড়ীগুলো ঘুমন্ত; জানালা দরজার পর্দাগুলো টানা। তবু বাড়ীঘর, রাস্তাঘাট আর ফুটপাত দেখে মনে আমার সাহস ফিরে আসে। যদিও ফুটপাত দিয়ে হাঁটা আমাদের নিষিদ্ধ। রোজ দলবেঁধে যাওয়ার সময় একটা বাড়ীর কাছে কয়েক মুহূর্তের জন্য থামতাম। বাড়ীটা বেকারী। রুটির গন্ধ আর থরে থরে সাজানো রকমারী কেক্ দেখলেই হুমড়ি মেরে খেতে ইচ্ছে যেতো। কিন্তু—। আউস্‌ভিৎজের মতো ম্যানেজ করারও উপায় নেই। সকালে এক টুকরো শুকনো রুটি আর রাত্তিরের ডিনার পাতলা জলের মতো স্যুপ। রোববারের স্যুপটা শুধু একটু ঘন।

বরফ পড়তে শুরু করে দিয়েছে। হাঁটু সমান বরফের কাদার মধ্যে দিয়ে যাতায়াতে ঘণ্টা চারেক হাঁটায় পা দুটো ক্ষত-বিক্ষত। তবু পায়ে কাগজ জড়িয়ে নিয়ে চেষ্টা করতাম বরফের কামড় থেকে বাঁচতে। সাধারণ জার্মান নাগরিকদের পাশাপাশি বসে কাজকর্ম করলেও ওদের সঙ্গে আমাদের কথাবার্তা বলা বারণ। ওরাও ভয় পেতো আমাদের সঙ্গে কথা বলতে। অবশ্য মনের দিক থেকে আমরা জার্মানদের তখন এতো ঘৃণা করি যে ওদের সঙ্গে কথা বলার প্রবৃত্তিও আমাদের কারোর বিন্দুমাত্র নেই। তা'ছাড়া নাৎসী মেয়ে-গার্ডরা সব সময় কারখানার মধ্যে টহল দিয়ে ফেরে। যা'তে আমরা কারোর সঙ্গে কোনোরকম যোগাযোগ না করি।

একটা জার্মান মেয়ের পাশে বসে আমাকে কাজ করতে হয়। টেবিলের ওপর এক্স-রে কনট্রোল সেট্‌-এর মতো একটা সেট্‌ বসানো। সেট্‌টায় অনেক-গুলো ডায়াল আর মিটার লাগানো। একটা নির্দিষ্ট ভোলটেজে ইলেকট্রিক কারেণ্ট পৌঁছলে সেট্‌টাকে বন্ধ করে দিতে হবে। প্যানেলের পেছনে একটা গ্যাস-ষ্টোভ; তা'তে বাল্‌বের আকারে কাঁচ ব্লো করে। ঠিক তার নীচেই একটা সিলিণ্ডারে কার্বন-ডাই-অক্সাইড্‌ জমা হচ্ছে। আমার প্রধান কাজ হলো সিলিণ্ডারটা ভর্তি হলে সেটা সরিয়ে দিয়ে আরেকটা খালি সিলিণ্ডার রাখা। এটা যে বিপজ্জনক সেটাও আমাকে কেউ বলে দেয়নি। একদিন হঠাৎ ভরা সিলিণ্ডারটা থেকে উপচে কিছুটা কার্বন-ডাই-অক্সাইড চল্‌কে পড়ে জামাকাপড়ে ঢাকা থাকা সত্ত্বেও ডান হাতটা সাংঘাতিক ভাবে পুড়ে যায়। কথা বলা বারণ, তাই পাশের মেয়েটাকে কী করে বলি? ইসারা করে দেখাতেই মেয়েটা ছোটে ফোরম্যানের কাছে, আর ফোরম্যান সঙ্গে সঙ্গে ছোটে নাৎসী মেয়ে-গার্ডের খোঁজে। কিন্তু নাৎসী মেয়ে-গার্ডটা মেয়েটাকে এমন মুখ ঝামটা দেয় যে মেয়েটা ভয়ে সিঁটকে চুপ করে নিজের জায়গায় ফিরে গিয়ে বসে। পোড়া হাতটা বিষিয়ে উঠে বেশ কিছুদিন ভুগিয়েছে আমাকে। তবু সংসারে অনেক কিছুর মতো এটাও একদিন সারে।

ঘটনাটায় আমার পাশের জার্মান মেয়েটা অবাক হয়ে যায়। এ কি নির্দয়তা! এর পরেই মেয়েটা চুপি চুপি আমার পোড়া হাতটা সম্পর্কে খোঁজখবর নিতো। হয়তো ওর জানা নেই ওর স্বজাতিরাই কতো নরাধম, কী ভীষণ নিষ্ঠুর। মেয়েটা রোজ লুকিয়ে লুকিয়ে একটা স্যাণ্ডুইচ্‌ নিয়ে এসে নির্দিষ্ট জায়গায় রেখে দিতো। আমি সবার অলক্ষ্যে এক সময় তুলে নিতাম স্যাণ্ডুইচ্‌টা। এটাতে অবশ্য ঝক্কি কম নয়; ধরা পড়লে মেয়েটার আর রক্ষে নেই। আর এই স্যাণ্ডুইচ্‌টাই আমাকে দিনের পর দিন বাঁচিয়ে রেখেছে। নইলে সকালের এক টুকরো রুটি আর ডিনারের পাতলা স্যুপে কিছুতেই বাঁচতে পারতাম না।

স্যাণ্ডুইচ্‌টা এনে রাত্রে আমি আর মা একটু একটু করে খেতাম। যাতে তাড়াতাড়ি ফুরিয়ে না যায়। অনেক মেয়ে রাত্রে শুয়ে শুয়ে ক্ষিদেয় কাঁদতো। কয়েক সপ্তাহের মধ্যেই আমরা আবার রুগ্ন হয়ে গেলাম। খেতে না পাওয়ায়। তবু সবাই মিলে তো আউস্‌ভিৎজ্‌ থেকে বেরোতে পেরেছি।

কাজ থেকে ফিরে গুণতির পর আমাদের করণীয় আর কিছু ছিলো না। ঘরের ভেতরে আগুন জ্বেলে কিছুটা জল গরম করে স্নান করতাম। কাকস্নান হলেও যতোটা পরিষ্কার রাখা যায় শরীরটাকে। খাওয়ার থালায় করে যতোটুকু

জল গরম করা যায়, ততোটুকুই করতাম। বাংকের ওপরের কাঠের পাটাতন ভেঙে নিয়ে সেই কাঠ দিয়ে আগুন জ্বালতাম। কিন্তু একদিন দেখি আমার আর মা'র বিছানার নীচের পাটাতনটার মাত্র দুটো কাঠ অবশিষ্ট আছে। সেটা ভাঙলে শুধু সিমেণ্টের বাংকের ওপর শুতে হবে। সুতরাং স্নানও বন্ধ। তবু আউস্‌ভিৎজে কোনো জিনিষ পেতে হলে ফন্দি ফিকির করে জোগাড় করতে করতে অনেক কিছু শিখেছিলাম। সেই বুদ্ধিটাকেই আবার শান দিলাম। কারখানায় স্ক্রু বয়ে নিয়ে যাওয়ার টিনের পাত্রটা নিয়ে গিয়ে দরজাটা বন্ধ করে স্নান করতাম। এ বন্দী-জীবনে বাঁচতে হলে যে করেই হোক নিজেকে যতোটা সম্ভব পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন রাখা দরকার।

আউস্‌ভিৎজ্‌ ক্যাম্প থেকে আসা মেয়েদের মধ্যে মার্থা ছিলো চুরি বিদ্যায় ওস্তাদ। রোজ কারখানায় যাতায়াতের পথে কয়েকজন করে নাৎসী মেয়ে গার্ড সঙ্গে থাকতো। আর তারা সব সময়ই পকেটে করে তাদের লাঞ্চ সঙ্গে নিতো। মার্থা ঠিক তাদের পাশে পাশে হাঁটাব সময় পকেট থেকে লাঞ্চের প্যাকেটটা পকেট মারতো। সবচেয়ে আশ্চর্যের বিষয় একবারও ধরা পড়ে নি। ওর জ্বালাতে আমাদের অস্থির অবস্থা। আমাদের জিনিষপত্রও ওর হাত থেকে রেহাই পেতো না। একবার তো আমার একটা সোয়েটার বিছানার নীচ থেকে চুরি করে। পরতে দেখলেও উদ্ধার করতে না পারায় ঠাণ্ডায় আমার দাঁত কপাটি লাগার জোগাড়। কিন্তু ঝগড়া করেও তো মার্থার সঙ্গে পারার জো নেই।

গত কয়েক বছরের মতো এবারেও খ্রীষ্টমাস আর নববর্ষ জানান না দিয়েই চলে গেল। অক্টোবরের প্রথমদিকে আউস্‌ভিৎজ্‌ ছেড়েছি। প্রায় চার মাস হয়ে গেল। ১৯৪৫ সাল। ফেব্রুয়ারী মাসের গোড়াতেই গুলি গোলার শব্দ শুনতে পেলাম। অবশ্য অস্পষ্ট। অনেক দূর থেকে ভেসে আসা আওয়াজ। রোজই আওয়াজটা একটু একটু করে স্পষ্ট হচ্ছে। অর্থাৎ এগিয়ে আসছে। আর শব্দ শুনেই বুঝতে পারি এগুলো বোমার আওয়াজ নয়; গ্রাউণ্ড আর্টিলারী। এ তো গোলাগুলির শব্দ নয়, যেন মুক্তির স্বাদ বয়ে আনা বেটোফেনের সুমিষ্ট কোনো সিম্‌ফনির টুকরো। শব্দ যতো কাছে এগোয়, আমাদের নাচ-গান, আনন্দের হুল্লোড়ও ততো বাড়ে।

কয়েকদিন পরে আমাদের টেলিফুংকেন রেডিও কারখানায় নিয়ে যাওয়া বন্ধ হলো। সে রাত্রে এতোটুকু ঘুমোতে পারি নি। আসলে উত্তেজনায় সমস্ত শরীর তখন কাঁপছে। কর্ণপটহ বিদীর্ণ করা গোলাগুলির আওয়াজ। এতো কাছে যে মনে হচ্ছে মিত্রশক্তি নিশ্চয়ই রাইখেনবাখ্‌ শহরটা দখলে নিয়েছে। আর

রাইখেনবাখ, আমাদের ক্যাম্প থেকে তো চার-পাঁচ মাইলও নয়। হাত বাড়ালেই যথেষ্ট। তা' হলে-?

হঠাৎ রাতের নিস্তব্ধতা টুকরো টুকরো করে ভেঙে নাৎসীদের চিৎকার ভেসে আসে,—গেট্ আপ্। শূকরীর দল লাইন দিয়ে দাঁড়া।

এই বিশ্রী চিৎকারের সঙ্গে আমাদের সবারই পরিচয় আছে। নিজেব মনেই হাসি পায়। কতো বোকা আমরা! এতোক্ষণ ভেবে এসেছি মিত্রশক্তি রাইখেনবাখ্ থেকে এগিয়ে এলে এরা আমাদের ওদের হাতে ছেড়ে দিয়ে পালিয়ে যাবে।

এক্ষুণি পুরো ক্যাম্পটাকে ইভাকুয়েশান করতে হবে। বিশেষ করে আজকের রাতটা আমার মনে থাকবে। আঠারোই ফেব্রুয়ারী। মা'র জন্মদিন। মা'র জন্মদিনে ঈশ্বরের কাছ থেকে কী উপহার পাবো একমাত্র ভবিতব্যই তা বলতে পারে!

ক্যাম্পের বাইরে আমরা তখন সবাই জমায়েত হয়েছি। কয়েক হাজার মেয়ে। ক্যাম্প কমাণ্ডার জানায়, বেশীর ভাগ সদর রাস্তা মিত্রশক্তির দখলে। বাকী যে ক'টা আছে জার্মান কনভয় যাতায়াতের জন্য সে সব রাস্তা ব্যবহার করা সম্ভব নয়। একমাত্র পশ্চিম দিকের একটা রাস্তা খোলা আছে। সেটাও পাহাড় ডিঙিয়ে। যে করেই হোক আমাদের সে রাস্তা ধরেই এগোতে হবে।

ঘুরঘুট্টি অন্ধকার; আকাশের বুকেও এতোটুকু আলোর ইশারা নেই। আমরা ক্যাম্প থেকে বেরিয়ে জার্মানীর সাউথ ইষ্ট কোণের ইউলেন গেবার্গে পর্বতমালার দিকে দলবদ্ধ ভাবে হাঁটতে শুরু করলাম। লম্বা কনভয়, যেন শেষ নেই। পাঁচজন করে এক একটা দলে। কিন্তু আমাদের কনভয়টা এতো ধীরে ধীরে চলেছে যে মনে হয় রাশিয়ানরা নিশ্চয়ই আমাদের ধরে নেবে। প্রথম প্রথম কনভয়টা সুশৃঙ্খল ছিলো, কিন্তু একটু পরেই দল ভেঙে গিয়ে বিশৃঙ্খলা দেখা দিলো। মেয়েরা ক্লান্ত হয়ে পেছিয়ে পড়তে লাগলো। যেন একটা দীর্ঘ শোকযাত্রা চলেছে।

হাঁটতে হাঁটতে গ্রোস্ ইউল অর্থাৎ ইউলেন গেবার্গের সবচেয়ে উঁচু চূড়ার পাদদেশে পৌঁছলাম। আদেশ হলো সেই সুউচ্চ চূড়া বেয়ে চূড়াটাকে অতিক্রম করে ওধারে যেতে হবে আমাদের। তার মানে সমানে ঘণ্টার পর ঘণ্টা আমাদের চড়াই ভাঙতে হবে। আর বরফ জমা পাহাড়ের গা অত্যন্ত পিচ্ছিল। সুতরাং প্রতি পদক্ষেপে পা হড়কে নীচে গড়িয়ে পড়ে হাত-পা ভাঙার সম্ভাবনা। এতোদূর একনাগাড়ে পথ হেঁটে এসে একেই সবার অবস্থা শোচনীয়, তার

ওপর অনেকেরই পাহাড়ে চড়ার অভ্যাস নেই। কয়েক পা চলার পরেই বুকে হাঁফ ধরে। এমন কি নাৎসী গার্ডগুলোর অবস্থাও ভাল নয়। অল্পক্ষণের মধ্যেই আমার পা দুটো পাগলের মতো চুলকোচ্ছে। অসহ্য গরম। দরদর করে ঘামছি। প্রথমেই গায়ের কোটটা খুলে ছুঁড়ে ফেলে দিলাম। তারপরে পথে কাজে লাগতে পারে ভেবে বাংক থেকে যে কম্বলটা নিয়ে এসেছিলাম, সেটাও ফেলে দিলাম! আসলে পা দুটো যেন শরীরটাকেই টানতে পারছে না। অতিরিক্ত একটা খড়ের ওজনও এই অবস্থায় অসহ্য। চলার ক্ষমতার শেষ বিন্দুটা পর্যন্ত নিঃশেষ।

আমরা আবার প্রতিজ্ঞা করলাম আউস্‌ভিৎজের সবাই যে রকম অবস্থাতেই হোক্ একসঙ্গে থাকবো। সামনেই হয়তো বা এমন পরিস্থিতির সম্মুখীন হতে হবে যেখানে পরস্পরের সাহায্য একান্ত প্রয়োজনীয়। কাউকে ধরে, কাউকে কাঁধে তুলে নিয়ে চলতে লাগলাম। নিঃশেষিত শক্তি, শূন্য পাকস্থলী, শারীরিক অসহ্য যন্ত্রণা যাতে আমাদের পরাজিত করতে না পারে, তার জন্য দু'পাশের দৃশ্যাবলী, পথ চলার আনন্দ প্রাণপণে উপভোগ করার চেষ্টা করি। সবকিছু ভুলে থাকতে গলা ছেড়ে গান গাই সমবেত কণ্ঠে।

পেছনে পেছনে নাৎসী গার্ডগুলো এক নাগাড়ে খিস্তিখেউড় বর্ষণ করে চলেছে, —জল্‌দি শূকরীর দল, চটপট হাঁট। এক লাথিতে পেট ফাটিয়ে দেবো, ইত্যাদি ইত্যাদি। খিস্তি-খেউড়ের বদলে ওদের শোচনীয় অবস্থা দেখে আমরা তখন হাসছি। ধীরে ধীরে কনভয়টা পাতলা হয়ে আসছে। পিছিয়ে রাস্তায় শুয়ে বা বসে পড়লে নাৎসী গার্ডগুলো গুলি করে বা রাইফেলের বাঁট দিয়ে খুলিটা দু'ফাঁক করে মৃতদেহটা ওখানেই ফেলে দিচ্ছে।

আমাদের মধ্যে একটা মেয়ে সাহসে ভর করে একটা গার্ডকে জিজ্ঞাসা করে, —আমাদের কোথায় নিয়ে যাওয়া হচ্ছে?

—আমার জানা নেই। গার্ডটার নির্লিপ্ত উত্তর।

—কিন্তু কতোদূরে? আবার মেয়েটা প্রশ্ন করে।

—কতোদূরে আর হবে? কয়েকশো কিলোমিটার। গার্ডটার উত্তরের সেই একই ভঙ্গি।

তার মানে? আমাদের সবার ভেতরে আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়ে। খালিপেটে, শীতে এই অবস্থায় আরো কয়েকশো কিলোমিটার হাঁটতে হবে? আর সেখানে আমাদের জন্য কী অপেক্ষা করছে কে জানে? যতোটুকু শক্তিও বা ভেতরে ছিলো, মুহূর্তে উবে যায়। বড়ো জোর এতোক্ষণে তিরিশ-চল্লিশ কিলোমিটার

এসেছি। এর মধ্যেই অনেকে চিরদিনের মতো মাটিতে আশ্রয় নিয়েছে। আমাদের মধ্যে একজনও কি তাহলে গন্তব্যস্থানে পৌঁছতে পারবে? নাকি সম্ভব? ইতিমধ্যেই প্রতিটি পদক্ষেপ জীবনের শেষ পদক্ষেপ বলে মনে হচ্ছে। এরচেয়ে দল ছেড়ে দিয়ে দৌড়ে পালিয়ে গেলে কেমন হয়? কিন্তু বেশীর ভাগই এতে সায় দেয় না। আইডেনটিটি কার্ড ছাড়া, কামানো মাথা, বাহুতে নম্বর, বিরাট রেড ক্রশ আঁকা পিঠ, জুতো নেই, কয়েদীর জামাকাপড় পরা, সর্বোপরি নিঃশেষিত শক্তি; সুতরাং খুব বেশী দূরে যাওয়ার আগেই আবার নাৎসী শয়তানদের হাতে ধরা পড়ে যন্ত্রণাদায়ক অবধারিত মৃত্যুর চেয়ে দলের মধ্যে একসঙ্গে এতোজনে মিলে থাকলে প্রয়োজনে অনেক বেশী বুঝতে পারবো।

অতিকষ্টে চড়াই ভেঙে চূড়াতে উঠেই আমরা সবাই থমকে দাঁড়ালাম। সামনেই ছোট ছোট জঙ্গলে ভর্তি একটা জমি। তা'তে কয়েকটা গরুর গাড়ী দাঁড়িয়ে। কয়েকটা মুহূর্ত মাত্র। তারপর সবাই ধাওয়া করলাম গরুগুলোকে। তেষ্টায় তখন বুকের ছাতি ফেটে যাচ্ছে। উষ্ণ পানীয়। দুধ। কতো বছর খাইনি। গরুগুলো চিৎকার করে যেদিকে পারলো ছুট্ দিলো। গাড়ীর ভেতরের লোকগুলো হতভম্ব। ভালো করে তখনো বুঝে উঠতে পাবেনি ব্যাপারটা কী হচ্ছে? কিন্তু আমরা যে গরুটাকে হাতের কাছে পেয়েছি, বাঁট টেনে তারই দুধ দুইতে শুরু করেছি। আমার সামনেই বিরাট একটা গরু দাঁড়িয়ে। আমি আগুপিছু বিবেচনা না করেই সেটার বাঁট ধরে টান দিয়েছি। জীবনে কোনোদিন দুধ দুইনি। কয়েকটা মুহূর্ত মাত্র। তার পরেই মাটিতে আছড়ে পড়লাম। আমি হঠাৎ বাঁটে টান দেওয়ায় গরুটা বিমূঢ় হয়ে পড়েছিলো। একটুক্ষণ মাত্র। তারপরেই সবেগে ঘুরে গিয়ে জন্তুটা কষায় এক লাথি। বেশ কয়েকদিন সে লাথির ব্যথা গায়ে গতরে ছিলো। যাই হোক্ শেষ মুহূর্তে ঝেড়ে ঝুড়ে উঠে দেখি, যেটাকে দুইতে গেছি, সেটা গরু নয়, সেটা একটা বলদ। পরমুহূর্তেই ছুটেছি আরেকটা গরুর পেছনে। কোনোরকমে আমার হাতের মগটা যখন দুধে ভর্তি হয়েছে, ততোক্ষণে নাৎসী গার্ডগুলো বুঝতে পেরেছে ব্যাপারটা কী।

আসলে রাশিয়ানরা দ্রুত এগিয়ে আসছে। তাই গ্রাম ছেড়ে দিয়ে চাষের বলদ বা গাইকে গাড়ীতে জুতে পুরো সংসারটা তার ওপর চাপিয়ে জার্মানরা ইভাকুয়েশান করছে। গাড়ীর দু'পাশে বিরাট বড়ো বড়ো সসেজ্ ঝুলছে। দেখলেই জিভ দিয়ে জল গড়ায়। ওদের ইভাকুয়েশান করতে দেখে আমাদের তখন আনন্দ আর ধরে না।

অবশেষে গার্ডরা আমাদের থামতে বলে। রাস্তার ওপরেই ক্ষত-বিক্ষত পা

নিয়ে আমরা বসে পড়ি। নিজেদের মধ্যেই আলোচনা করি, এ রাস্তাটা ছাড়া জার্মানদেরও যখন ইভাকুয়েশানের অন্য পথ খোলা নেই, তখন আমরাও ওদের পাশাপাশি হাঁটবো। অর্থাৎ, দলছাড়া হবো না। ক্ষিদের সময় খাওয়া আর তেষ্টায় পানীয় মিললেই ব্যস্। আউস্‌ভিৎজে যারা কাটিয়েছে, এর চেয়ে তাদের জীবনে আর বেশী কি কাম্য! যে করেই হোক্ আমাদের বেঁচে থাকতে হবে। আমরা বাঁচবোই।

দীর্ঘ পথ চলার পর কয়েক মিনিটের জন্য বিরতি। সারাটা দিন ক্লান্ত অবশ হয়ে আসা পা দুটোকে টেনে টেনে চলা। ধীরে ধীরে আমরা, আউস্‌-ভিৎজের দল অন্যান্য জাতের মেয়েদের সঙ্গে ছিট্‌কে মিশে যেতে লাগলাম। এতো ক্লান্ত যে পরস্পরের সঙ্গে পরস্পরের কথা বলার মতো আগ্রহও নেই। জুতো, কোর্ট, সোয়েটার, স্কার্ফ ইত্যাদি জিনিষপত্র এখানে ওখানে ছড়ানো। এক পাউণ্ড ওজনের জিনিষ এক টনের চেয়েও বেশী ভারী লাগছে। তাই যতোটা পারা যায় জিনিষপত্র ফেলে দিয়ে হালকা হওয়ার আগ্রহ সবারই। জিনিষপত্র তো দূরের কথা, নিঃশ্বাস নিতেও কষ্ট হচ্ছে। রক্ষীদের হাতে শুধু রাইফেল; ওদের বাকী জিনিষপত্র, হ্যাভারশ্যক্, গোটানো কম্বল সব তো আমাদের পিঠে চাপিয়ে দিয়েছে। একটু চোখের আড়াল হলেই ওদের হ্যাভারশ্যক্ খুলে যতোগুলো পারি জিনিষপত্র ছুঁড়ে ফেলে দিই। যতোটুকু পাত্‌লা করা যায় আর কি!

প্রায় ঘণ্টা কুড়ি হেঁটে আসার পর সন্ধ্যা নামে। শরীরে এতো ক্লান্তি যে ক্ষিদের কথা মনেও আসে না, শুধু যেখানে হোক্ শুয়ে পড়া, ক্ষত-বিক্ষত পা দুটোকে বিশ্রাম দেওয়া। মোজা ছাড়া শুধু জুতো পরায় আমার পা দুটোয় ইতিমধ্যেই বিরাট বিরাট ফোস্‌কা পড়েছে! শেষে অন্ধকারে পথ যখন আর দেখা যায় না, তখন এলো বিরতির আদেশ। যে যেখানে পারে বসে পড়ে। রাস্তার পাশে যেখানে দাঁড়িয়েছিলাম, সেখানেই শুয়ে পড়ি। যদিও মনে হচ্ছে, পুরো বছর খানেক ধরে কয়েক হাজার কিলোমিটার পথ হেঁটেছি, কিন্তু সত্যি-কারের তো আজ মাত্র প্রথমদিন, আর বড়ো জোর পঞ্চাশ ষাট কিলোমিটারও এই চড়াই ভেঙে হেঁটেছি কিনা সন্দেহ।

আঃ, বরফের মতো ঠাণ্ডা জমির ওপর শুয়ে কী আরাম। বৃষ্টি বা বরফ পড়তে শুরু করেনি এই যা বাঁচোয়া। তবু যতোটুকু শরীরের উত্তাপে নিজেদের গরম রাখা যায়, তাই পরস্পর পরস্পরকে নিবিড় করে জড়িয়ে ধরি। কখন যে পুরো রাতটা পেরিয়ে গেছে টেরই পাই নি। শুধু সকালে ঘুম ভেঙে উঠে

দেখি সারা গায়ে ব্যথা। হাত-পাগুলো যেন শক্ত হয়ে গেছে।

পরের দিন আমরা অনেকগুলো গ্রামের মধ্যে দিয়ে হাঁটলাম। বেশীর ভাগ জার্মান অধিবাসী অর্থাৎ চাষীদের মধ্যে গ্রাম ছাড়ার সাজ সাজ রব পড়ে গেছে। গরুর গাড়ীতে আলু, বীট, বাঁধাকপি ইত্যাদি ভর্তি করে যতোদূরে পারা যায় পশ্চিমে হটে যাচ্ছে আর এই ধরনের গাড়ী এলেই আমরা আউস্‌ভিৎজ্‌ গ্রুপ ঝাঁপিয়ে পড়ি; গার্ডগুলো রাইফেলের বাঁট দিয়ে মেরে আমাদের রুখতে চাইলেও এতগুলোকে থামাবে কী করে?

ভেবেচিন্তে ঠিক করলাম, এরপর থেকে রাত্রিবেলা গাড়ীগুলোর ওপর ঝাঁপিয়ে পড়বো। গার্ডগুলো ঘুমোলে রাইফেলের বাঁটের গুতো খেতে হবে না। সবাই শুয়ে পড়লেও আমাদের মধ্যে কয়েকজন পালা করে ঘুমাতো না। গার্ডগুলোর নাক ডাকতে আরম্ভ হলেই তারা সিগন্যাল দিতো, আর আমরা বুকে হেঁটে সামনাসামনি কোনো খামার বাড়ীতে গিয়ে ঢুকতাম। ঘন অন্ধকার; এক হাত দূরের জিনিষও স্পষ্ট দেখা যায় না। হাতড়ে দেখি লোমশ একটা জন্তু শুয়ে। ভালো করে হাত বুলিয়ে বুঝতে পারি ঘোড়া। পাশেই একটা খড়ের গাদা, গরম। নিজেকে সেঁধিয়ে দিই সেই খড়ের গাদার ভেতরে। একেবারে ঘোড়াটার গায়ে গা লাগিয়ে। তারপর গভীর ঘুম।

হঠাৎ একজনের ডাকে ধড়ফড় করে উঠে পড়ি। সকাল হতে আর বেশী দেরী নেই। তার আগেই কিছু খাবার জোগাড় করে নিজেদের জায়গায় ফিরতে হবে।

বুকে হেঁটে পাশের শেডে গিয়ে দেখি ওটা একটা গোয়াল ঘর। দুধ দুইয়ে মগটা ভর্তি করে নিয়ে কিছু খাদ্যের অন্বেষণ করি। মুরগী ঘরের থেকে কিছু ডিম আর আলু জোগাড় করে নিঃশব্দে রাস্তার পাশে নিজের জায়গায় ফিরে আসি। গার্ডগুলো তখনো অঘোর ঘুমে অচেতন। আসলে ওরাও কম পরিশ্রান্ত নয়; আর রাত জেগে পাহারা দিতে ওদের বয়ে গেছে। কেউ যদি পালিয়ে যায় তা'তে ভ্রুক্ষেপ নেই। আসলে মিত্রশক্তি এগিয়ে আসাতে ওদের মনের দিক থেকে হতাশা নেমেছে। পালিয়ে যাওয়ার সুবর্ণ সুযোগ। অনেকে হয়তো বা এই সুযোগে পালিয়েও গেছে। কিন্তু এখান থেকে এই অবস্থায় পালিয়ে গিয়েও লাভ নেই। বরং নিশ্চিত মৃত্যু। কখনো কখনো ঘুমন্ত অবস্থায় ওদের হাতের রাইফেল কেড়ে নিয়ে মুখ ঘুরিয়ে ওদের গুলি করে হত্যা করার তীব্র একটা ইচ্ছে শিরায় শিরায় পাক খেয়ে ওঠে। কিন্তু ও-পথে যাওয়া মানেই আত্মহত্যাকে সেধে ডেকে আনা। কারণ কোনো একটা ছুতানাতায় এরা

গুলিবৃষ্টি ঝরাতে বিন্দুমাত্র দ্বিধা করবে না।

ক'দিন ধরে সমানে হেঁটে চলেছি। দিনের হিসেব অবশ্য মনে নেই। আসলে মনের এই অবস্থায় দিন গুণে মনে রাখা সম্ভব নয়; প্রয়োজনও নেই। তবু প্রায় দিনের বেশীর ভাগ সময় সূর্যটা আকাশে থাকে এই যা বাঁচোয়া। রাত্রে অবশ্য প্রচণ্ড ঠাণ্ডা। তাপমাত্রা বরফাংকের নীচেই। আমাদের চলার পথে সুন্দর সুন্দর বন, লেক্ ইত্যাদি অতিক্রম করে চলি। আসলে এই দিক্‌টা প্যানরমিক্ দৃশ্যাবলীর জন্য বিখ্যাত।

ধীরে ধীরে সবাই উপলব্ধি করে বাঁচতে হলে আমাদের বেছে নিতে হবে—হয় কেড়ে খাও, নয় শুকিয়ে মরো। মধ্যবর্তী আর কোনো পথ খোলা নেই। আর যাদের কেড়ে নেওয়ার হিম্মত নেই, তাদের রাস্তা সোজা চলে গেছে কারখানায়। প্রথম দু'তিন দিনের ধাক্কায় অনেকেই তাই পথের ওপর চিরদিনের মতো শুয়ে পড়লো।

একদিন অকস্মাৎ এক বালতি চর্বি পেয়ে গেলাম। গরুর গাড়ীর পাশে ঝুলিয়ে নিয়ে একদল জার্মান রিফ্যুয়িজি ইভাকুয়েশান করছে। প্রথমে বুঝতে পারিনি যে ঠিক কী করবো বালতি ভর্তি চর্বি নিয়ে? একটু পরেই সমস্যার সমাধান হলো। ফোস্কা ভর্তি ক্ষত-বিক্ষত পায়ে চর্বি লাগালে অনেক আরাম পাওয়া যায়। একে তো জুতো নেই, কম্বলে জড়িয়ে খালি পায়ে এই উঁচু-নীচু পাথুরে রাস্তায় কতদিন আর হাঁটা যায়! চর্বি ভর্তি বালতিটা একে একে সবার হাতে ঘুরতে থাকে। পা ডোবানোর জন্য।

অনেক সময় খাদ্য বলতে কিছু জোটে না। তখন আমরা রাস্তার দু'পাশের জমি থেকে ঘাস ছিঁড়ে নিয়ে যতোটা পারা যায় ক্ষুন্নিবৃত্তি করি। গরু ঘোড়া যদি শুধু ঘাসের ওপর নির্ভর করে তাবড় চেহারা নিয়ে বেঁচে থাকতে পারে, তা'হলে আমরাই বা পারবো না কেন? তবু আমাদের দল দিনের পর দিন পাতলা হয়ে আসতে লাগলো; আসলে সেই বরফ-ঠাণ্ডা রাত্রে রাস্তার পাশের খোলা জমিতে শোয়া অনেকেই সহ্য করতে পারে না। একদিন সন্ধ্যের সময় দেখি পাশেই একটা গোয়ালঘর। রাত্রে গার্ডগুলো ঘুমোলে বুকে হেঁটে চলে গেলাম। ছাদবিহীন খোলা জায়গার থেকে গোয়ালঘর অনেক বেশী গরম। তার ওপর কপালে খড় জুটে গেলে তো কথাই নেই। কিন্তু অন্ধকারে দেখতে না পেয়ে পা ফসকে কয়েক ফুট নীচে একটা গোবর ভর্তি গর্তে পড়ে গেলাম। সকালবেলায় সঙ্গীরা আমার বেশভূষা দেখে হেসে গড়াগড়ি। সারা গায়ে গোবর মাখা এক কিম্ভূতকিমাকার মূর্তি।

পরের দিনটা আরামে কাটলো। পথের ধারেই একটা কয়লার খনি। তারই একটা বিরাট হল্‌ঘরে রাতের মতো ঠাঁই জুটলো। পাথরের মেঝে। নিরেট শক্ত। তবু খোলা জমির চেয়ে অনেক গরম। সকালে উঠে দেখি সারা শরীর কয়লার গুড়োয় মাখামাখি। সবারই এক অবস্থা। চেনা দায়। অবশ্য ময়লাকে তখন আর আমরা গ্রাহ্যের মধ্যে আনি না। উকুন কিলবিল করছে সারা শরীরে। একটু সময় পেলেই একজন আরেকজনের উকুন মারি। চুলকানির হাত থেকে যতোটুকু রেহাই পাওয়া যায় আর কি। মধ্যে মধ্যে বরফ ঘষে ঘষে সারা শরীর পরিষ্কার রাখতে চেষ্টা করি। কিন্তু বরফ দিয়ে কি আর শরীর পরিষ্কার রাখা যায়?

খোলা মাঠের পাশ দিয়ে যেতে যেতে দিনে দু'তিন-বার গার্ডগুলো চিৎকার করে ওঠে—হল্ট্‌! অর্থাৎ পায়খানা প্রস্রাবের বিরতি। সঙ্গে সঙ্গে শ'য়ে শ'য়ে মেয়ে খোলা মাঠেই তাদের প্রয়োজন মেটাতে ছোটে। সে এক অদ্ভুত দৃশ্য। একে তো নাৎসী গার্ডদের আইন অনুসারে ঝোপ-ঝাড়ের আড়াল হওয়া চলবে না, আর গার্ডদের একশো গজের মধ্যে থাকা চাই। বেশীর ভাগ গার্ড-ই একেবারে গা ঘেঁষে দাঁড়ায়। ওদের দিকে মুখ করে বসার নিয়ম, কিন্তু একটু সুযোগ পেলেই মজা করে ওদের পাছা দেখাই। আর হেসে নিজেরাই লুটো-পুটি খাই। এ জীবনে এটাই একটা বড়ো রকমের কৌতুক।

নাৎসী গার্ডগুলোও ইতিমধ্যে বিরক্ত হয়ে উঠেছে। আসলে আমাদের কোনো গন্তব্যস্থল আছে কিনা, সেটা বোধহয় গার্ডদেরও জানা নেই। সোজা সদর রাস্তা ধরে এগিয়ে চলেছি। মাঝে মাঝে ছোট ছোট গ্রাম পেরিয়ে। কখনো দলে দলে রিফ্যুজিরা গরুর অথবা ঘোড়ার গাড়ীতে পুরো গৃহস্থালী চাপিয়ে নিয়ে এদিক ওদিক চলেছে। দেখলে মনে হয়, হঠাৎ বৃষ্টির ফোঁটা পড়ায় পিঁপড়ের দল বিপর্যস্ত হয়ে বাসা ছেড়ে নিরাপদ আশ্রয়ের খোঁজে ইতস্তত ছোটাছুটি শুরু করে দিয়েছে। মাঝে মাঝে কনভয়গুলোকে পাহারা দিয়ে সৈন্যরা এগিয়ে নিয়ে চলেছে। একবার এইরকম কনভয়গুলোকে যেতে দেখে ঝাঁপিয়ে পড়ে কয়েকটা টিন ফুড নিতেই একটা সৈন্য এগিয়ে এসে রাইফেলের বাঁট দিয়ে আমার মাথায় মারে। হাড়গুলো মোটা হওয়াতেই বোধহয় বেঁচে যাই। কয়েকটা মুহূর্ত যা একটু ঝিম ধরে। অনেক মেয়ে তো এই একটা আঘাতেই যে শুয়ে পড়ে, এ-জীবনে আর ওঠে না।

একদিন বিকেলের শেষাশেষি দূরে ট্রাউটেনাউ ক্যাম্প দেখতে পেলাম। যাক্‌, হলেও বা ক্যাম্প। মাথার ওপরে একটা ছাদ তো থাকবে। দু'দিন ক্যাম্পে

থাকার পরে আবার ডাক পড়লো। আমাদের প্রতি পাঁচজনের জন্য ছোট একটা মাংসের টিন, আর ছু'দিনের রেশনের পরিমাণ রুটি দিতে ভেতরের চাপা সন্দেহটা আমার মাথা চাড়া দিয়ে উঠলো। হঠাৎ এদের এতো মনুষ্যত্ববোধ কেন? তার মানে—। যাই হোক্, মনে পড়ে গেল, অতিকষ্টে কয়েকটা সোনার জিনিষ লুকিয়ে নিয়ে এসেছিলাম। এবার কাজে লেগে গেল। সবগুলোর বিনিময়ে ছুটো পুরো পাউরুটি ম্যানেজ করলাম। কতোদিন পুরো পাউরুটি খাওয়া তো দূরে থাক্, হাতও দিইনি। মনে মনে নিজেকে ধিক্কার দিলাম, আরো বেশী সোনা আনলে পারতাম। রাগে নিজের হাত কামড়াতে লাগলাম। এ যাত্রার কবে এবং কিভাবে পরিসমাপ্তি একমাত্র ঈশ্বর জানেন।

আমাদের তাড়িয়ে একটা খোলা মাঠে নিয়ে এলো। মাঠের ধারের সাইডিংয়ে একটা ট্রেন দাঁড়িয়ে। কয়লা বইবার খোলা কম্পার্টমেণ্ট। গাদাগাদি করে এমনভাবে ভর্তি করা হলো যে বড়ো জোর দাঁড়াবার মতো জায়গা জুটলো। তা'ও অতি কষ্টে। বসতে হলে কারোর কোলে বসতে হয়। কোণে একটা গার্ড রাইফেল হাতে। সবার ওপর নজর রাখার জন্য। যা'তে আমরা কেউ খোলা কম্পার্টমেণ্ট থেকে লাফ দিয়ে ছুটে না পালাতে পারি। গার্ডটা আগেভাগে উঠে কোণে নিজের জন্য অনেকখানি জায়গায় খড়িব দাগ দিয়ে নিয়েছে। যাতে ওর আরামের না বাগড়া হয়।

বেশ কয়েক ঘণ্টা অনড় হয়ে ট্রেনটা একজায়গাতেই দাঁড়িয়ে। নড়াচড়ার কোনো লক্ষণ নেই। একটু পরেই আবহাওয়ার রঙ বদলে গেল। শুরু হলো তেড়ে ফুঁড়ে বৃষ্টি। সঙ্গে তুষারপাত। ভিজে আমাদের অবস্থা জ্যাব্‌জ্যাবে। তবু হাতের মগটায় আমি আর মা বৃষ্টির জল ধরে খেলাম। অনেকক্ষণ তরল কোনো পদার্থ না পাওয়ায় তেষ্টায় বুকের ছাতি ফাটার উপক্রম। গলা শুকিয়ে কাঠ।

কিছুক্ষণ পরে ট্রেনটা গতর ঝাড়া দিল। তবে বলা মুশকিল ঠিক কোন দিকে চলেছে। ছু'ধারে খোলা উঁচু-নীচু প্রান্তর, আর ছোট ছোট গ্রাম। হঠাৎ একজায়গায় ট্রেনটা থেমে যায়। প্রায় তিন-চার ঘণ্টা থামবার পর আবার পিছু হটতে শুরু করে। বেশ বড়ো একটা নদী পার হয়। এবারে বুঝতে পারি আমরা এল্‌বে নদী ধরে উত্তর-পশ্চিমে চলেছি। গার্ডটা যদিও বাচাল তবু সেও তো জানে না আমাদের গন্তব্যস্থল। আর বেশীর ভাগ সময়ই গার্ডটা আপাদ-মস্তক কম্বল মুড়ি দিয়ে ঘুমোচ্ছে।

ধীরে ধীরে একসময় রাত নামে। ট্রেনটা একজায়গাতেই দাঁড়িয়ে। প্রচণ্ড ঠাণ্ডা। হাড়গুলো পর্যন্ত ঠক্-ঠক্ করে কাঁপছে। আমরা আগের মতোই

পরস্পরকে জড়িয়ে ধরে আপ্রাণ চেষ্টা করি নিজেদের গরম রাখতে। নইলে যে ঠাণ্ডায় জমে যাবো।

প্রথম রাতেই প্লেন আক্রমণ শুরু হলো। আমাদের ট্রেনটাকে সম্ভবত মিলিটারী ট্রেন ভেবেছে। গার্ডগুলো একলাফে নীচের আশেপাশের গর্তে লুকিয়ে রাইফেল উঁচিয়ে ধরে। যদি কেউ ট্রেন থেকে লাফিয়ে নেমে পালাতে চেষ্টা করে, তবে সঙ্গে সঙ্গে বুলেট এসে শরীরটাকে এফোঁড়-ওফোঁড় করে দেবে। আমরা অবশ্য ভয়ডরের ঊর্ধ্বে। রাতের অন্ধকারকে মুহুর্মুহু চমকে দিয়ে ঘন ঘন বোমা পড়ছে। মনে হয় কে যেন মুঠো মুঠো আতসবাজী আকাশের বুকে ছুঁড়ে দিচ্ছে। সকালবেলা দেখি সারারাত বোমাবর্ষণের ফলে ট্রেনের ট্র্যাকের বেশ কিছুটা অংশ উড়ে গেছে।

আউস্‌ভিৎজ্‌ দলের কয়েকজনের কাছে যে ক'টা রুটি ছিলো, তাই টুকরো টুকরো করে ভাগাভাগি করি। ট্রেনটা থামলে গার্ডদের নজর এড়িয়ে ট্রেন থেকে নেমে বরফ কুড়িয়ে এনে তেষ্টা মেটাই। সারা শরীর কম্পার্টমেণ্টের ভেতরকার কয়লার গুঁড়োয় কালো ভূত। এতো দুঃখেও এটুকু সান্ত্বনা যে গার্ডদের দুরবস্থাও আমাদেরই মতো। রেল লাইনের দু'পাশে যা কিছু নজরে পড়ে, মিত্রশক্তির বোমাবর্ষণে তা ধ্বংসাবশেষে পরিণত হয়েছে। ছোট ছোট কয়েকটা শহর পেরোই। ওগুলোকে শহর বলে চেনাই দায়। মাটিতে মিশিয়ে দিয়ে কে যেন শহরগুলোকে লেপে দিয়েছে। এতো দুঃখের ভেতরে শত্রুদের এই অবস্থা দেখে আনন্দ পাই। বাঁচার ইচ্ছেটা তীব্র হয়ে ওঠে।

তৃতীয়দিনে জায়গাটাকে চিনতে পারি। চব্বিশ ঘণ্টা আগেও এই জায়গা দিয়ে গেছি। তার মানে ট্রেনটা এগিয়ে চলার পরিবর্তে ঘুরে ফিরে এক-জায়গাতেই চক্র কাটছে। সঙ্গের রুটির একটা কণাও আর কারোর কাছে অবশিষ্ট নেই। ক্ষিদেয় পেটের নাড়ি সুদ্ধ হজম হওয়ার জোগাড়। হঠাৎ লাইনের পাশের মাঠে পচা গলা কতোগুলো বাঁধাকপি জড়ো করা দেখে সবাই মিলে ঝাঁপিয়ে পড়ি ওগুলোর ওপর। আসলে মাঠের ফসল তুলে নিয়ে চাষীরা বাতিল বাঁধাকপিগুলোকে মাঠের ধারে ফেলে রেখে গেছে। কিন্তু ক্ষিদের মুখে এগুলোই আমাদের কাছে অমৃত। খাদ্য-অখাদ্য, মানুষ বা পশুর এসব বাছবার মতো অবস্থা কোথায়! তবে এগুলো খাওয়ার পরেই সবার বমি আর পেট খারাপ। খোলা কম্পার্টমেণ্টের ধারে বসে কাজ সারলেও চলাকালীন তো তা' সম্ভব নয়। তাই কয়েক ঘণ্টার ভেতরেই কম্পার্টমেণ্টের মেঝেটা মলমূত্র আর বমিতে নরকবিশেষ হয়ে ওঠে।

পাঁচদিন পাঁচরাত ক্রমাগত একনাগাড়ে চলার পর ছ'দিনের দিন প্রায় সন্ধ্যের মুখোমুখি ট্রেন থামলো। অবশ্য হঠাৎ থামাটা কিছু বিচিত্র নয়। তবু উঁকি মেরে দেখি একটা স্টেশনে এসে ট্রেনটা দাঁড়িয়েছে। পোর্টা ওয়েষ্টফালিয়া। তার মানে এই পাঁচদিন পাঁচরাতে আমরা বহু কিলোমিটার পাড়ি দিয়েছি। দক্ষিণ-পূর্ব জার্মানী থেকে যাত্রা শুরু করে সোজা উত্তর পশ্চিম বিন্দুতে এসে পৌঁছেছি। এখান থেকে হাত বাড়ালেই হল্যাণ্ড সীমান্ত।

ট্রেনটা থামতেই সেই কর্কশ গলায় নাৎসী গার্ডদের পরিচিত চিৎকার,— শূকরীর দল, জলদি খালি কর।

অনেকেরই এখন উঠে দাঁড়াবার ক্ষমতা নেই। পা ফুলে গেছে। তবু কোনোরকমে নামতে হয়। নইলে এখনই আবার মুখ চোখের ওপর সপাং সপাং করে চাবুক পড়বে। আমরা যাত্রা শুরু করেছিলাম প্রায় হাজারের ওপর। ট্রেন থেকে নেমে দেখি বড়ো জোর শ দু'য়েক জীবিত। বাকীরা প্রচণ্ড ঠাণ্ডা, অনাহার আর রোগে রাস্তাতেই মাটি নিয়েছে, এই দু'শো জনের মধ্যেও বেশীর ভাগেরই শক্তি নিঃশেষিত। আউস্‌ভিৎজের দল গুণতে শুরু করলাম। যাত্রা করার সময়ে একশো জন ছিলাম। পুরো একশো জনই জীবিত আছি। শুধু একটা মেয়ের পায়ে বরফ-ক্ষত হয়েছে। আসলে আউস্‌ভিৎজ্‌ ক্যাম্পে যে নিদারুণ কষ্ট আমাদের সহ্য করতে হয়েছে, তার জন্য পৃথিবীর কোনো কষ্টই আর আমাদের শরীরের ওপরে কোনো থাবা বসাতে পারেনি।

সামনে পাথুরে উঁচু একটা খাড়া পাহাড় দাঁড়িয়ে আছে। আমি যে এতো পাহাড়ে চড়তে ভালোবাসতাম তাও নিতান্ত অনিচ্ছুক পায়ে পাহাড়টার গায়ের জঙ্গল ভাঙতে লাগলাম। প্রায় ঘণ্টাখানেক চড়াই ভাঙার পর ক্যাম্প। আঃ, কী আরাম! একটা বাংকে কয়েকজনের সঙ্গে ভাগাভাগি করে শুতে হলেও খোলা মাঠের থেকে অনেক বেশী আরামপ্রদ। এতোদিন প্রায় অনাহারে থাকার পর ক্যাম্পে পাত্‌লা জলের মতো স্যুপ আর আলুর খোসাই অমৃতের মতো লাগে। উপরন্তু প্রচুর জল; পাঁচদিন তেষ্টায় বুক ফাটার পর সাদা জলের যে অপূর্ব স্বাদ লাগে, ভুক্তভোগী ছাড়া আর কাউকে তা বোঝানো সম্ভব নয়।

ক্যাম্প পরিচালনার ভার ডাচ্‌ মেয়ে বন্দীদের হাতে। মনে হয়, নাৎসীরা এদের সঙ্গে খুব একটা দুর্ব্যবহার করেনি; যার জন্য প্রতিদানে এরা বন্দীদের সঙ্গে সহৃদয় ব্যবহারই করে থাকে! অন্তত নির্দয় বলা যায় না। আমরা ক্যাম্পে ঢুকেই প্রথমে 'চিমনীর' খোঁজ করলাম। কারণ দূর থেকে সেইরকম

একটা বস্তু দেখতে পেয়েছিলাম। কিন্তু স্থানীয় বাসিন্দারা জানালো যে চিমনী তো দূরের কথা তার নাম পর্যন্ত এরা শোনেনি। ওগুলো চিমনী নয় শহীদ মিনার। যাই হোক্, এসব শুনে স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেললাম। আসলে আমাদের চলাফেরায় ওরা আমাদের অপ্রকৃতিস্থ অথবা পাগল বলে ধরে নিয়েছে।

সন্ধ্যেবেলার গুণতির পর নাৎসী কর্তৃপক্ষ এলো। আমাদের ভাগে ভাগে দাঁড় করিয়ে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখলো। এই ক'দিনের পথশ্রমে যাদের শরীরের অবস্থা একেবারে কাহিল, তাদের জন্য ক্যাম্পের ভেতরে কাজ। কয়েকজনকে রান্নাঘরে সাহায্যের জন্যও পাঠানো হলো। অবশ্য এটাই সবচেয়ে ভালো কাজ। কারণ খাওয়া দাওয়া এবং খাদ্যের বিনিময়ে জিনিষ সংগ্রহ করার প্রচুর সুযোগ। আমার মা সেই ভাগ্যবতীদের একজন। যাই হোক্ বাকীদের ক্যাম্পের বাইরে কাজ করতে যেতে হবে। ভেবে পেলাম না, আমাদের দিয়ে ঠিক কী ধরনের কাজ করাবে? গাছ কাটা নাকি পাথর ভাঙা? হতে পারে দুটোই। অঞ্চলটা রুক্ষ পাহাড় অঞ্চলে ভর্তি। দূরে ছাড়া ছাড়া কয়েকটা বাড়ীঘর। তবু এদের কিছু একটা মতলব নিশ্চয়ই আছে। বিনা মতলবে আর যাই হোক্ নাৎসীরা কোনো কাজ করে না।

পরের দিন সকালে গুণতির পরে আমাদের রুটি দেওয়া হলো। অর্থাৎ এবারে বাইরে কাজ করতে নিয়ে যাবে। বাঁকাচোরা পথটা জঙ্গলের মধ্যে দিয়ে পাহাড়ের ওপরে উঠে গেছে। আমাকে আমার খড়ম দেওয়া হলো। কয়েক পা এগিয়ে ওটা পায়ে দিয়ে হাঁটা অসম্ভব দেখে ফেলে দিয়ে খালি পায়েই হাঁটতে শুরু করলাম। অসম্ভব খারাপ রাস্তা, আমার পা দুটো নিশ্চয়ই এতোদিনে অনেক শক্ত হয়ে গেছে। তবু ধারালো পাথর আর জঙ্গলের কাঁটার খোঁচায় এর মধ্যেই পা দুটো ক্ষত-বিক্ষত। প্রায় ঘণ্টা দুয়েক পরে চড়াই শেষ করে উৎরাই ভাঙতে লাগলাম। কী ধরনের কাজ আমাদের দিয়ে করাবে তখন পর্যন্ত বুঝতে না পেরে বুকের কোণে রীতিমত ভয় জমেছে। হঠাৎ দেখলাম, সামনে একটা ভালো রাস্তা। আর রাস্তাটা গিয়ে ঢুকেছে, বিরাট পাহাড় কেটে একটা প্রবেশ পথ বানানো হয়েছে, তার ভেতরে।

এতো শব্দ যে কান পাতা দায়। বিরাট একটা বারুদের কারখানা খুঁজে বের করা অসম্ভব ব্যাপার। মিত্রপক্ষ হয়তো বা কোনোদিন এই বারুদের কারখানাটা খুঁজেই পাবে না। মেশিনগুলো পুরো দমে ব্লাস্টিং করে চলেছে। অনেক ক'টা তলা। খুব তাড়াতাড়ি করে বলে এখনো সম্পূর্ণ হয়নি। আর হঠাৎ দেখলে পুরো ব্যাপারটাকেই ময়দানবের সৃষ্টি মনে হয়।

কারখানাটা দেখেই মনটা বিষণ্ন হয়ে ওঠে। তার মানে মিত্রশক্তি আর আমাদের জন্য যে বারুদ ধ্বংস করবে নাৎসীরা, সেটা আবার আমাদের নিজেদের হাতেই তৈরী করতে হবে! এর চেয়ে যতো শক্ত-ই হোক্ যে কোনো কাজ শ্রেয়।

লিফ্‌টটা আমাদের কয়েকটা তলা পেরিয়ে মাটির অনেকখানি নীচে নামিয়ে নিয়ে এলো। ভেন্টিলেশানের ব্যবস্থা নেই বললেই চলে। একটু পরেই ঝিমুনি আসতে লাগলো। আমার একটা টেবিলের পাশে বসে কাজ। এমন কিছু শক্ত নয়, শিখতে পাঁচ মিনিটে বেশী লাগলো না। কিন্তু কাজটা যে প্রচণ্ড রকমের দরকারী, কিছুক্ষণের মধ্যেই বুঝতে পারলাম।

জার্মানদের চেয়ে আমাদের কাজের সময় অনেক বেশী। ওদের ছ'ঘণ্টা বড়ো জোর আট ঘণ্টা পরেই ছুটি। কিন্তু আমাদের বেলাতে একনাগাড়ে চৌদ্দ ঘণ্টা। দীর্ঘ এতো সময় পরে বাইরে বেরিয়ে এসে বুক ভরে নিঃশ্বাস নিই। আঃ, খোলা বাতাস কতো মধুর হতে পারে, এর আগে কি তা' বুঝেছি! ক্যাম্পে ফেরার সময় শরীরে অসীম ক্লান্তি থাকলেও মুক্ত বাতাস আর উৎরাইয়ের পথ বলে এতোটা কষ্ট হয় না।

রোজ রাত্রে ক্যাম্পে ফিরে আসার পর মা রান্নাঘর থেকে ম্যানেজ করা গরম স্যুপ আর গরম জল নিয়ে আসতেন। এ জীবনে এর চেয়ে বড় আশীর্বাদ আর কি আছে! যদিও সেই ক্ষিদের মুখে অতোটুকু স্যুপ কিছুই নয়, তবু অন্যের কপালে তো তা'ও জোটে না। শরীরের চামড়ার খাঁজে খাঁজে উকুন-গুলো বাসা বেঁধেছে; গরম জলেও যাওয়ার নাম নেই। তবু যতোটা পারা যায় চুলকানির হাত থেকে গরম জল দিয়ে রক্ষা করা। এ্যামুনেশন কারখানায় যাতায়াতের পথ জঙ্গলের মধ্যে দিয়ে। সেই যাতায়াতের সময় যতোটুকু খাওয়া দাওয়া জোগাড় করা যায়। আমাদের কাছে তখন খাদ্য-অখাদ্য বিচারবোধ লুপ্ত।

অনবরত এয়ার-রেইড্ চলেছে। প্রত্যেকটি বোমা বর্ষণের সঙ্গে সঙ্গে বিরাট বড়ো পাহাড়টা থর থর করে কেঁপে ওঠে। যদিও জানি না, মিত্রশক্তি কতোদূরে এবং কোথায়? তবু প্রতিটি বোমার শব্দের সঙ্গে সঙ্গে মনের আশা জাগে। ইতিমধ্যে ঘুরে ফিরে আবার বসন্ত এসে গেছে। এতোদিন ধরে দাঁড়িয়ে থাকা পাতাঝরা শীর্ণ গাছগুলোয় সবুজের ইসারা। যেন সবুজ রঙের বন্যা। নাম-না-জানা ফুলের দল ঝোপের আড়াল থেকে হঠাৎ হঠাৎ উঁকি দেয়।

একদিন ডাচ্ বন্দীদের মধ্যে ভীষণ উত্তেজনা। কী ব্যাপার, জিজ্ঞাসা করতেই ডাচ্ বন্দীরা হৈ-চৈ করে উঠলো,—শুনছো না মেসিনগানের শব্দ? অর্থাৎ মিত্রশক্তি খুব নিকটে এসে গেছে। আমাদের মুক্তিও তা'হলে খুব দূরে নয়।

সত্যি বলতে কি, প্রতিটি মুহূর্তে শব্দটা এগিয়ে আসছে, স্পষ্ট থেকে স্পষ্টতর হচ্ছে।

তবু আমাদের মধ্যে ওদের মতো উত্তেজনা নেই। আসলে পেছনে ফেলে আসা দিনগুলো আমাদের কিছুতেই আশাবাদী হতে দেয় না। নাৎসী কুকুরগুলোকে আমরা অতি নিকট থেকে চিনেছি। মুক্তি আমাদের কিছুতেই দেবে না। যদি না হঠাৎ বাধ্য হয়। পর পর দু'দিন এ্যামুনেশন কারখানায় যাওয়া বন্ধ রইলো। আর তার পরের সকালেই ক্যাম্প-কমাণ্ডার আদেশ দিলো,—পুরো ক্যাম্প ইভাকুয়েশান।

এখন আমাদের কোথায় নিয়ে যাবে? নিশ্চয়ই পশ্চিমে নয়; কারণ ওপথে মিত্রশক্তি। তবে? ছোট্ট স্টেশনটায় ট্রেন দাঁড়িয়ে। ইঞ্জিন পূর্বমুখী। তার মানে যেদিক থেকে আমরা এসেছি, আবার সেইদিকেই। সব চেয়ে বড়ো কথা গত যাত্রার অভিজ্ঞতা এখনো স্মৃতিপটে জ্বল জ্বল করছে। সুতরাং সবার মনেই সন্দেহের কালো ছায়া। এবারে গতবারের মতো রেশনও দেওয়া হলো না। আবার সেই অনির্দিষ্টের উদ্দেশ্যে যাত্রা।

ঘণ্টা কয়েক পর ট্রেনটা ছোট্ট একটা স্টেশনে এসে থামে। ফেলার-স্লেবেন। তার মানে আমাদের ট্রেনটা এতোক্ষণ নর্থ-ইষ্ট ধরে ঊর্ধ্বশ্বাসে ছুটেছে। এই ফেলার-স্লেবেনই ডি. কে. ডব্লু মোটর গাড়ীর সেই বিখ্যাত কারখানা ছিলো; এখন অবশ্য তা' গুঁড়িয়ে মাটিতে মিশে গেছে।

আমাদের অজ্ঞাতেই পুরো ট্রেনটা থেকে কয়েকটা কম্পার্টমেণ্ট কেটে অন্যদিকে নিয়ে যাওয়া হয়েছে। ট্রেন থেকে নেমে আউস্‌ভিৎজের গ্রুপ খুঁজতে গিয়ে দেখি, মাত্র কুড়িজন। তার মানে অন্যান্যদের আলাদা কম্পার্টমেণ্টে অন্য কোথাও নিয়ে গেছে। অর্থাৎ, এই প্রথম আমরা বিচ্ছিন্ন হলাম।

আমাদের একটা কারখানায় নিয়ে যাওয়া হলো। বোমাবর্ষণে প্রায় পুরো বাড়ীটাই উড়ে গেছে। শুধু নীচের তলার কিছুটা অংশ বাদে। সেইখানের কয়েকটা ঘরে প্রায় সব জাতের লোকের ভীড়। আমাদের নীচের বেস্‌মেণ্টে নিয়ে যাওয়া হলো; সঙ্গের গার্ডটা বুঝিয়ে দিলো যে এয়ার-রেইড্ হবে, সুতরাং যতো শীঘ্র সম্ভব নিরাপদ আশ্রয়ে যাওয়া দরকার। সরু একটা পথ সোজা

বাংকারে চলে গেছে। মাঝে মাঝে কয়েকটা লোহার দরজা। দেখলে হঠাৎ মনে হয় দরজাগুলো বন্ধ করে দিলে, পুরো বাংকারটাই বায়ুশূন্য হয়ে যাবে। কয়েকটা মেয়ে অবশ্য ইতিমধ্যেই বাংকারে ঢুকে গেছে। আমরা আউস্‌ভিৎজ্‌ গ্রুপ, সুতরাং সব জায়গাকেই সন্দেহের চোখে দেখি।

হঠাৎ দলের একটা মেয়ে চিৎকার করে ওঠে,—গ্যাস। ব্যস্‌ আমরা সবাই ঠেলাঠেলি ছোটাছুটি করে বাইরে বেরিয়ে আসি। একটা চরম বিশৃঙ্খলা, হৈ-চৈ, রীতিমতো প্যানিকের সৃষ্টি হয়। কেউ-ই আর ব্যাপারটার আগে পিছে দেখে না। দেখবার মতো মনের অবস্থাই বা কোথায়! জীবন্ত তো দূরের কথা, মৃত অবস্থাতেও আমাদের ওখানে ঢোকানো অসম্ভব।

রেনিয়া দৌড়ে গিয়ে মোটা নাৎসী গার্ডটার বেল্ট ধরে সজোরে ঝাঁকুনি দিয়ে চিৎকার করে ওঠে,—হোঁদল শূয়োর কোথাকার, গ্যাস দিয়ে আমাদের জীবন্ত মারার পরিকল্পনা করেছিস। ইচ্ছে করলে এখানেই গুলি করে মার, কিন্তু কিছুতেই ওখানে আমরা যাবো না।

নাৎসী মোটা গার্ডটা অবাকবিস্ময়ে কিছুক্ষণ আমাদের দিকে তাকিয়ে থাকে। গোলমালটা ঠিক কোথায় এবং কেন, তা যেন লোকটা তখনো ঠিক বুঝে উঠতে পারে নি। আমাদের সবাইকে ডেকে নিয়ে একটা ঘরে আসে। মেঝেতে বসে পড়ে। ততোক্ষণে আরো কয়েকটা নাৎসী গার্ড এসে জুটেছে। আমাদের কি করবে এখন? গুলি করে মারবে না তো? কিন্তু না, আসলে ওরা গ্যাসের নাম শুনেই অবাক হয়ে গেছে। বারবার শপথ করছে। তবু ওদের বিশ্বাস নেই। হয়তো এটাও ওদের ভাণ বা ষড়যন্ত্র। এ জীবনে জার্মানদের কোনো ব্যাপারে বিশ্বাস করিনে।

সব শুনে টুনে জার্মান গার্ডটা বলে, ঠিক আছে, বাংকারের ভেতরে তা হলে যেও না; কিন্তু বাইরে কিছু হলে আমার কোনো দায়-দায়িত্ব নেই। যদি বোমা-টোমা পড়ে তবে কিন্তু আমায় দোষারোপ কোরো না।

—নিশ্চয়ই না। সমস্বরে সবাই স্বীকার করি।

দিনের মধ্যে বেশ কয়েকবার আমাদের সঙ্গীরা দৌড়ে বাংকারের ভেতরে গিয়ে ঢোকে। কিন্তু আমরা ঢুকি না। বাংকে শুয়ে গান গাইতে গাইতে দেখি মিত্রশক্তি অকৃপণ হাতে বোমা বর্ষণ করে চলেছে। দলছুট কয়েকটা এসে আমাদের কারখানা বাড়ীটার এপাশে-ওপাশেও লাগে। আমি অবশ্য এতোদিনে পুরোপুরি নিজেকে ভাগ্যের হাতে ছেড়ে দিয়েছি। কপালে যা লেখা আছে তা' ঘটবেই। ভাগ্যের মুখ তো আর চেষ্টা করেও ঘোরানো যায় না। বাড়ীটা

বোমার আঘাতে প্রায় বিধ্বস্ত। জানালা-দরজা অনেক আগেই ভেঙে টুকরো টুকরো হয়ে ঝরে পড়ে গেছে। তবু আমাদের ভ্রুক্ষেপ নেই। এমন কি বাংকারে গিয়ে আত্মরক্ষা করার কথা একবারও মনে আসেনি।

কাজ বলতে কিছুই নেই। নাৎসী গার্ডগুলো হারানো মেষের মতো এধার-ওধার ঘুরে বেড়াচ্ছে। ছক্ কাটা জীবনটাকে কে যেন সজোরে ঝাঁকুনি দিয়ে এলোমেলো করে দিয়েছে। আর সেই কারণে আমাদের কপালে জুটেছে অবিশ্রান্ত বিশ্রাম। আমরা ঘুরে ঘুরে বিভিন্ন জায়গা থেকে আসা মেয়েদের সঙ্গে গল্প করি; পরস্পরের অভিজ্ঞতা বিনিময় হয়। গরম জলের ট্যাপ্ থাকায় দিনের বেশীর ভাগ সময়টাই জামা-কাপড় ধোওয়া পাক্লা আর স্নান করায় কেটে যায়। যদি কোনোরকমে উকুনগুলোর হাত থেকে রেহাই পাওয়া যায়। সবচেয়ে বড়ো বিলাসিতা ফ্ল্যাশ টয়লেট্ পর্যন্ত আছে। কতো বছর টয়লেট্ দেখিনি। শুধুমাত্র যা খাদ্যের অভাব। দিনের রুটির অংশ কমেছে, দুপুরের স্যুপ জলের মতো পাত্লা। কিন্তু এতোদিনে প্রায় অনাহারে বেঁচে থাকার অভ্যাসটা রপ্ত হয়ে গেছে।

নাৎসীদের রান্নাঘরের আশেপাশেই আমরা বেশীর ভাগ সময় ঘুর ঘুর করি। যদি বা কপালে ভালোমন্দ কিছু জুটে যায়। একদিন সন্ধ্যের সময় দেখি, আলু ভাজার জন্য আলু কেটে রেখেছে। আমরা দু'দলে নিজেদের ভাগ করে একদল গোলমাল শুরু করি, আরেকদল আর্তনাদ। নাৎসী মেয়েরা যারা রান্নাঘরে কাজ করছিলো, চিৎকার ও আর্তনাদ শুনে ছুটে বেরিয়ে আসতেই আমাদের কয়েকজন রান্নাঘরে ঢুকে বিরাট এক গামলা কাটা আলু নিয়ে সটুকে পড়ে। আলুগুলো খড়ের মাদুরের নীচে লুকিয়ে রেখে গামলাটা আবার রান্নাঘরে ছুঁড়ে দেয়। নাৎসী রাঁধুনীরা আমাদের চালাকি বুঝতে পারলেও তখন করার তো কিছু নেই। একমাত্র গজ গজ করা ছাড়া। আহা, সেই কাঁচা আলুর স্বাদই অমৃতের মতো।

আমাদের আবার যাত্রা শুরু হলো। কয়েকটা মেয়ে গিয়ে টয়লেটে লুকোলেও আমি দলের সঙ্গে যাওয়াই স্থির করলাম। একা বেঁচে থাকা অসম্ভব। দলের ভীড়ে মিশে থেকে তবু যদি বাঁচা যায়। আমাদের ট্রেনের কম্পার্টমেন্টে উঠিয়ে বাইরে থেকে দরজার নাট্ বোল্ট এঁটে দিলো। কম্পার্টমেন্টের ভেতরটা অন্ধকার। দিনরাত্তির বোঝার উপায় নেই। অনেকক্ষণ ট্রেনটা থেমে থাকার পর হঠাৎ ধাক্কা খেলাম। অর্থাৎ ট্রেন চলতে শুরু করেছে। গার্ডদের মুখে

শুনেছিলাম, এবার আমাদের গন্তব্যস্থল হলো বার্গেন-বেলসন্। তার মানে প্রথমে আমাদের যাত্রা শুরু হয়েছিলো পুবের দিকে ; তারপর পশ্চিম। আবার পুবে, এখন চলেছি পশ্চিমে। এ যাত্রাপথের শেষ কোথায় কে জানে!

ট্রেন থেকে নেমে দেখি, ক্যাম্প ভর্তি। অর্ধ উলঙ্গ, প্রায় মৃত কংকালসার মানুষগুলো সর্বত্র ঘুরে বেড়াচ্ছে। অনেক মেয়েই আউস্‌ভিৎজ্ থেকে এসেছে। এমন কি লাগার ফ্যুয়েরার। অনেক নাৎসী মেয়ে-গার্ডও আউস্‌ভিৎজ্ থেকে আসা। মানুষ মারায় আউস্‌ভিৎজে হাত পাকানো ক্র্যামেরার উপস্থিতি আমাদের পক্ষে সুখদায়ক নয়। যাই হোক্, কপাল ভালো বলতে হবে। এ ক্যাম্পে জায়গা নেই। উপচে পড়ার জোগাড়। সুতরাং নবাগতদের যেতে হবে অন্য ক্যাম্পে।

কয়েকদিন পরে আমাদের আবার নিয়ে যাওয়া হলো। একটা মাঠের মধ্যে ট্রেন দাঁড়িয়ে। সামনে কয়েকটা মালগাড়ীও রয়েছে। প্রথমে ভেবেছিলাম ওগুলো খালি। কিন্তু সামনে যেতেই শুনি অস্পষ্ট গলায় মেয়ে আর পুরুষের মরণ আর্তনাদ। বাইরে থেকে পেরেক ঠুকে ওদের রাস্তার মধ্যে ফেলে রেখে গেছে। দমবন্ধ হয়ে অনাহারে মরার জন্য। তবে কি আমাদের ভাগ্যেও এইরকম হবে? শিরশিরে ঠাণ্ডা বরফ শীতল ভয়ের একটা স্রোত মেরুদণ্ড বেয়ে ছুটে চলে।

কিন্তু করার তো কিছুই নেই। চারপাশে সশস্ত্র গার্ড আর হিংস্র পাহারাদার কুকুর। সবাই কম্পার্টমেণ্টে উঠলে পরে দরজাটা ভালো করে বন্ধ করে একেবারে পেরেক ঠুকে দেয়। দরজায় কান লাগিয়ে শুনি, গার্ডদের পদধ্বনি ধীরে ধীরে দূরে মিলিয়ে যাচ্ছে। অর্থাৎ আমাদের ঠিক এই অবস্থাতেই মৃত্যুর মুখোমুখি হতে হবে।

কম্পার্টমেণ্টের বাতাস এতোগুলো লোকের শ্বাস-প্রশ্বাসে ভারী হয়ে ওঠে। প্রথমে সবাই মিলে চিৎকার করি; দরজায় দমাদম লাথি মারি। কিন্তু কে খুলবে? কার-ই বা সাহস আছে দরজার ধারে পাশে আসার? একসময় কম্পার্টমেণ্টের ভেতরটা গরম হয়ে ওঠে। দম বন্ধ হয়ে আসতে চায়। বুকটা যন্ত্রণায় ফেটে আসছে। সবাই প্রাণপণে আঁতিপাতি করে খোঁজে যদি বা ছোট্ট একটা গর্ত পাওয়া যায়। প্রায় অর্ধেকের ওপর অজ্ঞান হয়ে কম্পার্টমেণ্টের মেঝেতে লুটিয়ে পড়ে। হঠাৎ মনে পড়ে যায়। ছোট্ট একটা ছুরি সব সময় আমার কোমরে লুকিয়ে রাখতাম। কয়েক ঘণ্টা ধরে আপ্রাণ চেষ্টার পর ছুরিটা দিয়ে মেঝের একটা ছোট্ট গর্তকে একটু বড়ো করে পালা করে মা আর আমি নাকটাকে সেই গর্তে ঠেসে ধরলাম। তখনো সমানে গোঙানি শুনতে পাচ্ছি।

আমার মাথার ভেতরটাও কেমন যেন অসাড় হয়ে আসছে। নিজের ওপরেই রাগ হতে লাগলো। কেন ক্যাম্প ঘেরা ইলেকট্রিকের তারে হাত দিয়ে চিরদিনের জন্য এ যন্ত্রণার হাত থেকে মুক্তি নিলাম না ? এ বীভৎস অত্যাচারের হাত থেকে তো রেহাই পেতাম তাহলে। ধীরে ধীরে মৃত্যুর দিকে এগিয়ে চলেছি। ঘামে সারা শরীরটা ভিজে গেছে। প্রতিটি মিনিট যেন ঘণ্টার থেকেও বিলম্বিত। রাতটা এইভাবেই কাটে। অন্য ট্রেন থেকে মাঝে মাঝে যে আর্তনাদ ভেসে আসছিলো, এক সময় তা' বন্ধ হয়ে আসে।

হঠাৎ পায়ের শব্দ। সবাই এসে দরজাটার কাছে প্রাণপণে চিৎকার করি। দরজাতেও সমানে লাথি চালাই। তাড়াতাড়ি খোলার জন্য অনুরোধ করি। কিন্তু তবু খুলতে খুলতে প্রায় পুরো ঘণ্টা পার হয়ে যায়। আসলে দরজাটা পেরেক দিয়ে এমনভাবে এঁটে দিয়েছে যে ইচ্ছা করলেও তড়িঘড়ি করার উপায় নেই।

বাতাস! বুক ভরে নিঃশ্বাস টানি। এর কাছে খিদে, তেষ্টা, কিছুই নয়। ঈশ্বরই জানেন, কেন শুধুমাত্র আমাদের কম্পার্টমেণ্টটা খুলে দিলো। অন্যান্য কম্পার্টমেণ্টগুলো বন্ধ। সাড়াশব্দও কিছু আসছে না। তার মানে সম্ভবত কম্পার্টমেণ্টেব ভেতরে সবাই মরে পড়ে আছে।

আমরা আনন্দে চিৎকার করে কেঁদে উঠি। আবার আউস্‌ভিৎজ্‌ গ্রুপ মৃত্যুর মুখ থেকে ফিরে আসে। এ মুহূর্তে নিজেকে ধিক্কার দিতে ইচ্ছে যায়। কেন কয়েকঘণ্টা আগে জীবনের আশা ছেড়ে দিয়েছিলাম ? আত্মহত্যা করতে চেয়েছিলাম ?

একবার কোনোরকমে বেরোবার পর আর কম্পার্টমেণ্টে ঢুকি না। গার্ড দু'জনকে স্পষ্ট বলি, হয় আমাদের কোনো ক্যাম্পে নিয়ে যাওয়া হোক্, না হয় ছেড়ে দিক। কিন্তু গত রাত্রেব সেই ভয়াবহ অভিজ্ঞতার পর কিছুতেই আর আমরা কম্পার্টমেণ্টের ভেতরে ঢুকবো না। শেষপর্যন্ত সামনের ক্যাম্পে জায়গা না পাওয়াতে স্থির হলো আমাদের সালজ্‌বাডেলে নিয়ে যাওয়া হবে।

পাঁচজনের দল করে আবার হাঁটা শুরু হলো। সালজ্‌বাডেল কয়েক ঘণ্টার পথ। ছোট্ট শহর ; কতোদিন পরে রাস্তাঘাট দোকানপাট দেখলাম। শহরতলীতেই কিছুটা জায়গা তার দিয়ে ঘিরে অস্থায়ী ক্যাম্প করা হয়েছে। আমাদের ঠাঁই হলো সেই ক্যাম্পে। ক্যাম্পের মেয়েরা একটা সুগার মিলে কাজ করে। সুতরাং লুকিয়ে এনে বাংকে চিনিও যথেষ্ট মজুত করেছে। যে কোনো কারণেই হোক, আমাদের সেই সুগার মিলের কাজে নেওয়া হলো না। ভর

সপ্তাহ বসে থাকা আর খাওয়া বলতে জলের মতো পাতলা ক্যাম্পের স্যুপ।

সপ্তাহখানেক পরে গুজব শুনলাম, মিত্রশক্তি নাকি এ জায়গাটাকে চারদিক থেকে ঘিরে ফেলেছে। আলোর ইশারা যেন দেখতে পেলাম। নাৎসীরা আর কতো আমাদের তাড়িয়ে নিয়ে বেড়াবে?

রুটি বা স্যুপ, খাদ্য বলতে কিছুই আর ক্যাম্পে অবশিষ্ট নেই। শুধু গাছের শিকড় জড়ো করে রেখেছে নাৎসীরা। সেগুলোর জন্যই কুকুরের মতো কাড়াকাড়ি পড়ে যায়। একটু দূরে নাৎসীদের জন্য ষ্টোর রুম। মাঝখানে ইলেকট্রিক তারের বেড়া। সেই বেড়ার এপার থেকে জানালাটা খোলা থাকলে ষ্টোর রুমটা স্পষ্ট দেখা যায়। সোনালী রঙের পাউরুটি, রকমারী টিনফুড থরে থরে সাজানো। রান্নাঘর থেকে খাওয়ার সুগন্ধ ভেসে আসে। কিন্তু বেড়াটা পার হওয়ার উপায় নেই। স্পর্শ করলেই তৎক্ষণাৎ মৃত্যু।

ঠিক করলাম, যে করেই হোক বাংক থেকে চিনি চুরি করবো। ধুঁকে ধুঁকে কিছুতেই মরবো না। রাতের অন্ধকারে সার্চ লাইট্ আর সশস্ত্র গার্ডদের এড়িয়ে আমরা তিনজন পাশের কুটিরে বুকে হেঁটে ঢুকে পড়ি। বাংকের খড়ের মাদুরের নীচে বস্তা বস্তা চিনি। একটা মেয়ে একটু শব্দ করতেই বাংকের মেয়েগুলো জেগে উঠে মারামারি শুরু করে। সেই সুযোগে খাবলা মেরে যতোটা পারা যায় চিনি নিয়ে আমরা দ্রুত সটকে পড়ি।

সেদিন শুক্রবার। ১৩ই এপ্রিল। সকালবেলা। দেওয়ালে ঠেস দিয়ে সবাই মিলে গল্পগুজব করছি হঠাৎ একটা জোর গোলমাল কানে আসতেই মাটিতে শুয়ে পড়ি। কয়েক মুহূর্ত পরে গোটা কয়েক বুলেট্ আর গ্রেনেড কানের ইঞ্চিখানেক দূর দিয়ে ছুটে গেল।

এর আগে মিত্রশক্তি এতো কাছাকাছি আর আসেনি। চারদিকে ওদের বোমার স্প্লিন্টার ছড়িয়ে ছিটিয়ে পড়েছে। তবে কি সত্যি আমরা মুক্তি পাবো? কিন্তু এই পশুগুলোকে বিশ্বাস নেই। তবু মনে হয়, এবার আর আমাদের মুক্তি আটকাতে পারবে না। একজন গার্ডও নেই। ইতিমধ্যে কোথায় লুকিয়ে পড়েছে সব কে জানে! হঠাৎ একজন আমায় দূরে একটা সাদা ফ্ল্যাগ দেখায়। এতোক্ষণে সালজ্‌বাডেল শহরটা নাকি মিত্রশক্তি দখল করে নিয়েছে। হঠাৎ

চারিদিকে একটা মৃত্যুনিথর নীরবতা। ভয় হয়, জার্মানরা শেষ পর্যন্ত মিত্রশক্তিকে হটিয়ে দেয়নি তো ?

সন্ধ্যেবেলা বাইরে ঘোরাফেরা করে যখন খোঁজখবর নিচ্ছি তখন দেখি বাতাসে প্রচুর লিফলেট উড়ছে, চারিদিকে ভীষণ উত্তেজনা। লিফলেটগুলো ফ্রেঞ্চ বন্দীরা সামনের ক্যাম্প থেকে ছুঁড়ে দিয়েছে। আমাদের ক্যাম্পের চারপাশে মাইন পাতা। তার মানে শেষ মুহূর্তে নাৎসীরা পুরো ক্যাম্পটাকেই উড়িয়ে দেবার পরিকল্পনা ফেঁদেছে। সুতরাং বারবার তারা আমাদের ধৈর্য ধরতে বলেছে। রাত্রে ওরা তার কেটে দিলেই আমরা বেরোতে পারবো। সারাটা রাত উত্তেজনায় কাটে।

আমাদের তখন অনাহারে মুমূর্ষু অবস্থা। আগামী চব্বিশ ঘন্টার মধ্যে যদি সাহায্য এসে না পৌঁছোয়, তবে খিদের চোটে অর্ধেক মেয়ে মরে যাবে নিশ্চয়ই। গত চব্বিশ ঘণ্টার ওপর ক্যাম্পে খাদ্য বলতে কিছু নেই। এমন কি এক চাপড়া ঘাসও আর অবশিষ্ট নেই। শরীর এতো দুর্বল যে হাঁটাও অসম্ভব।

১৪ই এপ্রিল সন্ধ্যেবেলায় অবশেষে একটা নাৎসী গার্ডকে ক্যাম্পের ভেতরে দেখতে পেলাম নিরস্ত্র অবস্থায়। সঙ্গে সঙ্গে মেয়েদের ছোটোখাটো একটা জনতা ওর ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে। ঘুষি, চড়-চাপাটি চালায়। ইউনিফর্ম মুহূর্তে টুকরো টুকরো। আমি গার্ডটার কাছে গিয়ে দেখি, কোমরে একটা ছোরা গোঁজা। এক হেঁচকায় ছোরাটা কোমর থেকে খুলে নিতেই নাৎসী গার্ডটা চোঁ চোঁ ছুট লাগায়। সোজা মেইন্ গেটের দিকে।

আমি আবার ফিরে গিয়ে তারের সামনে দাঁড়াই। ওপারেই ষ্টোরটা। থরে থরে রুটি, টিনফুড সাজানো। তার পেরোনোর তো উপায় নেই। তাই এক-দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকি সাজানো খাদ্যদ্রব্যগুলোর দিকে। হঠাৎ একটা মেয়ে চিৎকার করে আমাকে জড়িয়ে ধরে বলে,—বোকা মেয়ে, দরজার দিকে তাকিয়ে দেখ, দেখছিস কিছু ?

মেয়েটার ডাকে সংবিত ফিরে তাকিয়ে দেখি, দূরে সদর রাস্তা ধরে একটা মিলিটারি কনভয় এগিয়ে আসছে।

—ওরকম কনভয় অনেক দেখেছি। বিতৃষ্ণায় ওদিক থেকে দৃষ্টিটা ফিরিয়ে নিয়ে আবার ষ্টোরের দিকে তাকাই।

—গাধা কোথাকার! ইউনিফর্ম দেখছিস না ? হেলমেটগুলোর দিকে তাকিয়ে দেখ। এরা জার্মান সৈন্য নয়। নিশ্চয়ই আমেরিকান। ইয়াংকিরা সত্যি তাহলে পৌঁছে গেছে! মেয়েটা আনন্দে চিৎকার করে ওঠে।

বেশ কিছুক্ষণ ধরে কনভয়টা আমাদের ক্যাম্পের পাশের রাস্তা দিয়ে এগিয়ে চললেও আমাদের নজরে পড়েনি। সবাই মিলে তীক্ষ্ণ কণ্ঠে চিৎকার করাতে ওদের নজরে পড়ে। কয়েকটা ট্যাংক একসঙ্গে এগিয়ে আসে। সদর দরজাটা ভেঙে পড়ে।

আমরা মুক্ত। স্বাধীন। তারচেয়েও বড়ো কথা এখনো আমরা বেঁচে আছি। জীবনযুদ্ধে সত্যি তা'হলে আমরা শেষপর্যন্ত জিতে গেছি!

প্রচণ্ড বেগে সবাই এগিয়ে আসে গেটের কাছে। হাতের কাছে যে আমেরিকান সৈন্যকে পায়, তাকেই চুমু খায়, জড়িয়ে ধরে, প্রচণ্ড আলিঙ্গনে। আমি তখন বিমূঢ়। পুরো ব্যাপারটা বিশ্বাস হতে চায় না। জীবনে অনেক কিছু কল্পনা করেছি, কিন্তু এও কি সম্ভব? আমরা মুক্ত? আমি সেই আগের মতো লোলুপ দৃষ্টিতে তারের ওপারে ষ্টোর রুমের দিকে তাকিয়ে থাকি। পা দুটো অসাড়। হঠাৎ হাত বাড়িয়ে তারটা স্পর্শ করি। কারেন্ট বন্ধ। ঝাঁপ দিয়ে এক লাফে তারটা পার হয়ে ষ্টোর রুমের জানালায় গিয়ে পৌঁছোই। খালি হাতেই এক ঘুষিতে সার্সি চুরমার করে দেহটাকে ভেতরে ছুঁড়ে দিই। কয়েক মিনিটের ব্যাপার। হুড়মুড় করে পেছনে পেছনে প্রায় শ'খানেক মেয়েও ভেতরে ঢুকে পড়েছে। আমার হাত তখন খাওয়ার জিনিষে বোঝাই। কিন্তু ততোক্ষণে ছেনাছেনি শুরু হয়ে গেছে। অতিকষ্টে একটা মাত্র রুটি নিয়ে মা'র কাছে ফিরে আসি। দু'জনে মিলে খেয়ে তাকিয়ে দেখি, ক্যাম্প প্রায় জনশূন্য। যাদের তখনো হাঁটার মতো ক্ষমতা আছে, তারা ক্যাম্প ছেড়ে বেরিয়ে শহর সালজ্-বাডেলে চলে গেছে।

শরীরের দিক থেকে খুব দুর্বল লাগছে। মনে হচ্ছে যে কোনো মুহূর্তে মাথা ঘুরে মাটিতে পড়ে যাবো। তবু নিঃশেষিত শরীরের সমস্ত শক্তি একজায়গায় জড়ো করে উঠে দাঁড়াই। যেমন করে হোক্ বদলা নিতেই হবে। গত কয়েক বছর ধরে যে মুহূর্তটার স্বপ্ন প্রতি পলে দেখে এসেছি, আজ সেই মুহূর্ত সমাগম। কিছুতেই মুহূর্তটাকে বৃথা যেতে দেবো না। হাঁটতে না পারি হামাগুড়ি দিয়ে হলেও, যেতে আমাকে হবেই। হঠাৎ মনে পড়ে যায়, ছিনিয়ে নেওয়া ছোরাটার কথা। এবার সত্যি তা'হলে এটার ব্যবহার হবে।

মাকে ক্যাম্পে রেখে আমরা পাঁচজনে বেরোই। সামনে যে জার্মানকে পাবো তাকেই খুন করবো। ক্যাম্পের গেটের বাইরেও শ'য়ে শ'য়ে পুরুষ এবং স্ত্রীলোক। বিদেশী বন্দী, এতোদিন দাস ক্যাম্পে খেটে খেটে আর অনাহারে কংকালসার। আনন্দে কেউ নাচছে, কেউ হাসছে। কিন্তু সব মানুষের স্রোত

শহরমুখী ; সালজ্‌বাডেল।

জীবনে এ মুহূর্তটার মতো সুখ-মুহূর্ত আর আসেনি। আসবেও না জানি। রাস্তার মাঝখান দিয়ে আমরা দলে দলে ছুটে চলি। যে আমেরিকান সৈন্যকে সামনে পাই, তাকেই তীব্র আলিঙ্গনে জড়িয়ে ধরি ; চুমু খাই। এরাই আমাদের নিশ্চিত মৃত্যুর হাত থেকে রক্ষা করেছে। শহরের আরম্ভেই সামনে একটা বাড়ী পড়ে। দরজা জানালা ভেতর থেকে বন্ধ।

—দরজা খোল্‌ নরকের কীটগুলো! আমাদের সমবেত চিৎকার। কিন্তু ও পক্ষের কোনো সাড়া নেই।

আমরা পাঁচজনে দমাদম দরজার ওপরে লাথি চালাই। কবজা ভেঙে দরজা খুলে যায়। ছোরাটাকে দৃঢ় হাতে ধরে প্রথমে আমি ঢুকি। বাড়ীটা মনে হয় জনশূন্য। হয়তো বা আগেই খবর পেয়ে সব পালিয়ে গেছে। তবু লুকোনোর মতো সব জায়গাগুলো তন্ন তন্ন করে খুঁজে দেখি। হঠাৎ নজরে পড়ে মাটির নীচেকার ভাঁড়ার ঘরের একটা অন্ধকার কোণে পুরো পরিবারটা লুকিয়ে, আমি ততোক্ষণে ছোরা হাতে তৈরী। পেছন থেকে চারজনে তখন সমস্বরে চিৎকার করে বলছে,—দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখছিস কি? সোজা ছোরাটা ঢুকিয়ে দে।

কয়েকটা স্থবির মুহূর্ত। অনড়। কিছুক্ষণ আগেও দৃঢ় প্রতিজ্ঞা করেছি, সামনে যে জার্মান'ক প্রথম পাবো, ছোরাটা তার বুকে আমূল বিদ্ধ করে দেবো। কিন্তু না। পারলাম না। ছোরাটা উল্টোদিকে ছুঁড়ে দিই। দরজায় বিঁধে মাটিতে পড়ে যায় ছোরাটা। আমি কান্নায় ভেঙে পড়ি,—না, এ কাজ আমার দ্বারা হবে না। কিছু'তেই নয়।

বৌটা দৌড়ে এসে আমার হাত ধরে বলে,—যা চাও নিয়ে যাও, কিন্তু আমাদের প্রাণে মেরো না। বাঁচতে দাও। কান্নায় ভেঙে পড়ে বৌটা প্রাণভিক্ষা চায়।

আমরা খুঁজে খুঁজে কুঠার আর দেশলাই বার করি। ফার্নিচারগুলোকে কুপিয়ে কেটে বাড়ীটাতে আগুন ধরিয়ে দিই। বহ্নি উৎসব।

পরের বাড়ীটাতে উপস্থিত হয়েও একই ঘটনার পুনরাবৃত্তি। শুধু নেওয়ার মধ্যে খাদ্যদ্রব্য। প্রচুর পরিমাণে চাল, চিনি, গম, ময়দা, শুকনো ফল ইত্যাদি জড়ো হয়ে গেছে তখন। ইতস্তত ঠেলাগাড়ি না পেয়ে শেষে একটা বাথ্‌-টব ভেঙে নিয়ে ওটার ওপর সব জিনিষপত্র চাপিয়ে রাস্তার ওপর দিয়ে দড়ি বেঁধে টেনে নিয়ে চলি। ওটা তখন জিনিষপত্রে টইটম্বুর।

সন্ধ্যের অন্ধকারে যখন আমরা ক্যাম্পে ফিরছি তখন দেখি অন্যান্য মেয়েরাও

পাশের পুরুষ-ক্যাম্পের পুরুষদের সাহায্যে জামাকাপড়, খাদ্যদ্রব্যের পাহাড় নিয়ে ফিরছে। বেশীর ভাগই হাঙ্গারিয়ান মেয়ে-বন্দী। কয়েক ঘণ্টার মধ্যে সকলের চেহারারও যেন পরিবর্তন হয়ে গেছে। আগেকার বিমর্ষ ভাবটা কেটে গিয়ে জৌলুস ফুটে উঠেছে। চেনাই দায়।

ঘরের মধ্যে এসে প্রায় সব মেয়েই মেঝের ওপরে ধপাস্ করে বসে পড়ে। এতোদিনের অনাহারী পেটে গোগ্রাসে গেলায় সবারই ডাইরিয়া হবার জোগাড়। পুরো রাতটা দুঃস্বপ্নেই কেটে যায়। যদি এটা সত্যি স্বপ্ন হয়? যদি সকালবেলা উঠে দেখি আমেরিকানগা চলে গেছে? তবে?

পরের দিন সকালে আবার শহরে চললাম। বুকের ভেতরের বদলার আগুনের তাতটা যেন কমে এসেছে সময়ের স্রোতে। এবার ধীরে সুস্থে বাড়ীঘরগুলো দেখতে লাগলাম। সভ্য জগত থেকে বেশ কয়েক বছর দূরে থাকায় সবকিছুই চোখে নতুন ঠেকে। কতোদিন চাদর পাতা নরম বিছানায় শুইনি। কাঁটা চামচে ধরে খেতেই ভুলে গেছি। ঘরের ভেতরকার চেয়ার-টেবিলগুলোও যেন আমার চোখে নতুন। চারিদিকে বিস্ময়ের দৃষ্টিতে তাকাই। এই বিলাসবহুল জগতের যেন আমি কোনোদিন বাসিন্দা ছিলাম না।

একটা বাড়ীতে বিছানায় শুতে চাদরের নীচে একটা শক্ত জিনিষ ঠেকে, বিছানার চাদরটা ছুঁড়ে দিতে সুদৃশ্য ফ্রেমে বাঁধানো বিরাট একটা হিটলারের ছবি বেরিয়ে পড়ে। ঠিক সেই মুহূর্তেই একটা মেয়ে ছুটে এসে কাঁদতে কাঁদতে বলে,—যা চাও এ বাড়ীর থেকে নিয়ে যাও। কিন্তু দোহাই তোমাদের ফ্যুয়েরার এই ছবিটা অন্তত আমায় ভিক্ষে দাও।

রাগে তখন আমার ফেটে পড়ার অবস্থা। কয়েকজন মিলে মেয়েটাকে চেপে ধরে। আর আমি তাকে পুরো উলঙ্গ করে সজোরে তার মাথায় ফটোটা মারি। কাঁচটা হাজার হাজার টুকরো হয়ে ভেঙে পড়ে। তারপর পুরো বাড়ীটাতেই আগুন ধরিয়ে দিই। প্রতিটি বাড়ী খুঁজে খুঁজে ভাঁড়ার ঘরে লুকিয়ে রাখা জিনিষপত্র টেনে বার করি। আমাদের যেন তখন ধ্বংসের নেশায় পেয়ে বসেছে।

একটা বাড়ীর ভাঁড়ারে ঢুকে দেখি থরে থরে সাজানো দুধ, মাখন, পনীর। কতো বছর এসব জিনিষ চোখেও দেখিনি। পেট ভরে যতোটা পারা যায় খেয়ে নিয়ে বাকীটা মেঝেতে ঢেলে ফেলে দিয়ে পাগলের মতো সেই দুধ আর মাখনের ওপর নাচতে শুরু করি।

সন্ধ্যেবেলায় ক্যাম্পে ফিরে এলে মা আমাদের কয়েকজনকে ডাকে। মাকে

ফিরে গোল হয়ে বসি। মাকে অনেক অনুরোধ করা সত্বেও শহরে যেতে রাজী করাতে পারিনি।

—তোরা এতোবার শহরে গেলি, দু'একটা জামা-কাপড় পেলি না? ক্যাম্পের জামা-কাপড়ে আর কেন থাকবি?

সত্যি বলতে কি, এই দিকটা একেবারে খেয়ালই হয়নি। একে তো ছেঁড়া খোঁড়া ক্যাম্পের ড্রেস। তাতে সারা শরীরে উকুন ভর্তি। আসলে আমরা বদলা নিতে ধ্বংসের কাজে এতো মেতে উঠেছিলাম, নিজেদের জামা-কাপড়ের দিকে নজর দেবার মতো ফুরসৎ-ই পাইনি।

সুতরাং তৃতীয় দিনে বেরোলাম জামা-কাপড়ের খোঁজে। কিন্তু রাস্তায় বেরিয়ে দেখি, আমেরিকান সৈন্য টহল দিচ্ছে। কোনো জার্মান বাড়ীতে ঢোকা নিষিদ্ধ করে হাজার হাজার পোস্টার দেওয়ালে সেঁটে দিয়েছে। অর্থাৎ জামা-কাপড়ের আশায় তা'হলে ছাই! আমাদের অর্ধ উলঙ্গ নোংরা জামা-কাপড়ে রাস্তার ধারে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে একটা আমেরিকান সৈন্য এগিয়ে এসে আমাদের সঙ্গে নিয়ে একটা জার্মান বাড়ীতে গিয়ে ঢোকে। কিন্তু ওবাড়ীর সবকিছু অনেক আগেই লুঠ হয়ে গেছে। শহরে অনেক ঘোরাঘুরি করে কোনোরকমে এক জোড়া পুরুষ জুতা জোগাড় করি। খালিপায়ের হাত থেকে তো বাঁচোয়া। বাড়ীতে যখন ঢোকা যাবে না তখন শহরের শেষে খোঁজাখুঁজি করে একটা পোল্‌টি বার করি। দু'হাতে যতোগুলো পারা যায় ডিম, মুরগীর বাচ্চা আর হাঁস নিয়ে ফিরে আসি ক্যাম্পে। কতোদিন ডিম খাইনি। সাবধানে ডিমগুলো লুকিয়ে রাখি যাতে কেউ চুরি করে না নিয়ে যায়। একদিন রাত্রে একটা মেয়ে মোমবাতি জ্বালিয়ে দেখে, ওগুলো ফুটে অনেকগুলো বাচ্চা বেরিয়েছে।

পরের দিন রাস্তায় বেরিয়ে হঠাৎ একটা নাৎসী মেয়ে-গার্ডকে দেখতে পাই। সবাই মিলে তাকে হেঁচড়াতে হেঁচড়াতে ক্যাম্পের ভেতরে নিয়ে আসি। মাথা কামিয়ে উলঙ্গ করে মারধোর করার পর আমেরিকানরা এসে ওকে ছাড়িয়ে নিয়ে যায়। নইলে নিশ্চিন্ত মৃত্যুর হাত থেকে কেউ তাকে রক্ষা করতে পারতো না।

আমাদের ক্যাম্প থেকে সরিয়ে শহর সালজ্‌বাডেলের কিছু দূরে ভাসায় ক্যাম্পে নিয়ে আসে। ভাসার ক্যাম্প আমেরিকানরাই তৈরী করেছিলো। কিছুদিনের মধ্যে গুজব ছড়িয়ে পড়ে সালজ্‌বাডেল শহরটা রাশিয়ানদের ভাগে পড়বে। আমরা কিন্তু আমেরিকানদের সঙ্গ ছাড়তে নারাজ। রাশিয়ান সৈন্য সালজ্‌বাডেলে ঢোকার সঙ্গে সঙ্গে আমেরিকানদের সাথে আমরা ক্রনস্‌ভিকে

চলে আসি। না, আর ক্যাম্পে ক্যাম্পে নয়। আমরা আউস্‌ভিৎজের যে ক'জন শেষ পর্যন্ত বেঁচে আছি, সবাই মিলে একটা প্রাইভেট বাড়ীর ঘর দখল করি। আস্তানার সমস্যা তো চুকলো, কিন্তু খাওয়া-দাওয়া কি হবে? দোকানে তো এক কণাও খাদ্য দ্রব্য নেই। আবার সেই আমেরিকান সৈন্যদের উপরেই নির্ভর।

এদিকে মা'র তো দম নেওয়ারও ফুরসত নেই। ইন্টারপ্রিটার অর্থাৎ দো-ভাষীর কাজ। ডকুমেণ্টের অনুবাদ। নাৎসীদের ট্রায়ালের জন্য নথিপত্র তৈরী ইত্যাদি করতে করতে মা'র দিন-রাত কোথা দিয়ে কেটে যায় টেরই পাওয়া যায় না। আমি আর কতোটুকু সাহায্য করবো? যা ইংরেজী জানতাম, ইতিমধ্যে তা' সম্পূর্ণ ভুলে বসে আছি। এবার আবার গুজব উঠলো, ব্রুনস্‌ভিক ইংরেজের দখলে আসবে। সুতরাং আমেরিকানরা আরো দক্ষিণে সরে যাবে। কতোদিন আর ওদের পেছনে পেছনে ঘুরবো? চেষ্টা করতে লাগলাম ইহুদীরা সবাই মিলে যদি আবার পোল্যাণ্ডে ফিরে যাওয়া যায়। বাড়ী-ঘর নিশ্চয়ই নেই। তবু পরিশ্রমে আবার যদি গড়ে তোলা যায়। কিন্তু, অনেক অনুরোধ উপরোধেও কেউ যেতে রাজী হলো না।

মুক্তি পাওয়ার প্রথম দিন থেকেই আমি আর মা আপ্রাণ চেষ্টা করেছি, বাবা ছোট ভাই আর অন্যান্য আত্মীয়-স্বজনকে খুঁজে বার করার। বেলসন্‌, এরোলসনেও নাম রেজেষ্ট্রি করেছি। ওখানেই প্রতিদিন বেঁচে থাকা বন্দীদের নামের লিষ্ট টাঙানো হয়ে থাকে। এদিক-ওদিক ঘুরে খোঁজ করেছি। রেডক্রশ অফিসে ধর্না দিয়েছি। পোল্যাণ্ডেও যোগাযোগ করতে চেষ্টা করেছি। কিন্তু হা হতোস্মি! আমি একা আমাদের পুরনো শহর বিল্‌স্কো, লাব্‌লিনে গিয়ে সরজমিনে খোঁজ করতে চাইলেও মা ছাড়েনি।

দিন, সপ্তাহ, মাসও গড়িয়ে গেল, কারোর খোঁজ নেই। কেউ বেঁচে থাকলে নিশ্চয়ই খুঁজে পেতাম। আর বেঁচে নেই। তবু মন মানে না।

১৯৪৬ সালের মাঝামাঝি দূর সম্পর্কের এক আত্মীয়ের মুখে শুনি, আমার বাবাকে কী ভাবে হত্যা করেছে নাৎসীরা। আরেকজন বন্ধুর চিঠিতে জানতে পারি যে ভাইও আর এ পৃথিবীতে নেই। আমাদের সব আত্মীয়স্বজনই একে একে চিরদিনের জন্য আমাদের ছেড়ে চলে গেছে। অর্থাৎ, এ বিশাল নিষ্ঠুর পৃথিবীতে আমরা একা, নিঃসহায়।

নিজেদের ফেলে আসা শহরে গিয়েও লাভ নেই। সবকিছু ধ্বংসের স্তূপে

পরিণত হয়েছে। কি হবে সেই দুঃস্বপ্নের স্মৃতির মধ্যে ফিরে গিয়ে? এখন বাঁচবার মাত্র একটাই পথ খোলা; অতীত ভুলে গিয়ে ভবিষ্যতকে বুকে আঁকড়ে বেঁচে থাকা। কিন্তু ভুলতে চাইলেও কি আর এতো সহজে অতীতকে ভোলা যায়? নাকি, সম্ভব? এমন কি এ অতীতকে ক্ষমা করাও অসম্ভব। তবু বুক ভরা ঘৃণা নিয়ে এ সবুজ পৃথিবীতে বেঁচে থাকাও তো যাবে না। সুতরাং যে করেই হোক্ আমাকে দুঃস্বপ্নের এই দীর্ঘ রাতটাকে ভুলতেই হবে।